

هَذَا تِلْكَ النَّاسِ هَكَذَا وَفِيهِ نِصْرَةُ الْغَنِيِّ

তাহসীমুল কুরআন

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদুদী
রহ.

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সিলেবাস

- * সূরা ফাতিহা
- * সূরা বাকারাহ- ২৭৪-২৮৬ আয়াত
- * সূরা আলে ইমরান ১০-২০ এবং ১৩০-১৪৩ আয়াত
- * সূরা আশ্বিয়া ৭৬-৯৩ আয়াত
- * সূরা মুমিনুন ৫১-৭৭ আয়াত
- * সূরা যুমার
- * সূরা হাশর
- * সূরা মুনাফিকুন
- * সূরা মূলক
- * সূরা বালাদ থেকে সূরা আলাক

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

কুরআন অধ্যয়ন
প্রতিযোগিতা
২০২৩

সূরা ফাতিহা

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আল ফাতিহা

১

নামকরণ

এ সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর এই নামকরণ করা হয়েছে। যার সাহায্যে কোন বিষয়, গ্রন্থ বা জিনিসের উদ্বোধন করা হয় তাকে 'ফাতিহা' বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এ শব্দটি ভূমিকা এবং বক্তব্য শুরু করার অর্থ প্রকাশ করে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। বরং হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাংগ সূরা। এর আগে মাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। সেগুলো সূরা 'আলাক', সূরা 'মুদ্বাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাসসির' ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

আসলে এ সূরাটি হচ্ছে একটি দোয়া। যে কোন ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে আল্লাহ প্রথমে তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দেন। গ্রন্থের শুরুতে এর স্থান দেয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, যদি যথার্থই এ গ্রন্থ থেকে ভূমি লাভবান হতে চাও, তাহলে নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করো।

মানুষের মনে যে বস্তুটির আকাংখা ও চাহিদা থাকে স্বভাবত মানুষ সেটিই চায় এবং সে জন্য দোয়া করে। আবার এমন অবস্থায় সে এই দোয়া করে যখন অনুভব করে যে, যে সত্তার কাছে সে দোয়া করছে তার আকাংখিত বস্তুটি তারই কাছে আছে। কাজেই কুরআনের শুরুতে এই দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান লাভের জন্য এ গ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মানসিকতা নিয়ে এর পাতা ওলটাও এবং নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস—একথা জেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই পথনির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন ও সূরা ফাতিহার মধ্যকার আসল সম্পর্ক কোন বই ও তার ভূমিকার সম্পর্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এ সম্পর্কটি দোয়া ও দোয়ার জবাবের পর্যায়ভুক্ত। সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন—এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য ভূমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।

আয়াত ৭

সূরা আল ফাতিহা-মক্কী

সূরত্ব ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ① الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ ③ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ④

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য^১ যিনি নিখিল বিশ্ব-জাহানের রব,^২ পরম দয়ালু ও করুণাময়,^৩ প্রতিদান দিবসের মালিক।^৪

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি^৫ এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই।^৬

১. ইসলাম মানুষকে একটি বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রীতি। সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এ রীতির অনুসারী হলে অনিবার্যভাবে তিনটি সুফল লাভ করা যাবে। এক : মানুষ অনেক খারাপ কাজ করে থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অভ্যাস তাকে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে একথা চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, যথাযথি এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোন ন্যায়সংগত অধিকার তার আছে কি না? দুই : বৈধ সঠিক ও সৎকাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে মোড় নেবে। সে সবসময় সবচেয়ে নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে। তিন : এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে। তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে। শয়তানের বিপর্যয় ও ধ্বংসকারিতা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখা হবে। বান্দা যখন আল্লাহর দিকে ফেরে তখন আল্লাহও বান্দার দিকে ফেরেন, এটাই আল্লাহর রীতি।

২. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলেছি, সূরা ফাতিহা আসলে একটি দোয়া। তবে যে সত্তার কাছে আমরা প্রার্থনা করতে চাচ্ছি তাঁর প্রশংসা বাণী দিয়ে দোয়া শুরু করা হচ্ছে। এভাবে যেন দোয়া চাওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দোয়া চাইতে হলে তদ্র ও শালীন পদ্ধতিতে দোয়া চাইতে হবে। কারো সামনে গিয়ে মুখ খুলেই প্রথমে নিজের প্রয়োজনটা পেশ করে দেয়া কোন সৌজন্য ও ভব্যতার পরিচায়ক নয়। যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে প্রথমে তার গুণাবলী বর্ণনা করা এবং তার দান, অনুগ্রহ ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়াই তদ্রতার রীতি।

আমরা দু'টি কারণে কারো প্রশংসা করে থাকি। প্রথমত তিনি প্রকৃতিগতভাবে কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট্য আমাদের ওপর কি প্রভাব ফেলে সেটা বড় কথা নয়। দ্বিতীয়ত তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং আমরা তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতির আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়েই তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করি। মহান আল্লাহর প্রশংসা এই উভয় কারণে ও উভয় দিক দিয়েই করতে হয়। আমরা হামেসা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হব, এটি তাঁর অপরিসীম মর্যাদা ও আমাদের প্রতি তাঁর অশেষ অনুগ্রহের দাবী।

আর প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং সঠিকভাবে বলা যায়, “প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই” জন্য। একথাটি বলে একটি বিরাট সত্যের ওপর থেকে আবরণ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এটি এমন একটি সত্য যার প্রথম আঘাতেই ‘সৃষ্টি পূজা’র মূলে কুঠারাঘাত হয়। দুনিয়ায় যেখানে যে বস্তুর মধ্যে যে আকৃতিতেই কোন সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজিত আছে আল্লাহর সন্তাই মূলত তার উৎস। কোন মানুষ, ফেরেশতা, দেবতা, গ্রহ-নক্ষত্র তথা কোন সৃষ্টির নিজস্ব কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং এসবই আল্লাহ প্রদত্ত। কাজেই যদি কেউ এ অধিকার দাবী করেন যে, আমরা তাঁর প্রশংসা কীর্তন করব, তাঁকে পূজা করব, তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করব ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং তাঁর খেদমতগার ও সেবক হব, তাহলে তিনি হবেন সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানব-সন্তা নয়।

৩. ‘রব’ শব্দটিকে আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এক, মালিক ও প্রভু। দুই, অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী। তিন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা পরিচালক ও সংগঠক।

৪. মানুষের দৃষ্টিতে কোন জিনিস খুব বেশী বলে প্রতীয়মান হলে সেজন্য সে এমন শব্দ ব্যবহার করে যার মাধ্যমে আধিক্যের প্রকাশ ঘটে। আর একটি আধিক্যবোধক শব্দ বলার পর যখন সে অনুভব করে যে ঐ শব্দটির মাধ্যমে সঞ্চিত জিনিসটির আধিক্যের প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তখন সে সেই একই অর্থে আর একটি শব্দ ব্যবহার করে। এভাবে শব্দটির অন্তরনিহিত গুণের আধিক্য প্রকাশের ব্যাপারে যে কমতি রয়েছে বলে সে মনে করছে তা পূরণ করে। আল্লাহর প্রশংসায় ‘রহমান’ শব্দের পরে আবার ‘রহীম’ বলার মধ্যেও এই একই নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আরবী ভাষায় ‘রহমান’ একটি বিপুল আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানী এত বেশী ও ব্যাপক এবং এত সীমাসংখ্যাহীন যে, তা বয়ান করার জন্য সবচেয়ে বেশী ও বড় আধিক্যবোধক শব্দ ব্যবহার করার পরও মন ভরে না। তাই তার আধিক্য প্রকাশের হক আদায় করার জন্য আবার ‘রহীম’ শব্দটিও বলা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে, যেমন আমরা কোন ব্যক্তির দানশীলতার গুণ বর্ণনা করার জন্য ‘দাতা’ বলার পরও যখন অতৃপ্তি অনুভব করি তখন এর সাথে ‘দানবীর’ শব্দটিও লাগিয়ে দেই। রঙের প্রশংসায় ‘সাদা’ শব্দটি বলার পর আবার ‘দুধের মতো সাদা’ বলে থাকি।

৫. অর্থাৎ যেদিন মানবজাতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বংশধরদেরকে একত্র করে তাদের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের হিসেব নেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে। তিনি সেই দিনের একচ্ছত্র অধিপতি, আল্লাহর প্রশংসায় রহমান ও রহীম শব্দ

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও,^৮ তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ
করেছ,^৯ যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।^{১০}

ব্যবহার করার পর তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক একথা বলায় এখান থেকে এ অর্থও প্রকাশিত হয় যে, তিনি নিছক দয়ালু ও করুণাময় নন বরং এই সংগে তিনি ন্যায় বিচারকও। আবার তিনি এমন ন্যায় বিচারক যিনি হবেন শেষ বিচার ও রায় শুনানীর দিনে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক সেদিন তিনি শাস্তি প্রদান করলে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। এবং পুরস্কার দিলেও কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাজেই তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন ও আমাদের প্রতি করুণা করেন এ জন্য যে আমরা তাঁকে ভালোবাসি ও ধু এতটুকুই নয় বরং তিনি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেন এ জন্য আমরা তাঁকে ভয়ও করি এবং এই অনুভূতিও রাখি যে, আমাদের পরিণামের ভালো মন্দ পুরোপুরি তাঁরই হাতে ন্যস্ত।

৬. ইবাদাত শব্দটিও আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (১) পূজা ও উপাসনা করা, (২) আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলা এবং (৩) বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার পূজা-উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার বন্দেগী ও দাসত্বও করি। আর আমরা তোমার সাথে এ সম্পর্কগুলো রাখি কেবল এবানেনই কথা শেষ নয় বরং এ সম্পর্কগুলো আমরা একমাত্র তোমারই সাথে রাখি। এই তিনটি অর্থের মধ্যে কোন একটি অর্থেও অন্য কেউ আমাদের মাবুদ নয়।

৭. অর্থাৎ তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল ইবাদাতের নয় বরং আমাদের সাহায্য প্রার্থনার সম্পর্কও একমাত্র তোমারই সাথে রয়েছে। আমরা জানি তুমিই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের রব। সমস্ত শক্তি তোমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তুমি একাই যাবতীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের অধিকারী। তাই আমাদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা একমাত্র তোমারই দ্বারা ধর্না দেই। তোমারই সামনে নিজেদের সুপদ করে দেই এবং তোমারই সাহায্যের ওপর নির্ভর করি। এ জন্য আমাদের এই আবেদন নিয়ে আমরা তোমার দ্বারা হাজির হয়েছি।

৮. অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে, চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি-ব্যবস্থা আমাদের শেখাও, যা হবে একেবারেই নির্ভুল, যেখানে ভুল দেখা, ভুল কাজ করা ও অন্তত পরিণামের আশংকা নেই, যে পথে চলে আমরা যথার্থ সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। কুরআন অধ্যয়নের প্রাকালে বান্দা তার প্রভু, মালিক, আল্লাহর কাছে এই আবেদনটি পেশ করে। বান্দা আর্জি পেশ করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও। কল্পিত দর্শনের গোলকধাঁধার মধ্য থেকে যথার্থ সত্যকে

উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর। বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা-দর্শনের মধ্য থেকে যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা-দর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপিত কর। জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও।

৯. মহান আল্লাহর কাছ থেকে আমরা যে সোজা পথটির জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে তার পরিচয়। অর্থাৎ এমন পথ যার ওপর সবসময় তোমার প্রিয়জনেরা চলেছেন। সেই নির্ভুল রাজপথটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি ও যে দলটিই তার ওপর চলেছে সে তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং তোমার দানে তার জীবনপাত্র পরিপূর্ণ হয়েছে।

১০. অর্থাৎ 'অনুগ্রহ' লাভকারী হিসেবে আমরা এমন সব লোককে চিহ্নিত করিনি যারা আপাতদৃষ্টিতে সাময়িকভাবে তোমার পার্থিব অনুগ্রহ লাভ করে থাকে ঠিকই কিন্তু আসলে তারা হয় তোমার গম্ব ও শান্তির অধিকারী এবং এভাবে তারা নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথ হারিয়ে ফেলে। এ নেতিবাচক ব্যাখ্যায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'অনুগ্রহ' বলতে আমরা যথার্থ ও স্থায়ী অনুগ্রহ বুঝাচ্ছি, যা আসলে সঠিক পথে চলা ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের ফলে অর্জিত হয়। এমন কোন সাময়িক ও লোক দেখানো অনুগ্রহ নয়, যা ইতিপূর্বে ফেরাউন, নমরুদ ও কারুনরা লাভ করেছিল এবং আজো আমাদের চোখের সামনে বড় বড় যালেম, দুষ্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা যেগুলো লাভ করে চলেছে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা বাকারাহ- ২৭৪-২৮৬ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আল বাকারাহ

২

নামকরণ

বাকারাহ মানে গাভী। এ সূরার এক জায়গায় গাভীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে প্রত্যেকটি সূরায় এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাদের জন্য কোন পরিপূর্ণ ও সার্বিক অর্থবোধক শিরোনাম উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। শব্দ সঙ্করের দিক দিয়ে আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও মূলত এটি তো মানুষেরই ভাষা আর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো খুব বেশী সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসর সম্পন্ন। সেখানে এই ধরনের ব্যাপক বিষয়বস্তুর জন্য পরিপূর্ণ অর্থব্যাঞ্জক শিরোনাম তৈরি করার মতো শব্দ বা বাক্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন। এই সূরার নামকরণ আল বাকারাহ করার অর্থ এ নয় যে, এখানে গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বরং এর অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে গাভীর কথা বলা হয়েছে।

নাখিলের সময়-কাল

এ সূরার বেশীর ভাগ মদীনায হিজরাতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাখিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাখিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে প্রথমোক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাখিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরাতের আগে মকায় নাখিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নাখিলের উপলক্ষ

এ সূরাটি বুঝতে হলে প্রথমে এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

(১) হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবল মকায়। এ সময় পর্যন্ত সযোজন করা হচ্ছিল কেবলমাত্র আরবের মুশরিকদেরকে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। এখন হিজরাতের পরে ইহদিরা সামনে এসে গেল। তাদের জনবসতিগুলো ছিল মদীনার সাথে একেবারে লাগানো। তারা তাওহীদ, রিসালাত,

অহী, আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবী মুসা আলাইহিস সালামের ওপর যে শরিয়াতী বিধান নাযিল হয়েছিল তারও স্বীকৃতি দিত। নীতিগতভাবে তারাও সেই দীন ইসলামের অনুসারী ছিল যার শিক্ষা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে চলছিলেন। কিন্তু বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে তারা আসল দীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।^১ তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামী বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাওরাতের এর কোন ভিত্তি ছিল না। তাদের কর্মজীবনে এমন অসংখ্য রীতি-পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছিল যথার্থ দীনের সাথে যেগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাওরাতের মূল বিষয়বস্তুর সাথেও এগুলোর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। আল্লাহর কালাম তাওরাতের মধ্যে তারা মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। শাব্দিক বা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম যতটুকু পরিমাণ সংরক্ষিত ছিল তাকেও তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকৃত করে দিয়েছিল। দীনের যথার্থ প্রাণবন্ত তাদের মধ্য থেকে অন্তরহিত হয়ে গিয়েছিল। লোক দেখানো ধার্মিকতার নিছক একটা নিম্নাণ খোলসকে তারা বুকুর সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তাদের উলামা, মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ—সবার আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও বাস্তব কর্ম জীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের এই বিকৃতির প্রতি তাদের আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে কোন প্রকার সংস্কার সংশোধন গ্রহণের তারা বিরোধী হয়ে উঠেছিল। যখনই কোন আল্লাহর বান্দা তাদেরকে আল্লাহর দীনের সরল-সোজা পথের সন্ধান দিতে আসতেন তখনই তারা তাকে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত শত বছর ধরে ক্রমাগতভাবে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছিল। এরা ছিল আসলে বিকৃত মুসলিম। দীনের মধ্যে বিকৃতি, দীন বহির্ভূত বিষয়গুলোর দীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, দলাদলি, বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও পার্শ্বি লোভ-লালসায় আকর্ষিত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কি তারা নিজেদের আসল ‘মুসলিম’ নামও ভুলে গিয়েছিল। নিছক ‘ইহুদি’ নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আল্লাহর দীনকে তারা কেবল ইসরাঈল বংশজাতদের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে পরিণত করেছিল। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে পৌঁছার পর ইহুদিদেরকে আসল দীনের দিকে আহ্বান করার জন্য আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন। সূরা বাকারার ১৫ ও ১৬ রুকু’ এ দাওয়াত সহলিত। এ দু’রুকু’তে যেভাবে ইহুদিদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মোকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মোকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতা কাকে বলে, সত্য ধর্মের মূলনীতিগুলো কি এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ জিনিস যথার্থ গুরুত্বের অধিকারী তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. এ সময়ের প্রায় ১৯শ’ বছর আগে হযরত মুসার (আ) যুগ অতীত হয়েছিল। ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসেব মতে হযরত মুসা (আ) খৃ. পূ. ১২৭২ অব্দে ইস্তিকাল করেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াত লাভ করেন।

(২) মদীনায় পৌঁছার পর ইসলামী দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতিগুলোর প্রচার এবং দীনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরাতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে চতুর্দিক থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে থাকলো এবং আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে উঠলো তখন মহান আল্লাহ সমাজ, সংস্কৃতি, লোকচার, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কিত মৌলিক বিধান দিতে থাকলেন এবং ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এ নতুন জীবন ব্যবস্থাটি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তারও নির্দেশ দিতে থাকলেন। এ সূরার শেষ ২৩টি রুকু'তে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ও বিধানগুলো বয়ান করা হয়েছে। এর অধিকাংশ শুরুতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কিছু পাঠানো হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিকিণ্ডভাবে।

(৩) হিজরাতের পর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতও একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াত কুফরের ঘরের মধ্যেই দেয়া হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গোত্রের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতো তারা নিজেদের জায়গায় দীনের প্রচার করতো। এর জবাবে তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হতো। কিন্তু হিজরাতের পরে এ বিকিণ্ড মুসলমানরা মদীনায় একত্র হয়ে একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন একদিকে ছিল একটি ছোট জনপদ এবং অন্যদিকে সমগ্র আরব ভূখণ্ড তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন এ ছোট জামায়াতটির কেবল সাক্ষ্যই নয় বরং তার অস্তিত্ব ও জীবনই নির্ভর করছিল পাঁচটি জিনিসের ওপর। এক, পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে নিজের মতবাদের প্রচার করে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে নিজের চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী করার চেষ্টা করা। দুই, বিরোধীদের বাতিল ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী বিষয়টি তাকে এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোন বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সংশয় না থাকে। তিন, গৃহহারা ও সারা দেশের মানুষের শত্রুতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হবার কারণে অভাব-অনটন, অনাহার-অর্ধাহার এবং সার্বক্ষণিক অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় সে ভুগছিল। চতুর্দিক থেকে বিপদ তাকে ঘিরে নিয়েছিল এ অবস্থায় যেন সে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে। পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে যেন অবস্থার মোকাবিলা করে এবং নিজের সংকল্পের মধ্যে সামান্যতম দ্বিধা সৃষ্টির সুযোগ না দেয়। চার, তার দাওয়াতকে ব্যর্থকাম করার জন্য যে কোন দিক থেকে যে কোন সশস্ত্র আক্রমণ আসবে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে। বিরোধী পক্ষের সংখ্যা ও তাদের শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। পাঁচ, তার মধ্যে এমন সুদৃঢ় হিম্মত সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে আরবের লোকেরা ইসলাম যে নতুন ব্যবস্থা কায়ম করতে চায় তাকে আপসে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলিয়াতের বাতিল ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দিতে সে একটুও ইতস্তত করবে না। এ সূরায় আল্লাহ এ পাঁচটি বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

(৪) ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে একটি নতুন গোষ্ঠীও আত্মপ্রকাশ শুরু করেছিল। এটি ছিল মুনাফিক গোষ্ঠী। নবী করীমের (সা) মক্কায় অবস্থান কালের শেষের দিকেই

মুনাফিকীর প্রাথমিক আলামতগুলো সুস্পষ্ট হতে শুরু হয়েছিল। তবুও সেখানে কেবল এমন ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতো যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং নিজেদের ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু এ সত্যের খাতিরে নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে নিজেদের পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং এ সত্য মতবাদটি গ্রহণ করার সাথে সাথেই যে সমস্ত বিপদ-আপদ, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে আসতে থাকতো তা মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায়া আসার পর এ ধরনের মুনাফিকদের ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী ছিল ইসলামকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকারকারী। তারা নিছক ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদের দলে প্রবেশ করতো। মুনাফিকদের দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির অবস্থা ছিল এই যে, চতুর্দিক থেকে মুসলিম কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তরভুক্ত করতো এবং অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের নাভের হিসসা খুলিতে রাখতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপটা থেকেও সংরক্ষিত থাকতো। তৃতীয় গোষ্ঠীতে এমন ধরনের মুনাফিকদের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দোদুল্যমান। ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাদের গোত্রের বা বংশের বেশির ভাগ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিকদের চতুর্থ গোষ্ঠীটিতে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ, কুসংস্কার ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃংখল গলায় পরে নিতে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে তাদের মন চাইতো না।

সূরা বাকারাহ নাযিলের সময় সবেমাত্র এসব বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ এখানে তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছেন মাত্র। পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি যতই সুস্পষ্ট হতে থাকলো ততই বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মুনাফিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুযায়ী পরবর্তী সূরাগুলোয় তাদের সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٩٥﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٩٦﴾

৩৮ রুকু'

যারা নিজদের ধন-সম্পদ দিনরাত গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন ভয় ও দুঃখ নেই। কিন্তু যারা সুদ খায়^{৩১৫} তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।^{৩১৬} তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে : “ব্যবসা তো সুদেরই মতো।”^{৩১৭} অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।^{৩১৮} কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরা থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে।^{৩১৯} আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী।

এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এসব লোকের মনে হিদায়াতের মর্মবাণী সুদূতভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া তোমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত নয়। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কেবল এদের কাছে হককথা পৌঁছিয়ে দেয়া। হককথা পৌঁছিয়ে দিয়েই তুমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। এখন তাদের অন্তরদৃষ্টি দান করা বা না করা আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আর তোমরা নিছক তাদের হিদায়াত গ্রহণ না করার কারণে পার্থিব অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাদের অভাব মোচনের ব্যাপারে ইতস্তত করো না কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে কোন অভাবী লোকের সাহায্য করো না কেন, আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্য তোমাদের দেবেন।

৩১৪. এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে এমন একদল লোক যারা আত্মাহুর দীনের খেদমতে নিজেদেরকে কায়মনোবাক্যে সার্বক্ষণিকভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তাদের সমস্ত সময় এই দীনী খেদমতে ব্যয় করার কারণে নিজেদের পেট পালার জন্য কিছু কাজকাম করার সুযোগ তাদের ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবীদের একটি স্বতন্ত্র দল ছিল। ইতিহাসে তাঁরা 'আসহাবে সুফা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এরা ছিলেন তিন চারশো লোকের একটি দল। নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে এরা মদীনায় চলে এসেছিলেন। সর্বক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির থাকতেন। তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। তিনি যখন যাকে যেখানে কোন কাজে বা অভিযানে প্রয়োজন তাদের মধ্য থেকে নিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। মদীনার বাইরে কোন কাজ না থাকলে তারা মদীনায় অবস্থান করে দীনী ইন্ম হাসিল করতেন এবং অন্যদেরকে তার তালিম দিতেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন সার্বক্ষণিক কর্মী এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো ব্যক্তিগত উপকরণও তাঁদের ছিল না, তাই মহান আত্মাহ সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে বিশেষ করে তাদেরকে সাহায্য করাকে আত্মাহর পথে ব্যয়ের সর্বোত্তম খাত বলে উল্লেখ করেছেন।

৩১৫. মূল শব্দটি হচ্ছে 'রিবা'। আরবী ভাষায় এর অর্থ বৃদ্ধি। পারিতোষিক অর্থ আরবরা এ শব্দটি ব্যবহার করে এমন এক বর্ধিত অর্থের অর্থের জন্য, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী মূল অর্থের বাইরে আদায় করে থাকে। আমাদের ভাষায় একেই বলা হয় সুদ। কুরআন নাযিলের সময় যেসব ধরনের সুদী লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কোন জিনিস বিক্রি করতো এবং দাম আদায়ের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতো। সময়সীমা অতিক্রম করার পর যদি দাম আদায় না হতো, তাহলে তাকে আবার বাড়তি সময় দিতো এবং দাম বাড়িয়ে দিতো। অথবা যেমন, একজন অন্য একজনকে ঋণ দিতো। ঋণদাতার সাথে চুক্তি হতো, উম্মুক সময়ের মধ্যে আসল থেকে এই পরিমাণ অর্থ বেশী দিতে হবে। অথবা যেমন, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি বিশেষ সময়সীমার জন্য একটি বিশেষ হার স্থিরীকৃত হয়ে যেতো। ঐ সময়সীমার মধ্যে বর্ধিত অর্থসহ আসল অর্থ আদায় না হলে আগের থেকে বর্ধিত হারে অতিরিক্ত সময় দেয়া হতো। এই ধরনের লেনদেনের ব্যাপার এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩১৬. আরবরা পাগল ও দেওয়ানাকে বলতো, 'মজনুন' (অর্থাৎ জিন বা প্রেতগন্ত)। কোন ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, একথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বারা বলতো, উম্মুককে জিনে ধরেছে। এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছে যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি যেমন ভারসাম্যহীন কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করে, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পেছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। নিজের স্বার্থপর মনোবৃত্তির চাপে পাগলের মতো সে কোন কিছুই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে কোন্ কোন্ পর্যায় মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির শিকড় কেটে গেলো, সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন্ ধরনের ঋণসকর প্রভাব পড়লো এবং কতগুলো লোকের দুরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করলো—এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যথাই থাকে না।

দুনিয়াতে তার এই পাগলপারা অবস্থা। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে যে অবস্থায় সে এই দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল, তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি একজন পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের চেহারা আত্মপ্রকাশ করবে।

৩১৭. অর্থাৎ তাদের মতবাদের গলদ হচ্ছে এই যে, ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটানো হয়, তার ওপর যে মুনাফা আসে সেই মুনাফালব্ধ অর্থ ও সুদের মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করে না। এই উভয় অর্থকে একই পর্যায়েভুক্ত মনে করে তারা যুক্তি পেশ করে থাকে যে, ব্যবসায়ে খাটানো অর্থের মুনাফা যখন বৈধ তখন এই ঋণবাবদ প্রদত্ত অর্থের মুনাফা অবৈধ হবে কেন? বর্তমান যুগের সুদখোররাও সুদের স্বপক্ষে এই একই যুক্তি পেশ করে থাকে। তারা বলে, এক ব্যক্তি যে অর্থ থেকে লাভবান হতে পারতো, তাকে সে ঋণ বাবদ দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে ভুলে দিচ্ছে। আর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি নিসন্দেহে তা থেকে লাভবানই হচ্ছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার যে অর্থ থেকে ঋণগ্রহীতা লাভবান হচ্ছে তার একটি অংশ সে ঋণদাতাকে দেবে না কেন? কিন্তু তারা একথাটি চিন্তা করে না যে, দুনিয়ায় যত ধরনের কারবার আছে, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি—যাই হোক না কেন, যেখানে মানুষ কেবলমাত্র শ্রম খাটায় অথবা শ্রম ও অর্থ উভয়টিই খাটায়, সেখানে কোন একটি কারবারও এমন নেই যাতে মানুষকে ক্ষতির ঝুঁকি (Risk) নিতে হয় না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মুনাফা বাবদ অর্জিত হবার গ্যারান্টিও কোথাও থাকে না। তাহলে সারা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসায় সংগঠনের মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতিই বা কেন ক্ষতির ঝুঁকিমুক্ত থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভের হকদার হবে? অলাভজনক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করার বিষয়টি কিছুক্ষণের জন্য না হয় দূরে সরিয়ে রাখুন এবং সুদের হারের কম বেশীর বিষয়টিও স্থগিত রাখুন। লাভজনক ও উৎপাদনশীল ঋণের ব্যাপারেই আসা যাক এবং হারও ধরা যাক কম। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা রাতদিন নিজেদের কারবারে সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি খাটিয়ে চলছে এবং যাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপরই এই কারবার ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করছে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট মুনাফার নিশ্চয়তা নেই বরং ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকিটাই থাকছে তাদের মাথার ওপর। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের টাকা তাকে ঋণ দিয়েছে সে নিশ্চিন্তে বসে বসে একটি নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা হাসিল করতে থাকবে, এটা কোন ধরনের বুদ্ধিসম্মত ও যুক্তিসংগত কথা? ন্যায়, ইনসাফ ও অর্থনীতির কোন মানদণ্ডের বিচারে একে ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে। আবার এক ব্যক্তি একজন কারখানাদারকে বিশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ ঋণ দিল এবং ঋণ দেয়ার সময়ই সেখানে স্থিরীকৃত হলো যে, আজ থেকেই সে বছরে শতকরা পাঁচ টাকা হিসেবে নিজের মুনাফা গ্রহণের অধিকারী হবে। অথচ কেউ জানে না, এই কারখানা যে পণ্য উৎপাদন করছে আগামী বিশ বছরে বাজারে তার দামের মধ্যে কি পরিমাণ ওঠানামা হবে? কাজেই এ পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে? একটি জাতির সকল শ্রেণী একটি যুদ্ধে বিপদ, ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করবে কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতি গোষ্ঠীই তাদের জাতিকে প্রদত্ত যুদ্ধঋণের সুদ উসূল করতে থাকবে শত শত বছর পরও, এটাকে কেমন করে সঠিক ও ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে?

৩১৮. ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়েভুক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপ :

(ক) ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাকার সমান বিনিময় হয়। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি পণ্য কিনে ক্রেতা তা থেকে মুনাকা অর্জন করে। অন্যদিকে ক্রেতার জন্য ঐ পণ্যটি বোগাড় করার ব্যাপারে বিক্রেতা নিজের যে বুদ্ধি শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল তার মূল্য গ্রহণ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনের ব্যাপারে মুনাকার সমান বিনিময় হয় না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করে। এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু অন্যদিকে সুদ প্রদানকারী কেবলমাত্র 'সময়' লাভ করে, যার লাভজনক হওয়া নিশ্চিত নয়। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য যদি সে ঐ ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিসন্দেহে বলা যায়, ঐ 'সময়' তার জন্যে নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারিগরী সংস্থা অথবা কৃষি কাজে লাগাবার জন্য ঐ অর্থ নিয়ে থাকে, তবুও 'সময়' তার জন্য যেমন লাভ আনবে তেমনি ক্ষতিও আনবে, দু'টোরই সম্ভাবনা সমান। কাজেই সুদের ব্যাপারটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি দলের লাভ ও অন্য দলের লোকসানের ওপর অথবা একটি দলের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ ও অন্য দলের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের ওপর।

(খ) ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী লাভ গ্রহণ করুকনা কেন, সে মাত্র একবারই তা গ্রহণ করে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী নিজের অর্থের জন্য অনবরত মুনাকা নিতে থাকে। আবার সময়ের গতির সাথে সাথে তার মুনাকাও বেড়ে যেতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার অর্থ থেকে যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঋণদাতা এই লাভ থেকে যে মুনাকা অর্জন করে তার কোন সীমা নেই। এমনও হতে পারে, সে ঋণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ এমনকি তার পরনের কাপড়-চোপড় ও ঘরের বাসন-কোসনও উদরস্থ করে ফেলাতে পারে এবং এরপরও তার দাবী অপূর্ণ থেকে যাবে।

(গ) ব্যবসায়ে পণ্যের সাথে তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতাকে আর কোন জিনিস বিক্রেতার হাতে ফেরত দিতে হয় না। পুঁজি, জমি বা মালপত্রের ভাড়ার ব্যাপারে আসল যে বস্তুটি, যার ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়, তা ব্যয়িত হয় না বরং অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা ভাড়াদানকারীর কাছে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পুনর্বার উৎপাদন করে বৃদ্ধি সহকারে ফেরত দেয়।

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে মানুষ শ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে কোন প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের সিংহভাগের অংশীদার হয়। পারিতোষিক অর্থে যাকে "অংশীদার" বলা হয় লাভ-লোকসান উভয় ক্ষেত্রে যে অংশীদার থাকে এবং লাভের ক্ষেত্রে লাভের হার অনুযায়ী যার অংশীদারীত্ব হয়, তেমন অংশীদারের মর্যাদা সে লাভ করে না। বরং সে এমন অংশীদার হয়, যে লাভ-লোকসান ও লাভের হারের কোন পরোয়া না করেই নিজের নির্ধারিত মুনাকার দাবীদার হয়।

এসব কারণে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সুদের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। এর ফলে ব্যবসায় মানবিক তামাদুনের লালন ও পুনর্গঠনকারী

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝

সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ সুদকে নিশিচিৎ করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন। ৩২০ আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দুষ্টকারীকে পছন্দ করেন না। ৩২১ অবশ্যি যারা ঈমান আনে, সংকাজ করে, নামায কয়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান নিসন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় ও মর্মঙ্কলাও নেই। ৩২২

শক্তিতে পরিণত হয়। বিপরীত পক্ষে সুদ তার ক্ষয়নের কারণ হয়। আবার নৈতিক দিক দিয়ে সুদের প্রকৃতিই হচ্ছে, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, কঠোরতা ও অর্থগৃধুতা সৃষ্টি করে এবং সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে দেয়। তাই অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই সুদ মানবতার জন্য ধ্বংসই ডেকে আনে।

৩১৯. একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হচ্ছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, “যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই” বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যাকিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ সে খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা-মোকদ্দমার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সুন্নী কালবাতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্রতা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথাযথি আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থ-সম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজের পর্যায়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। হকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব হকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শান্তি থেকে বীচাতে সাহায্য করবে। তবে যে

ব্যক্তি তার পূর্বকার সুদল্লহ অর্থ যথারীতি ভোগ করিতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিষয়ের কিছু নেই।

৩২০. এই আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্যের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তামাদুনিক দিক দিয়েও সত্য। যদিও আগাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ কমে যাচ্ছে তবুও আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও তামাদুনিক উন্নতির কেবল প্রতিবন্ধকতাই নয় বরং অবনতির সহায়ক। বিপরীতপক্ষে দান-খয়রাতের (করযা-ই-হাসানা বা উত্তম ঋণ) মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং তামাদুন ও অর্থনীতি সবকিছুই উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুদ আসলে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা ইত্যাকার অসং গুণাবলীর ফল এবং এই গুণগুলোই সে মানুষের মধ্যে বিকশিত করে। অন্যদিকে দানশীলতা, সহানুভূতি, উদারতা ও মহানুভবতা ইত্যাকার গুণাবলীই দান-খয়রাতের জন্য দেয় এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে আর নিয়মিত দান-খয়রাত করতে থাকলে এই গুণগুলো মানুষের মধ্যে লালিত ও বিকশিত হতেও থাকে। এমন কে আছে যে, এই উভয় ধরনের নৈতিক গুণাবলীর মধ্য থেকে প্রথমগুলোকে নিকৃষ্ট ও শেষেরগুলোকে উৎকৃষ্ট বলবে না?

তামাদুনিক দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিসন্দেহে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে সমাজের লোকেরা পরস্পরের সাথে স্বার্থবাদী আচরণ করে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ ছাড়া নিস্বার্থভাবে অন্যের কোন কাজ করে না, একজনের প্রয়োজন ও অভাবকে অন্যজন নিজের মুনাকা লুঠনের সুযোগ মনে করে তা থেকে পুরোপুরি লাভবান হয় এবং ধনীদেব স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, সে সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। সে সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও অনাগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর বিভিন্ন অংশ হামেশা বিগৃহীত ও নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। অন্যান্য কারণগুলো যদি এই অবস্থার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এহেন সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়াটাও মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। অন্যদিকে যে সমাজের সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যার সদস্যরা পরস্পরের সাথে ঔদার্যপূর্ণ আচরণ করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন ও অভাবের সময় আন্তরিকতার সাথে ও প্রশস্তমনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একজন সামর্থ্য ও সক্ষম ব্যক্তি তার একজন অক্ষম ও অসমর্থ ভাইকে সাহায্য অথবা কমপক্ষে ন্যায়সংগত সহায়তার নীতি অবলম্বন করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক প্রীতি, কল্যাণাকাংক্ষা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের সমাজের অংশগুলো একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত থাকবে। সেখানে আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিরোধ ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোন সুযোগই পাবে না। পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সাহায্য সহযোগিতার কারণে সেখানে উন্নতির গতিধারা প্রথম ধরনের সমাজের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হবে।

এবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করা যাক। অর্থনীতির বিচারে সুদী লেনদেন দুই ধরনের হয়। এক, অভাবীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ গ্রহণ করে। দুই, পেশাদার লোকেরা নিজেদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম ধরনের ঋণটি সম্পর্কে সবাই জানে, এর ওপর সুদ আদায় করার পদ্ধতি মারাত্মক ধ্বংসকর। দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেখানে মহাজনরা ও মহাজনী সংস্থাগুলো এই পদ্ধতিতে গরীব শ্রমিক, মজুর, কৃষক ও স্বল্প আয়ের লোকদের রক্ত চুষে চলছে না। সুদের কারণে এই ধরনের ঋণ আদায় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বরং অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর এক ঋণ আদায় করার জন্য দ্বিতীয় ঋণ এবং তারপর তৃতীয় ঋণ, এভাবে ঋণের পর ঋণ নিতে থাকে। ঋণের মূল অংকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সুদ আদায় করার পরও মূল অংক যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। শ্রমিকদের আয়ের বৃহত্তম অংশ মহাজনের পেটে যায়। তার নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিনান্তে তার নিজের ও সন্তান-পরিজনদের পেটের আহার যোগাতে সক্ষম হয় না। এ অবস্থায় কাজের প্রতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং একদিন তা শূণ্যের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কারণ তাদের মেহনতের ফল যদি অন্যেরা নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা কোনদিন মন দিয়ে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারে না। তারপর সুদী ঋণের জালে আবদ্ধ লোকেরা সর্বক্ষণ এমন দুর্ভাবনা ও পেন্ডেশানির মধ্যে জীবন কাটায় এবং অভাবের কারণে তাদের জন্য সঠিক খাদ্য ও চিকিৎসা এমনই দুর্লভ হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের স্বাস্থ্য কখনো ভালো থাকে না। প্রায়ই তারা রোগ-পীড়ায় জর্জরিত থাকে। এভাবে সুদী ঋণের নীট ফল এই দাঁড়ায় : গুটিকয় লোক লাখো লোকের রক্ত চুষে মোটা হতে থাকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির অর্থ উৎপাদন সম্ভাব্য পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পরিণামে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ত চোষারাও নিষ্কৃতি পায় না। কারণ তাদের স্বার্থগৃহুতায় সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ, ঘৃণা ও ক্রোধ লাগিত হতে থাকে। তারপর একদিন কোন বিপ্লবের তরংগাভিঘাতে ক্ষোভের আত্মগিগিরির বিস্ফোরণ ঘটে। তখন এই জালেম ধনিক সমাজকে তাদের অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে প্রাণ সম্পদও বিসর্জন দিতে হয়।

আর দ্বিতীয় ধরনের সুদী ঋণ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যবসায় খাটাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে এই ঋণ গ্রহণ করার ফলে যে অসংখ্য ক্ষতি হয় তার মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটি এখানে বিবৃত করছি।

এক : যে কাজটি প্রচলিত সুদের হারের সমান লাভ উৎপাদনে সক্ষম নয়, তা দেশ ও জাতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় ও উপকারী হোক না কেন, তাতে খাটাবার জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ একযোগে এমন সব কাজের দিকে দৌড়ে আসে, যেগুলো বাজারে প্রচলিত সুদের হারের সমান বা তার চাইতে বেশী লাভ উৎপাদন করতে পারে, সামগ্রিক দিক দিয়ে তাদের প্রয়োজন বা উপকারী ক্ষমতা অনেক কম অথবা একেবারে শূন্যের কোঠায় থাকলেও।

দুই : ব্যবসায়, শিল্প বা কৃষি সংক্রান্ত যেসব কাজের জন্য সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাদের কোন একটিতেও এ ধরনের কোন গ্যারাণ্টি নেই যে, সবসময় সব অবস্থায় তার মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন শতকরা পাঁচ, ছয় বা দশ অথবা তার ওপরে থাকবে এবং এর নীচে কখনো নামবে না। মুনাফার এই হারের গ্যারাণ্টি তো দূরের কথা সেখানে অবশ্যি মুনাফা হবে, কখনো লোকসান হবে না, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই যে ব্যবসায়ী এমন ধরনের পুজি খাটানো হয় যাতে পুজিপতিকে একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী মুনাফা দেয়ার নিশ্চয়তা দান করা হয়ে থাকে, তা কখনো ক্ষতি ও আশংকা মুক্ত হতে পারে না।

তিন : যেহেতু মূল ঋণদাতা ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে অংশীদার হয় না, কেবলমাত্র মুনাফার অংশীদার হয় এবং তাও আবার একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়ার ভিত্তিতে মূলধন দেয়, তাই ব্যবসায়ের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকে না। সে চরম স্বার্থপরতা সহকারে কেবলমাত্র নিজের মুনাফার ওপর নজর রাখে। যখনই বাজারে সামান্য মন্দাভাব দেখা দেয়ার আশংকা হয় তখনই সে সবার আগে নিজের টাকাটা টেনে নেয়ার চিন্তা করে। এভাবে কখনো কখনো নিছক তার স্বার্থপরতা সুলভ আশংকার কারণে সত্যি সত্যিই বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়। কখনো অন্য কোন কারণে বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়ে গেলে পুজিপতির স্বার্থপরতা তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে ছড়াত ধ্বংসের সূচনা করে।

সুদের এ তিনটি ক্ষতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অর্থনীতির সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি এগুলো অবহীকার করতে পারবেন না। এরপর একথা মেনে নেয়া ছাড়া গতান্তর নেই যে, যথার্থই সুদ অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ায় না বরং কমায়।

এবার দান-খয়রাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও ফলাফলের কথায় আসা যাক। সমাজের সচ্ছল লোকেরা যদি নিজেদের অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে নিসংকোচে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেয় এরপর তাদের কাছে যে পরিমাণ টাকা উচুত থাকে তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়, যাতে তারাও নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে পারে, তারপরও যে টাকা বাড়তি থেকে যায় তা ব্যবসায়ীদের বিনা সুদে ঋণ দেয় অথবা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে লাভ লোকসানে শরীক হয়ে যায় অথবা সমাজ ও সমষ্টির সেবায় বিনিয়োগ করার জন্য সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়, তাহলে এহেন সমাজে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি চরম উন্নতি লাভ করবে, সমাজের সাধারণ লোকদের সচ্ছলতা বেড়ে যেতে থাকবে এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থা ভিত্তিক সমাজের তুলনায় সেখানে সামগ্রিকভাবে অর্থ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, একথা যে কেউ সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারবে।

৩২১. অর্থ বটনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তার মৌলিক প্রয়োজনের চাইতে বেশী অংশ পেয়েছে একমাত্র সেই ব্যক্তিই সুদে টাকা খাটাতে পারে। কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই যে অংশটা পায় কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় আল্লাহর দান। আর আল্লাহর এই দানের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যেভাবে তাঁর বান্দাকে দান করেছেন বান্দাও ঠিক সেভাবেই আল্লাহর অন্য বান্দাদেরকে তা দান করবে। যদি সে এমনটি না করে বরং এর বিপরীতপক্ষে আল্লাহর এই দানকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣٧﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن
 تَبَتُّرْتُمْ فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسَ أُمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٣٨﴾ وَإِن
 كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى
 كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٤٠﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়েছে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ৩২৩ এখনো তাওবা করে নাও (এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপর জুলুম করাও হবে না। তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সম্বলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সাদকা করে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশী ভালো হবে, যদি তোমরা জানতে। ৩২৪ যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে সেদিনের অপমান ও বিপদ থেকে বাঁচো। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সংকর্মের ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো ওপর কোন জুলুম করা হবে না।

এমনভাবে ব্যবহার করে যার ফলে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহর যেসব বান্দা প্রয়োজনের কম অংশ পেয়েছে তাদের এই কম অংশ থেকেও নিজের অর্থের জোরে এক একটি অংশ নিজের দিকে টেনে নিতে থাকে, তাহলে আসলে সে এক দিকে যেমন হবে অকৃতজ্ঞ তেমনি অন্য দিকে হবে জালাম, নিষ্ঠুর, শোষক ও দুচরিত্র।

৩২২. এই রুকু'তে মহান আল্লাহ বারবার দুই ধরনের লোকদের তুলনা করেছেন। এক ধরনের লোক হচ্ছে, স্বার্থপর, অর্ধগৃধ্র ও শাইলক প্রকৃতির, তারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অধিকারের পরোয়া না করে টাকা গুণতে থাকে, প্রত্যেকটি টাকা গুণে গুণে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে থাকে এবং সপ্তাহ ও মাসের হিসেবে তা বাড়াবার ও এই বাড়তি টাকার হিসেব রাখার মধ্যে ডুবে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে, আল্লাহর অনুগত, দানশীল ও মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও তার বান্দার উভয়ের

অধিকার সংরক্ষণের প্রতি নজর রাখে, নিজেদের পরিশ্রমকৃত অর্থ দিয়ে নিজেদের চাহিদাপূরণ করে এবং অন্যদের চাহিদা পূরণেরও ব্যবস্থা করে। আর এই সংগে নিজেদের অর্থ ব্যাপকভাবে সৎকাজে ব্যয় করে। প্রথম ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদের সাহায্যে দুনিয়ায় কোন সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আখেরাতেও তারা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও বিপদ-মুসিবত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। বিপরীতপক্ষে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তাদের সাহায্যেই দুনিয়ায় সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে এবং আখেরাতে তারাই কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হয়।

৩২৩. এ আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এটিকে এখানে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে সুদকে একটি অপছন্দনীয় বস্তু মনে করা হলেও আইনত তা রহিত করা হয়নি। এই আয়াতটি নাযিলের পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সুদী কারবার একটি ফৌজদারী অপরাধে পরিণত হয়। আরবের যেসব গোত্রে সুদের প্রচলন ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের গভর্নরের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, এখন থেকে যদি তারা সুদের কারবার বন্ধ না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে নাজরানের খৃষ্টানদের স্বায়ত্ত্ব শাসনাধিকার দান করার সময় চুক্তিতে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, যদি তোমরা সুদী কারবার করো তাহলে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আয়াতের শেষের শব্দগুলোর কারণে ইয়রত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বাসরী, ইবনে সীরীন ও রুবাঈ ইবনে আনাস প্রমুখ ফকীহগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে সুদ খাবে তাকে তাওবা করতে বাধ্য করা হবে। আর যদি সে তাতে বিরত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। অন্য ফকীহদের মতে, এহেন ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখাই যথেষ্ট। সুদ খাওয়া পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে।

৩২৪. এই আয়াতটি থেকে শরীয়াতের এই বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে ইসলামী আদালত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে, যাতে তারা তাকে 'সময়' দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : এক ব্যক্তির ব্যবসায় লোকসান হতে থাকে। তার ওপর দেনার বোঝা অনেক বেশী বেড়ে যায়। ব্যাপারটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গড়ায়। তিনি লোকদের কাছে ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করার আবেদন জানান। অনেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দান করে কিন্তু এরপরও তার দেনা পরিশোধ হয় না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঋণদাতাদের বলেন, যা কিছু তোমরা পেয়েছো তাই নিয়ে তাকে রেহাই দাও। এর বেশী তার কাছ থেকে তোমাদের জন্য আদায় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ফকীহগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবার বাসনপত্র, পরার কাপড়-চোপড় এবং যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে সে রুজি-রোজগার করে, সেগুলো কোন অবস্থাতেই ক্রোক করা যেতে পারে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا
 وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
 يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَیْخُسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
 بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ

৩৯ রুকু'

হে ঈমানদারগণ! যখন কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন করো^{৩২৫} তখন লিখে রাখো^{৩২৬} উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে এক ব্যক্তি দলীল লিখে দেবে। আল্লাহ যাকে লেখাপড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন তার লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়। সে লিখবে এবং লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার ওপর ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা)। তার রব আল্লাহকে তার ভয় করা উচিত। যে বিষয় হিরীকৃত হয়েছে তার থেকে যেন কোন কিছুর কম বেশি না করা হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি বুদ্ধিহীন বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে। তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে^{৩২৭} দুই ব্যক্তিকে তার স্বাক্ষী রাখো।

৩২৫. এখান থেকে এ বিধান পাওয়া যায় যে, ঋণের ব্যাপারে সময়সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

৩২৬. সাধারণত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঋণের লেন-দেনের ব্যাপারে দলীল বা প্রমাণপত্র লেখাকে এবং স্বাক্ষী রাখাকে দৃষণীয় ও আবহাীনতার প্রকাশ মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর বাণী হচ্ছে এই যে, ঋণ ও ব্যবসায় সংক্রান্ত লেন-দেনের চুক্তি সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ লিখিত আকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত। এর ফলে লোকদের মধ্যে লেনদেন পরিষ্কার থাকবে। হাদীসে বলা হয়েছে : তিন ধরনের লোক আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে কিন্তু তাদের ফরিয়াদ শোনা হয় না। এক, যার স্ত্রী অসচ্চরিত্র কিন্তু সে তাকে ভালুক দেয় না। দুই, এতিমের বালগ হবার আগে যে ব্যক্তি তার সম্পদ তার

فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
 إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْلُ الشَّاهِدَةِ وَأَذْنَىٰ آلَا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارُّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এসব সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হতে হবে যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়। ৩২৮ সাক্ষীদেরকে সাক্ষ দেবার জন্য বললে তারা যেন অস্বীকার না করে। ব্যাপার ছোট হোক বা বড়, সময়সীমা নির্ধারণ সহকারে দলীল লেখাবার ব্যাপারে তোমরা গড়িমসি করো না। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এই পদ্ধতি অধিকতর ন্যায্যসংগত, এর সাহায্যে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা বেশী সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে যেসব ব্যবসায়িক লেনদেন তোমরা পরস্পরের মধ্যে হাতে হাতে করে থাকো, সেগুলো না লিখলে কোন ক্ষতি নেই। ৩২৯ কিন্তু ব্যবসায়িক বিষয়গুলো স্থিতিশীল করার সময় সাক্ষী রাখো। লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দিয়ো না। ৩৩০ এমনটি করলে গোনাহের কাজ করবে। আল্লাহর গণ্য থেকে আত্মরক্ষা করো। তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন।

হাতে সোপর্দ করে দেয়। তিন, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের অর্থ ঋণ দেয় এবং তাতে কাউকে সাক্ষী রাখে না।

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ
 أَفْنَوْا بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٣٧﴾

যদি তোমরা সফরে থাকো এবং এ অবস্থায় দলীল লেখার জন্য কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধক রেখে কাজ সম্পন্ন করো। ৩৩৭ যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি অন্যের ওপর ভরসা করে তার সাথে কোন কাজ কারবার করে, তাহলে যার ওপর ভরসা করা হয়েছে সে যেন তার আমানত যথাযথরূপে আদায় করে এবং নিজের রব আল্লাহকে ভয় করে। আর সাক্ষ কোনক্রমেই গোপন করো না। ৩৩৮ যে ব্যক্তি সাক্ষ গোপন করে তার হৃদয় গোনাহর সংস্পর্শে কলুষিত। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বেখবর নন।

৩২৭. অর্থাৎ মুসলিম পুরুষদের মধ্য থেকে। এ থেকে জানা যায়, যেখানে সাক্ষী রাখা ইচ্ছাধীন সেখানে মুসলমানরা কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে সাক্ষী বানাবে। তবে অমুসলিমদের সাক্ষী অমুসলিমরা হতে পারে।

৩২৮. এর অর্থ হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হবার যোগ্য নয়। বরং এমন সব লোককে সাক্ষী করতে হবে যারা নিজেদের নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততার কারণে সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে নির্ভরশীল বলে বিবেচিত।

৩২৯. এর অর্থ হচ্ছে, যদিও নিত্যদিনের কেনা-বেচার ক্ষেত্রে লেনদেনের বিষয়টি লিখিত থাকা ভালো, যেমন আজকাল ক্যাশমেমো লেখার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তবুও এমনটি করা অপরিহার্য নয়। অনুরূপভাবে প্রতিবেশী ব্যবসায়ীরা পরস্পরের মধ্যে রাত দিন যেসব লেনদেন করতে থাকে, সেগুলোও লিখিত আকারে না থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

৩৩০. এর এক অর্থ এও হয় যে, কোন দলীল বা প্রমাণপত্র লেখার বা তাতে সাক্ষী থাকার জন্য কোন ব্যক্তির ওপর জোর খাটানো যাবে না এবং তাকে বাধ্য করা হবে না। আবার এ অর্থও হয় যে, কোন পক্ষ তার স্বার্থ বিরোধী সঠিক সাক্ষ্য দেয়ার কারণে যেন লেখক বা সাক্ষীকে কষ্ট না দেয়।

৩৩১. এর অর্থ এই নয় যে, বন্ধকের ব্যাপারটা কেবলমাত্র সফরেই হতে পারে। বরং এ অবস্থাটা যেহেতু বেশীর ভাগ সফরেই দেখা দেয়, তাই বিশেষ করে এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বন্ধকের ব্যাপারে এ শর্তও এখানে লাগানো হয়নি যে, দলীল লেখা সম্ভব না হলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বন্ধকের আশ্রয় নেয়া যায়। এ ছাড়া এর আর একটি

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تَبَدَّلَا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ
 اَوْ تَخَفُوْهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
 يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۷۪ اَمِنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ
 اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ
 وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا
 وَاَطَعْنَا ۚ غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝۱۸۪

৪০ রুকু'

আকাশসমূহে ৩৩ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর ৩৩ তোমরা
 নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করো বা লুকিয়ে রাখো, আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের কাছ
 থেকে তার হিসেব নেবেন ৩৩ তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন এবং
 যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, এটা তাঁর ইখতিয়ারাধীন। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তি
 খাটাবার অধিকারী ৩৩

রসূল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যে হিদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি
 ঈমান এনেছে। আর যেসব লোক ঐ রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ
 হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর
 ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রসূলদেরকে মানে এবং তাদের
 বক্তব্য হচ্ছে : “আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা
 করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে
 গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদের তোমারই দিকে ফিরে যেতে
 হবে ৩৩

পদ্ধতিও হতে পারে। নিছক দলীলের ওপর নির্ভর করে টাকা ধার দিতে কেউ রাজী না হলে
 ঋণগ্রহীতা নিজের কোন জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার নেবে। কিন্তু কুরআন মজীদ তার
 অনুসারীদের দানশীলতা ও মহানুভবতার শিক্ষা দিতে চায়। আর এক ব্যক্তি ধন-সম্পদের
 অধিকারী হবার পর কাউকে কোন জিনিস বন্ধক না রেখে তার প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ
 তাকে ধার দিতে রাজী হবে না, এটা তার উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিপন্থী। তাই কুরআন
 উদ্দেশ্যানুলকভাবেই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির উল্লেখ করেনি।

এ প্রসঙ্গে একথাও জেনে রাখা উচিত যে, বন্ধক রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঋণদাতা তার ঋণ ফেরত পাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। নিজের ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত বন্ধকী জিনিস থেকে কোন প্রকার লাভবান হবার অধিকার তার নেই। যদি কোন ব্যক্তি বন্ধকী গৃহে নিজে বাস করে বা তার ভাড়া খায়, তাহলে আসলে সে সুদ খায়। ঋণ বাবদ প্রদত্ত টাকার সরাসরি সুদ গ্রহণ করা ও বন্ধকী জিনিস থেকে লাভবান হবার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। তবে যদি কোন পশু বন্ধক রাখা হয় তাহলে তার দুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং তাকে আরোহণ ও মাল পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ বন্ধক গ্রহণকারী পশুকে যে খাদ্য দেয়, এটা আসলে তার বিনিময়।

৩৩২. সাক্ষ দিতে না চাওয়া এবং সাক্ষে সত্য ঘটনা প্রকাশে বিরত থাকা উভয়টিই 'সাক্ষ গোপন' করার আওতায় পড়ে।

৩৩৩. এখানে তাযণ সমাপ্ত করা হয়েছে। তাই দীনের মৌলিক শিক্ষাগুলোর বর্ণনার মাধ্যমে যেমন সূরার সূচনা করা হয়েছিল ঠিক তেমনি যে সমস্ত মৌলিক বিষয়ের ওপর দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সূরার সমাপ্তি প্রসঙ্গে সেগুলোও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য সূরার প্রথম রুকু'টি সামনে রাখলে বিষয়বস্তু বুঝতে বেশী সাহায্য করবে বলে মনে করি।

৩৩৪. এটি হচ্ছে দীনের প্রথম বুনিয়াদ। আল্লাহ এই পৃথিবী ও আকাশসমূহের মালিক এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁর একক মালিকানাধীন, প্রকৃতপক্ষে এই মৌলিক সত্যের ভিত্তিতেই মানুষের জন্য আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কর্মপদ্ধতি বৈধ ও সঠিক হতে পারে না।

৩৩৫. এই বাক্যটিতে আরো দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী হবে এবং এককভাবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুই, পৃথিবী ও আকাশের যে একচ্ছত্র অধিপতির কাছে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞান রাখেন। এমনকি লোকদের গোপন সংকল্প এবং তাদের মনের সংগোপনে যেসব চিন্তা জাগে সেগুলোও তাঁর কাছে অপ্রকাশ নেই।

৩৩৬. এটি আল্লাহর অবাধ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর ওপর কোন আইনের বাঁধন নেই। কোন বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার ও মাফ করার পূর্ণ ইচ্ছাতির তাঁর রয়েছে।

৩৩৭. বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এই আয়াতে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে : আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া, তাঁর রসূলদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য সূচিত না করে (অর্থাৎ কাউকে মেনে নেয়া আর কাউকে না মেনে নেয়া) তাঁদেরকে স্বীকার করে নেয়া এবং সবশেষে আমাদের তাঁর সামনে হাযির হতে হবে, এ বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া। এ পাঁচটি বিষয় ইসলামের বুনিয়াদী আকীদার অন্তরভুক্ত। এই আকীদাগুলো মেনে নেয়ার পর একজন মুসলমানের জন্য নিম্নোক্ত কর্মপদ্ধতিই সঠিক

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
 لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا
 حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٧٠﴾

আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না। ৩৩৮
 প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে
 গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তারই ওপর বর্তাবে। ৩৩৯

(হে ইমানদারগণ, তোমরা এভাবে দোয়া চাও : হে আমাদের রব!
 ভুল-ত্রুটিতে আমরা যেসব গোনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না।
 হে প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা তুমি আমাদের
 পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। ৩৪০ হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা
 বহন করার সামর্থ আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। ৩৪১
 আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি
 করুণা করো। তুমি আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের মোকাবিলায় তুমি আমাদের
 সাহায্য করো। ৩৪২

হতে পারে : আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশগুলো আসবে সেগুলোকে সে মাথা পেতে
 গ্রহণ করে নেবে, সেগুলোর আনুগত্য করবে এবং নিজের ভালো কাজের জন্য অহংকার
 করে বেড়াবে না বরং আল্লাহর কাছে অবনত হতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

৩৩৮. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের সামর্থ অনুযায়ী তার দায়িত্ব বিবেচিত হয়।
 মানুষ কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখে না অথচ আল্লাহ তাকে সে কাজটি না করার জন্য
 জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এমনটি কখনো হবে না। অথবা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ বা জিনিস
 থেকে দূরে থাকার সামর্থই মানুষের ছিল না, সে ক্ষেত্রে তাতে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য
 আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে,
 নিজের শক্তি-সামর্থ আছে কিনা, এ সম্পর্কে মানুষ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।
 প্রকৃতপক্ষে মানুষের কিসের শক্তি-সামর্থ ছিল আর কিসের ছিল না—এ সিদ্ধান্ত একমাত্র
 আল্লাহ গ্রহণ করতে পারেন।

৩৩৯. এটি আল্লাহ প্রদত্ত মানবিক ইখতিয়ার বিধির দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে কাজ করেছে তার পুরস্কার পাবে। একজনের কাজের পুরস্কার অন্যজন পাবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে দোষ করেছে সে জন্য পাকড়াও হবে। একজন দোষ করবে আর অন্যজন পাকড়াও হবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। তবে এটা সম্ভব, এক ব্যক্তি কোন সংকাজের ভিত্তি রাখলো এবং দুনিয়ায় হাজার বছর পর্যন্ত তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো, এ ক্ষেত্রে এগুলো সব তার আমলনামায় লেখা হবে। আবার অন্য এক ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের ভিত্তি রাখলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত দুনিয়ায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো। এ অবস্থায় এগুলোর গোনাহ ঐ প্রথম জ্বালেমের আমলনামায় লেখা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ যা কিছু ফল হবে, সবই হবে মানুষের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি। মোটকথা যে ভালো বা মন্দ কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা, সংকল্প, প্রচেষ্টা ও সাধনার কোন অংশই নেই, তার শাস্তি বা পুরস্কার সে পাবে, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কর্মফল হস্তান্তর হওয়ার মতো জিনিস নয়।

৩৪০. অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীরা তোমার পথে চলতে গিয়ে যেসব পরীক্ষা, ভয়াবহ বিপদ, দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হয়, তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। যদিও আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করার সংকল্প করেছে, তাকেই তিনি কঠিন পরীক্ষা ও সংকটের সাগরে নিক্ষেপ করেছেন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মু'মিনের কাজই হচ্ছে, পূর্ণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করা, তবুও মু'মিনকে আল্লাহর কাছে এই দোয়াই করতে হবে যে, তিনি যেন তার জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা সহজ করে দেন।

৩৪১. অর্থাৎ সমস্যা ও সংকটের এমন বোঝা আমাদের ওপর চাপাও, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যে পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্ত্বাধীন তেমনি পরীক্ষায় আমাদের নিক্ষেপ করো। আমাদের সহ্য ক্ষমতার বেশী দুঃখ-কষ্ট-বিপদ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। তাহলে আমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো।

৩৪২. এই দোয়াটির পূর্ণ প্রাণসত্তা অনুধাবন করার জন্য এর নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটটি সামনে রাখতে হবে। হিজরাতের প্রায় এক বছর আগে মি'রাজের সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তখন মক্কায় ইসলাম ও কুফরের লড়াই চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলমানদের মাথায় বিপদ ও সংকটের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। কেবল মক্কাতেই নয়, আরব ভূ-খণ্ডের কোথাও এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে কোন ব্যক্তি দীন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার জন্য আল্লাহর যমীনে, বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েনি। এ অবস্থায় মুসলমানদের আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হলো। দানকারী নিজেই যখন চাওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেন তখন তা পাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই এই দোয়া সেদিন মুসলমানদের জন্য অসাধারণ মানসিক নিশ্চিন্ততার কারণ হয়। এ ছাড়াও এই দোয়ায় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে কখনো অসংগত ও অনুপযোগী ধারায় প্রবাহিত করো না বরং সেগুলোকে এই দোয়ার ছাঁচে ঢালাই করো। একদিকে নিছক সত্যানুসারিতা ও সত্যের প্রতি সমর্থন দানের

কারণে লোকদের ওপর যেসব হৃদয় বিদারক জুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে শত্রুদের বিরুদ্ধে সামান্য তিক্ততার নামগন্ধও নেই। একদিকে এই সত্যানুসারীরা যেসব শারীরিক দুর্ভোগ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে পার্থিব স্বার্থের সামান্য প্রত্যাশাও নেই, একদিকে সত্যানুসারীদের চরম দুরবস্থা দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়ায় উৎসারিত উন্নত ও পবিত্র আবেগ-উদ্দীপনা দেখুন। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সে সময় ঈমানদারদের কোন্ ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন দেয়া হচ্ছিল, তা সঠিক ও নির্ভুলভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

আলে ইমরান

৩

নামকরণ

এই সূরার এক জায়গায় “আলে ইমরানের” কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহ

প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকু'র প্রথম দু' আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

(আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে সারা দুনিয়াবাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।) অয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকু'র শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৯ হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকু'র শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকু'র শেষ অদি চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকু' থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলী

এই বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুগ্রন্থিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও একমুখীনতা। সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হচ্ছে, আহলি কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইমান এনেছিল।

সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও

চারিত্রিক দৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই রসূল এবং এই কুরআন এমন এক দীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার দাওয়াত দিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। এই দীনের সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও স্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ শুরু হয়েছিল এখানে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে সে কিতাবে কাজ করবে এবং যেসব আহুঁলি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করবে, তাও তাকে জানানো হয়েছে। ওহাদ যুদ্ধে তার মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্যও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি এবং নিজের অংশগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেনি বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিনিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভূত হচ্ছে।

নাযিলের কার্যকারণ

সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে :

এক : এই সত্য দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সূরা বাকারায় পূর্বাঙ্কেই যেসব পরীক্ষা, বিপদ-আপদ ও সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণ মাত্রায় সংঘটিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে ইমানদারগণ বিজয় লাভ করলেও এ যুদ্ধটি যেন ছিল ভীমরুলের চাকে টিল মারার মতো ব্যাপার। এ প্রথম সমস্ত সংঘর্ষটি আরবের এমন সব শক্তিগুলোকে অকস্মাত নাজ্জা দিয়েছিল যারা এ নতুন আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মুসলমানদের ওপর একটি নিরন্তর জীতি ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, চারপাশের সারা দুনিয়ার আক্রমণের শিকার মদীনার এ ক্ষুদ্র জনবসতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেয়া হবে। মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এ পরিস্থিতির অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। মদিনা ছিল তো একটি ছোট মফস্বল শহর। জনবসতি কয়েক শো ঘরের বেশী ছিল না। সেখানে হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমন। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তো এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার এই যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিল।

দুই : হিজরতের পর নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশপাশের ইহদী গোত্রগুলোর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তারা সেই চুক্তির প্রতি সামান্যতমও

সন্ধান প্রদর্শন করেনি। বদর যুদ্ধকালে এই আহলি কিতাবদের যাবতীয় সহানুভূতি তাওহীদ ও নবুয়াত এবং কিতাব ও আখেরাত বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে ছিল। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। বিশেষ করে বনী নযীরের সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ তো এ ব্যাপারে নিজের বিরোধমূলক প্রচেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদীনাবাসীদের সাথে এই ইহুদীদের শত শত বছর থেকে যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক চলে আসছিল তার কোন পরোয়াই তারা করেনি। শেষে যখন তাদের দুর্কর্ম ও চুক্তি তংগ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরে এই ইহুদী গোত্রগুলোর সবচেয়ে বেশী দুর্কর্মপরায়ণ 'বনী কাইনুকা' গোত্রের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদেরকে মদীনার শহরতলী থেকে বের করে দেন। কিন্তু এতে অন্য ইহুদী গোত্রগুলোর হিংসার আগুন আরো বেশী তীব্র হয়ে ওঠে। তারা মদীনার মুনাফিক মুসলমান ও হিজ্রাহের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চার দিকে অসংখ্য বিপদ সৃষ্টি করে। এমনকি কখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ নাশের জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালানো হয় এই আশংকা সর্বক্ষণ দেখা দিতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম সবসময় সশস্ত্র থাকতেন। নৈশ আক্রমণের ভয়ে রাতে পাহারা দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও চোখের আড়াল হতেন তাহলে সাহাবায়ে কেরাম উদ্বেগ আকুল হয়ে তাকে খুঁজতে বের হতেন।

তিন : বদরে পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, ইহুদীরা তার ওপর কেরোশিন ছিটিয়ে দিল। ফলে এক বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি দল মদীনা আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধটি হলো ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে। তাই ওহোদের যুদ্ধ নামেই এটি পরিচিত। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা থেকে এক হাজার লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পথে তিনশো মুনাফিক হঠাৎ আলাদা হয়ে মদীনার দিকে ফিরে এলো। নবীর (সা) সাথে যে সাতশো লোক রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ছোট দল ছিল। যুদ্ধ চলা কালে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করার সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো। এই প্রথমবার জানা গেলো, মুসলমানদের স্বর্গুহে এত বিপুল সংখ্যক আত্মীনের সাপ লুকানো রয়েছে এবং তারা এভাবে বাইরের শত্রুদের সাথে মিলে নিজেদের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

চার : ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যদিও মুনাফিকদের কৌশলের একটি বড় অংশ ছিল তবুও মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতার অংশও কম ছিল না। একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই সবেমাত্র গঠিত হয়েছিল, যার নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণ হতে পারেনি এবং নিজের বিশ্বাস ও নীতি সমর্থনে যার লড়াই করার এই মাত্র দ্বিতীয় সুযোগ ছিল তার কাছে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হওয়াটাই

একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই যুদ্ধের পর এই যুদ্ধের যাবতীয় ঘটনাবলীর ওপর বিস্তারিত মন্তব্য করা এবং তাতেই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটির প্রতি অংশুলি নির্দেশ করে তার সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার উপযোগিতা রাখে যে, অন্য জেনারেলরা নিজেদের যুদ্ধের পরে তার ওপর যে মন্তব্য করেন এ যুদ্ধের ওপরে কুরআনের মন্তব্য তা থেকে কত বিভিন্ন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা আলে ইমরান ১০-২০ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ
 شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۖ كَذَابٍ إِلَّا فِرْعَوْنُ ۖ وَالَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ كُلُّ بَوَابٍ آتِنَا ۖ فَأَخْلَٰهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۖ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتْغَابُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ
 وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۖ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ
 تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ۖ هُمْ يُؤْثِرُونَ ۖ مِثْلِهِم مِّثْلِهِم رَأَىٰ الْعَيْنُ
 ۖ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۖ

২ রুকু'

যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের না ধন-সম্পদ, না সন্তান-সন্ততি
 আল্লাহর মোকাবিলায় কোন কাজে লাগবে। তারা দোজখের ইন্ধনে পরিণত হবেই।
 তাদের পরিণাম ঠিক তেমনি হবে যেমন ফেরাউনের সার্থী ও তার আগের
 নায়কমানদের হয়ে গেছে : তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে,
 ফলে আল্লাহ তাদের গোনাহের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আর যথার্থই
 আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী। কাজেই হে মুহাম্মাদ! যারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ
 করতে অস্বীকার করলো, তাদের বলে দাও, সেই সময় নিকটবর্তী যখন তোমরা
 পরাজিত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আর
 জাহান্নাম বড়ই খারাপ আবাস। তোমাদের জন্য সেই দু'টি দলের মধ্যে একটি
 শিকার নিদর্শন ছিল যারা (বদরে) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর
 পথে যুদ্ধ করছিল এবং অন্য দলটি ছিল কাফের। চোখের দেখায় লোকেরা দেখছিল,
 কাফেররা মু'মিনদের দ্বিগুণ।^{১০} কিন্তু ফলাফল (প্রমাণ করলো যে) আল্লাহ তাঁর
 বিজয় ও সাহায্য দিয়ে যাকে ইচ্ছা সহায়তা দান করেন। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের
 জন্য এর মধ্যে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।^{১০}

ধরনের শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব আয়াতে এ ধরনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার
 করা হয়েছে সেগুলোকেই 'মুতাশাবিহাত' বলা হয়।

কিন্তু এ ভাষা ব্যবহারের ফলে মানুষ বড়জোর সত্যের কাছাকাছি পৌছতে পারে অথবা সত্যের অস্পষ্ট ধারণা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে, এর বেশী নয়। এ ধরনের আয়াতের অর্থ নির্ণয়ের ও নির্দিষ্ট করনের জন্য যত বেশী চেষ্টা করা হবে তত বেশী সংশয়-সন্দেহ ও সন্দাবনা বাড়তে থাকবে। ফলে মানুষ প্রকৃত সত্যের নিকটতর হবার চাইতে বরং তার থেকে আরো দূরে সরে যাবে। কাজেই যারা সত্যসন্ধানী এবং আজ্ঞেবাজে অর্থহীন বিষয়ের চর্চা করার মানসিকতা যাদের নেই, তারা 'মুতাশাবিহাত' থেকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকে। এতটুকু ধারণাই তাদের কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট হয়। তারপর তারা 'মুহকামাত' এর পেছনে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু যারা ফিত্নাবাজ অথবা বাজে কাজে সময় নষ্ট করতে অভ্যস্ত, তাদের কাজই হয় মুতাশাবিহাতের আলোচনায় মশগুল থাকা এবং তার সাহায্যেই তারা পেছন দিয়ে সিঁদ কাটে।

৭. এখানে এ অমূলক সন্দেহ করার কোন প্রস্রই ওঠে না যে, মুতাশাবিহাতের সঠিক অর্থ যখন তারা জানে না তখন তারা তার ওপর কেমন করে ঈমান আনে? আসলে একজন সচেতন বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তির মনে মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোর দূরবর্তী অসংগত বিশ্লেষণ ও অস্পষ্ট বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআন আগ্রাহর কিতাব হবার বিশ্বাস জন্মে না। এ বিশ্বাস জন্মে মুহকামাত আয়াতগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে। মুহকামাত আয়াতগুলোর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পর যখন তার মনে কুরআন আগ্রাহর কিতাব হবার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিততা আসে তখন মুতাশাবিহাত তার মনে কোন প্রকার দন্দ্ব ও সংশয় সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না। তাদের যতটুকু সরল অর্থ সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় ততটুকুই গ্রহণ করে নেয় আর যেখানে অর্থের জটিলতা দেখা দেয় সেখানে দূরবীণ লাগিয়ে অর্থের গভীরে প্রবেশ করার নামে উল্টা সিঁদা অর্থ করার পরিবর্তে সে আগ্রাহর কালামের ওপর সামগ্রিকভাবে ঈমান এনে কাজের কথাগুলোর দিকে নিজে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়।

৮. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১৬১ টীকা দেখুন।

৯. যদিও আসল পার্থক্য ছিল তিনগুণ। কিন্তু সরাসরি এক নজরে দেখে যে কেউ মনে করতে পারতো, 'কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের তিনগুণ হবে।

১০. বদরের যুদ্ধ মাত্র কিছুদিন আগে হয়ে গেছে। তার বিভিন্ন ঘটনা তখনো মানুষের মনে তরতাজা ছিল। তাই এ যুদ্ধের ঘটনাবলী ও ফলাফলের প্রতি ইধগিত করে লোকদের উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধের তিনটি বিষয় ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয় :

এক : মুসলমান ও কাফেররা যেভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল তাতে উভয় দলের নৈতিক ও চারিত্রিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে কাফেরদের সেনাবাহিনীতে মদপানের হিড়িক চলছিল। তাদের গায়িকা ও নর্তকী বাদীরা সঙ্গে এসেছিল। ফলে সেনা শিবিরে ভোগের পেয়ালা উপচে পড়ছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের সেনাদলে আগ্রাহত্বীতি ও আগ্রাহর প্রতি আনুগত্যের স্নিগ্ধ পরিবেশ বিরাজমান ছিল। তাদের মধ্যে ছিল চরম নৈতিক সংযম। সৈন্যরা নামায-রোযা মশগুল ছিল। কথায় কথায় আগ্রাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছিল এবং আগ্রাহর কাছে দোয়া ও করুণা ভিক্ষার মহড়া

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْأَرْبَابِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ ⑪
 قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
 تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ⑫ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا
 فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ⑬ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ
 وَالْقَنِيتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ⑭

মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনারপার ভূপ, সেরা ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষি
 ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো
 দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে
 আল্লাহর কাছে। বলো, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, ওগুলোর চাইতে
 ভালো জিনিস কি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের
 কাছে রয়েছে বাগান, তার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন
 জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সংগিনী^{১১} এবং তারা লাভ করবে
 আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তার বান্দাদের কর্মনীতির ওপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি
 রাখেন।^{১২} এ লোকেরাই বলে : “হে আমাদের রব! আমরা ইমান এনেছি,
 আমাদের গোনাহখাতা মাফ করে দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের
 বাঁচাও। এরা সবারকারী,^{১৩} সত্যনিষ্ঠ, অনুগত ও দানশীল এবং রাতের শেষভাগে
 আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করে থাকে।

চলছিল। দু’টি সৈন্য দল দেখে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজেই জানতে পারতো, কোন দলটি
 আল্লাহর পথে লড়াই করছে।

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٥﴾

আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।^{১৪} আর ফেরেশতা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে^{১৫} যে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

দুই : মুসলমানরা তাদের সংখ্যান্বিতা ও সমরাস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও যেভাবে কাফেরদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও উন্নত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সেনাদলের ওপর বিজয় লাভ করলো তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, তারা আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট ছিল।

তিন : আল্লাহর প্রবল প্রতাপাবিত ক্ষমতা সম্পর্কে গাফেল হয়ে যারা নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম ও সমর্থকদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আত্মশ্রুতিতে মেতে উঠেছিল, তাদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল যথার্থই একটি চাবুকের আঘাত। আল্লাহ কিভাবে মাত্র গুটিকয় বিস্ত্রহীন, অভাবী ও প্রবাসী মুহাজির এবং মদীনার কৃষক সমাজের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় কুরাইশদের মতো অভিজাত শক্তিশালী ও সমগ্র আরবীয় সমাজের মধ্যমণি গোত্রকে পরাজিত করতে পারেন, তা তারা স্বচক্ষেই দেখে নিল।

১১. এর ব্যাখ্যা দেখুন সূরা আল বাকারার ২৭ টিকায়।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ অপাত্রে দান করেন না। উপরি উপরি বা ভাসাতাসাতাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তার নীতি নয়। তিনি তার বান্দাদের কার্যাবলী, সৎকর্ম ও ইচ্ছা পুরোপুরি ও ভালোভাবেই জানেন। কে পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কে যোগ্য নয়, তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।

১৩. অর্থাৎ সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন ক্ষতি বা বিপদের মুখে কখনো সাহস ও হিম্মতহারা হয় না। ব্যর্থতা এদের মনে কোন চিড় ধরায় না। লোভ-লালসায় পা পিছলে যায় না। যখন আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষ্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না তখনো এরা মজবুতভাবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে। (সূরা আল বাকারার ৬০ টিকাটিও দেখে নিন)

১৪. অর্থাৎ যে আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত তত্ত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যার দৃষ্টি থেকে পৃথিবী ও আকাশের কোন একটি বস্তুও গোপন নেই—এটি তার সাক্ষ্য এবং তার চাইতে আর বেশী নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কারণ সমগ্র সৃষ্টিজগতে তিনি ছাড়া আর কোন সত্তা খোদায়ী গুণে গুণাবিত নয়। আর কোন সত্তা খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং আর কারোর খোদায়ী করার যোগ্যতাও নেই।

১৫. আল্লাহর পর সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হচ্ছে ফেরেশতাদের। কারণ তারা হচ্ছে বিশ্বরাজ্যের ব্যবস্থাপনা কার্যনির্বাহী ও কর্মচারী। তারা সরাসরি নিজেদের ব্যক্তিগত

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ أَسْلَمَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ إِلَّا
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ
 اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ
 اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ وَالْأَمِينَ ءَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا
 فَقُلْ اهْتَدَوْا ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

ইসলাম আগ্রাহর নিকট একমাত্র দীন—জীবনবিধান।^{১৬} যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা এ দীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এ ছাড়া আর কোন কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে।^{১৭} আর যে কেউ আগ্রাহর হেদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আগ্রাহর মোটেই দেৱী হয় না। এখন যদি এ শোকেরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের বলে দাও : "আমি ও আমার অনুগতরা আগ্রাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করেছি।" তারপর আহলি কিতাব ও অ-আহলি কিতাব উভয়কে জিজ্ঞেস করো, "তোমরাও কি তাঁর বন্দেগী কবুল করেছো?"^{১৮} যদি করে থাকে তাহলে ন্যায় ও সত্যের পথ লাভ করেছে আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তোমার ওপর কেবলমাত্র পয়গাম পৌছিয়ে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আগ্রাহ নিজেই তার রাস্তাদের অবস্থা দেখবেন।

জ্ঞানের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই বিশ্বরাজ্যে আগ্রাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলে না এবং পৃথিবী ও আকাশের পরিচালনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছাড়া আর কোন সত্তা এমন নেই যার কাছ থেকে তারা নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে। ফেরেশতাদের পরে এই সৃষ্টিজগতে আর যারাই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কম বেশী কিছুটা জ্ঞান রাখে, সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তকার তাদের সবার সর্বসম্মত সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, আগ্রাহ একাই এই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, পরিচালক ও প্রভু।

১৬. অর্থাৎ আগ্রাহর কাছে মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা ও একটি মাত্র জীবন বিধান সঠিক ও নির্ভুল বলে গৃহীত। সেটি হচ্ছে, মানুষ আগ্রাহকে নিজের মালিক ও মাবুদ বলে স্বীকার করে নেবে এবং তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও দাসত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে। আর তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতি নিজে আবিষ্কার করবে না। বরং তিনি নিজের নবী-রসূলগণের মাধ্যমে যে হিদায়াত ও বিধান পাঠিয়েছেন কোন প্রকার কমবেশী না করে তার অনুসরণ করবে। এই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নাম "ইসলাম"

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ ذَٰلِكَ لَهُمْ مِنْ نَصْرِنَ ۝

৩ রুকু'

যারা আল্লাহর বিধান ও হিদায়াত মানতে অস্বীকার করে এবং তাঁর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহার করে, যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ ও সততার নির্দেশ দেবার জন্য এগিয়ে আসে, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।^{১৯} এরা এমন সব লোক যাদের কর্মকাণ্ড (আমল) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নষ্ট হয়ে গেছে^{২০} এবং এদের কোন সাহায্যকারী নেই।^{২১}

আর বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির ও প্রভুর নিজের সৃষ্টিকূল ও প্রজা সাধারণের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কর্মপদ্ধতির বৈধতার স্বীকৃতি না দেয়াও পুরোপুরি ন্যায়সংগত। মানুষ তার নিবুদ্ধিতার কারণে নাস্তিক্যবাদ থেকে নিয়ে শিরক ও মূর্তিপূজা পর্যন্ত যে কোন মতবাদ ও যে কোন পদ্ধতির অনুসরণ করা নিজের জন্য বৈধ মনে করতে পারে কিন্তু বিশ্ব-জাহানের প্রভুর দৃষ্টিতে এগুলো নিছক বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে যে কোন যুগে যে নবীই এসেছেন, তাঁর দীনই ছিল ইসলাম। দুনিয়ার যে কোন জাতির ওপর যে কিতাবই নাযিল হয়েছে, তা ইসলামেরই শিক্ষা দান করেছে। এই আসল দীনকে বিকৃত করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে যেসব ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, তাদের জন্য ও উদ্ধবের কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, লোকেরা নিজেদের বৈধ সীমা অতিক্রম করে অধিকার, স্বার্থ ও বিশিষ্টতা অর্জন করতে চেয়েছে। আর এসব অর্জন করতে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশী মতো আসল দীনের আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও বিস্তারিত বিধান পরিবর্তন করে ফেলেছে।

১৮. অন্য কথায় এ বক্তব্যটিকে এভাবে বলা যায়, যেমন—“আমি ও আমার অনুসারীরা তো সেই নির্ভেজাল ইসলামের স্বীকৃতি দিয়েছি, যেটি আল্লাহর আসল দীন ও জীবন বিধান। এখন তোমরা বলো, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা দীনের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধন করেছো তা বাদ দিয়ে এই আসল ও প্রকৃত দীনের দিকে কি তোমরা ফিরে আসবে?”

১৯. এটি একটি ব্যাংগাত্মক বর্ণনাতত্ত্বী। এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, নিজেদের যে সমস্ত কীর্তিকলাপের দরুন তারা আজ আনন্দে ফুলে উঠেছে এবং মনে করছে যে তারা খুব ভালো কাজ করে বেড়াচ্ছে, তাদের জানিয়ে দাও, তোমাদের এ সমস্ত কাজের এই হচ্ছে প্রতিফল।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা আলে ইমরান ১৩০-১৪৩ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥٨﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٥٩﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِيسِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٢﴾

১৪ রুকু'

হে ঈমানদারগণ! এ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো^{১৫৮} এবং আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। সেই আগুন থেকে দূরে থাকো, যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং আল্লাহ ও রসুলের হুকুম মেনে নাও, আশা করা যায় তোমাদের ওপর রহম করা হবে। দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জ্বালাতের দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন।^{১৬২}

যাযনি যে, কাফেররা তখন অগ্রবর্তী হয়ে ব্যাপকভাবে আক্রমণ না চালিয়ে কিসের তাড়নায় নিজেরাই মক্কার ফিরে গিয়েছিল? মুসলমানরা এত বেশী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাদের পক্ষে পুনর্বার এক জায়গায় একত্র হয়ে যথারীতি যুদ্ধ শুরু করা কঠিন ছিল। কাফেররা তাদের বিজয়কে পূর্ণতার প্রান্তসীমায় পৌঁছাতে উদ্যোগী হলে তাদের সাফল্য লাভ অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তারা নিজেরাই বা কেন ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তা আজো অজানা রয়ে গেছে।

১৫. এখানে বনু সালুমা ও বনু হারেসার দিকে ইখতিগত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদের ময়দান থেকে সরে পড়ার কারণে তারা সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।

১৬. মুসলমানরা যখন দেখলেন, একদিকে শত্রুদের সংখ্যা তিন হাজার আর অন্যদিকে তাদের মাত্র এক হাজার থেকেও আবার তিনশো চলে যাচ্ছে, তখন তাদের

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
 فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ شَيْئًا يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ
 بَصُرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا ۖ
 بِهِمْ رِجْسٌ وَلَهُمْ فِي النَّارِ أَجْرٌ كَثِيرٌ ۖ تَجَرَّيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ خِلَافِ
 فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٥٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا ۖ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٥٧﴾ هَٰذَا بَيَانٌ
 لِلنَّاسِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٥٨﴾

আর যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা কোন গোনাহের কাজ করে নিজেদের ওপর জুলুম করে বসলে আবার সংগে সংগে আল্লাহর কথা শ্রবণ হয়ে তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহখাতার জন্য মাফ চায়—কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করতে পারেন—এবং জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জোর দেয় না, এ ধরনের লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদের প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে ঋণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সৎকাজ যারা করে তাদের জন্য কেমন চমৎকার প্রতিদান। তোমাদের আগে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা (আল্লাহর বিধান ও হিদায়াতকে) মিথ্যা বর্ণেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। এটি মানব জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।

মনোবল ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে একথা বলেছিলেন।

৯৭. আহত হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে কাকেরদের জন্য বদদোয়া নিঃসৃত হয় এবং তিনি বলেন : "যে জাতি তার নবীকে আহত করে সে কেমন করে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে?" এরি জবাবে এই আয়াত নাখিল হয়।

৯৮. ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের একটা বড় কারণ এই ছিল যে, ঠিক বিজয়ের মুহূর্তেই ধন-সম্পদের লোভ তাঁদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে এবং

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾
 إِنْ يَسْكُرْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوَّاءَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
 نُدَّأُولُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
 شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَيَهْطِقَ الْكُفْرِينَ ﴿٥٢﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ
 اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ كُنتُمْ
 تَمْنُونَ الْوَيْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَآيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٤﴾

মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো। এখন যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে এমনি ধরনের আঘাত লেগেছে তোমাদের বিরোধী পক্ষের গায়েও।^{১০০} এ-তো কালের উত্থান পতন, মানুষের মধ্যে আমি এর আবর্তন করে থাকি। এ সময় ও অবস্থাটি তোমাদের ওপর এ জন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সাক্ষা মু'মিন কে? আর তিনি তাদেরকে বাছাই করে নিতে চান, যারা যথার্থ (সত্য ও ন্যায়ের) সাক্ষী হবে।^{১০১}—কেননা জালামদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না—এবং তিনি এই পরীক্ষার মাধ্যমে সাক্ষা মু'মিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করতে চাইছিলেন। তোমরা কি মনে করে রেখেছো, তোমরা এমনিতেই জাহাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবারকারী। তোমরা তো মৃত্যুর আকাংখা করছিলে। কিন্তু এটা ছিল তখনকার কথা যখন মৃত্যু সামনে আসেনি। তবে এখন তা তোমাদের সামনে এসে গেছে এবং তোমরা স্বচক্ষে তা দেখছো।^{১০২}

নিজেদের কাছ পূর্ণরূপে শেষ করার পরিবর্তে তারা গনীমাতের মাল লুট করতে শুরু করে দেন। তাই মহাজ্ঞানী আল্লাহ এই অবস্থার সংশোধনের জন্য অর্থলিপ্সার উৎস মুখে বাঁধ বীধা অপরিহার্য গণ্য করেছেন এবং সুদ খাওয়া পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সুদের ব্যবসায় মানুষ দিন-রাত কেবল নিজের লাভ ও লাভ বৃদ্ধির হিসেবেই ব্যস্ত থাকে

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْتُمْ مَاتَ
 أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ
 شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿১০০﴾

১৫ রুকু'

মুহাম্মাদ একজন রসূল বৈ তো আর কিছুই নয়। তার আগে আরো অনেক রসূলও চলে গেছে। যদি সে মারা যায় বা নিহত হয়, তাহলে তোমরা কি পেছনের দিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করবে না, তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।

এবং এরই কারণে মানুষের মধ্যে অর্থ লালসা ব্যাপক ও সীমাহীন হারে বেড়ে যেতে থাকে।

৯৯. যে সমাজে সুদের প্রচলন থাকে সেখানে সুদখোরীর কারণে দুই ধরনের নৈতিক রোগ দেখা দেয়। সুদ গ্রহণকারীদের মধ্যে লোভ-লালসা, কৃপণতা ও স্বার্থান্বেষিতা এবং সুদ প্রদানকারীদের মধ্যে, ঘৃণা, ক্রোধ, হিসো ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। ওহোদের পরাজয়ে এ দুই ধরনের রোগের কিছু না কিছু অংশ ছিল। মহান আল্লাহ মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, সুদখোরীর কারণে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে নৈতিক গুণাবলীর সৃষ্টি হয় তার বিপরীত পক্ষে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের কারণে এসব তির্যক নৈতিক গুণাবলী জন্ম হয়। আল্লাহর ক্ষমা, দান ও জারাত অর্জিত হতে পারে এই দ্বিতীয় ধরনের গুণাবলীর মাধ্যমে, প্রথম ধরনের গুণাবলীর মাধ্যমে নয়। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা বাকারার ৩২০ টীকা দেখুন)

১০০. এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, বদর যুদ্ধের আঘাতে যখন কাকেররা হিমতহারা হয়নি তখন ওহোদ যুদ্ধের এই আঘাতে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলছো কেন?

১০১. কুরআনের মূল বাক্যটি হচ্ছে, وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ এর একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের থেকে কিছু সংখ্যক শহীদ নিতে চাইছিলেন। অর্থাৎ কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও মুনাফিক যে মিশ্রিত দলটি গড়ে উঠেছে তার মধ্য থেকে এমন সব লোকদের ছোট্ট আলাদা করে নিতে চাইছিলেন যারা আসলে عَلَى النَّاسِ (সমগ্র মানব জাতির ওপর সাক্ষী) অর্থাৎ এই মহান পদের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত। কারণ এই মহান ও মর্যাদাপূর্ণ পদেই মুসলিম উম্মাহকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ
يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكِرِينَ ﴿١٥٨﴾

কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো লেখা আছে।^{১০৪} যে ব্যক্তি দুনিয়াবী পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো। আর যে ব্যক্তি পরকালীন পুরস্কার^{১০৫} লাভের আশায় কাজ করবে সে পরকালের পুরস্কার পাবে এবং শোকরকারীদেরকে^{১০৬} আমি অবশ্যি প্রতিদান দেবো।

১০২. শোকদের শাহাদাত লাভের যে আকাংখার অত্যধিক চাপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাইরে এসে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানে সেই আকাংখার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

১০৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর অধিকাংশ সাহাবী সাহস হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় মুনাফিকরা (যারা মুসলমানদের সাথে সাথেই ছিল) বলতে থাকে : চলো আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে যাই। সে আমাদের জন্য আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তা এনে দেবে। আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলে ফেলে : যদি মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসুলই হতেন, তাহলে নিহত হলেন কেমন করে? চলো, আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মের দিকে ফিরে যাই। এ সমস্ত কথার জবাবে বলা হচ্ছে, তোমাদের “সত্যপ্রীতি” যদি কেবল মুহাম্মাদের (সা) ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে এবং তোমাদের ইসলাম যদি এতই দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে যে, মুহাম্মাদের (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সার্থে সাথেই তোমরা আবার সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, যা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছিলে, তাহলে আল্লাহর দীন তোমাদের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না।

১০৪. এ থেকে মুসলমানদের একথা বুঝানো হয়েছে যে, মৃত্যুর ভয়ে তোমাদের পালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ নেই। মৃত্যুর জন্য আল্লাহ যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার আগে কেউ মরতে পারে না এবং তার পরেও কেউ জীবিত থাকতে পারে না। কাজেই তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার চিন্তা না করে বরং জীবিত থাকার জন্য যে সময়টুকু পাচ্ছে সেই সময়ে তোমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য দুনিয়া না আখেরাত কোন্টি হবে, এ ব্যাপারে চিন্তা করো।

১০৫. পুরস্কার মানে কাজের ফল। দুনিয়ার পুরস্কার মানে, মানুষ তার প্রচেষ্টা ও কাজের ফল স্বরূপ এ দুনিয়ার জীবনে যে লাভ, ফায়দা ও মুনাফা হাসিল করে। আর আখেরাতের পুরস্কার মানে হচ্ছে, ঐ প্রচেষ্টা ও কাজের বিনিময়ে মানুষ তার আখেরাতের চিরন্তন জীবনের জন্য যে ফায়দা, লাভ ও মুনাফা অর্জন করবে। জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে তার দৃষ্টি ইহকালীন না পরকালীন ফল প্রাপ্তির

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা আশ্বিয়া ৭৬-৯৩ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আল আখিয়া

২১

নামকরণ

কোনো বিশেষ আয়াত থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়নি। এর মধ্যে যেহেতু ধারাবাহিকভাবে বহু নবীর কথা আলোচিত হয়েছে তাই এর নাম রাখা হয়েছে “আল আখিয়া”। এটাও সূরার বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং নিছক সূরা চিহ্নিত করার একটি আলামত মাত্র।

নাখিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাতংগী উভয়ের দৃষ্টিতেই মনে হয় এর নাখিলের সময়-কাল ছিল মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ আমাদের বিভক্তিকরণের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় ভাগে। শেষ ভাগের সূরাসমূহের মধ্যে অবস্থার যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এর পটভূমিতে তা ফুটে ওঠে না।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশ সর্দারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিল এ সূরায় তা আলোচিত হয়েছে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবী এবং তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করতো তার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে তাঁর মুকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হতো সেগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের অশুভ ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যে ধরনের গাফলতি ও ঔদ্ধত্যের মনোভাব নিয়ে তাঁর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের জন্য দুঃখ ও বিপদ মনে করছো তিনি আসলে তোমাদের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন।

ভাষ্যের মধ্যে বিশেষভাবে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো নিচে দেয়া হলো :

এক : মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না, মক্কার কাফেরদের এ বিভ্রান্তি এবং এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল মেনে নিতে অস্বীকার করাকে—
বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নিরসন ও খণ্ডন করা হয়েছে।

দুই : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা এবং কোনো একটি কথার ওপর অবিচল না থাকার—ওপর সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু অত্যন্ত জোরালো ও অর্থপূর্ণ পদ্ধতিতে পাকড়াও করা হয়েছে।

তিন : তাদের ধারণা ছিল, জীবন নেহাতই একটি খেলা, কিছুদিন খেলা করার পর তাকে এমননিই খতম হয়ে যেতে হবে, এর কোনো ফল বা পরিণতি ভুগতে হবে না। কোনো প্রকার হিসেব নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অবকাশ এখানে নেই।—যে ধরনের গাফলতি ও অবজ্ঞা সহকারে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছিল, ঐ ধারণাই যেহেতু তার মূল ছিল, তাই বড়ই হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে এর প্রতিকার করা হয়েছে।

চার : শিরকের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ছিল তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিরোধের মূল ভিত্তি।—এর সংশোধনের জন্য শিরকের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত কিন্তু মোক্ষম ও চিত্তাকর্ষক যুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

পাঁচ : এ ভুল ধারণাও তাদের ছিল যে, নবীকে বারবার মিথ্যা বলা সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর কোনো আযাব আসে না তখন নিশ্চয়ই নবী মিথ্যুক এবং তিনি আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আযাবের ভয় দেখান তা নিছক অন্তসারশূন্য হুমকি ছাড়া আর কিছুই নয়।—একে যুক্তি ও উপদেশ উভয় পদ্ধতিতে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপর নবীগণের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী থেকে কতিপয় নজির পেশ করা হয়েছে। এগুলো থেকে একথা অনুধাবন করানোই উদ্দেশ্য যে, মানবেতিহাসের বিভিন্ন যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব পয়গম্বর এসেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন মানুষ। নবুওয়াতের বিশিষ্ট গুণ বাদ দিলে অন্যান্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের মতোই মানুষ ছিলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী এবং খোদায়ীর সামান্যতম গঙ্গও তাদের মধ্যে ছিল না। বরং নিজেদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের জন্য তারা সবসময় আল্লাহর সামনে হাত পাততেন। এই সংগে একই ঐতিহাসিক নজির থেকে আরো দু'টি কথাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, নবীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ এসেছে এবং তাঁদের বিরোধীরাও তাঁদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সকল নবী একই দীনের অনুসারী ছিলেন এবং সেটি ছিল সেই দীন যেটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করছেন। এটিই মানব সম্প্রদায়ের আসল ধর্ম। বাদবাকি যতগুলো ধর্ম দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিছক পঞ্চভ্রষ্ট মানুষদের বিভেদাত্মক প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, এ দীনের অনুকরণ ও অনুসরণের ওপরই মানুষের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। যারা এ দীন গ্রহণ করবে তারাই আল্লাহর শেষ আদালত থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে এবং তারাই হবে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। আর যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা আখেরাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হবে। শেষ বিচারের সময় আসার আগেই আল্লাহ নিজের নবীর মাধ্যমে মানুষকে এ সত্য সম্পর্কে

অবহিত করে চলছেন, এটি তাঁর বিরাট মেহেরবানী। এ অবস্থায় নবীর আগমনকে যারা নিজেদের জন্য রহমতের পরিবর্তে ধ্বংস মনে করে তারা অজ্ঞ ও মূর্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ وَنَصْرَ لَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا ۖ فَآغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۙ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمَرَاتُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۙ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكَلَّمْنَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَاوَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۙ

৬ রুকু'

আর এ একই নিয়ামত আমি নূহকে দান করেছিলাম। স্বরণ করো যখন এদের সবার আগে সে আমাকে ডেকেছিল, ৬৮ আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাবিপদ ৬৯ থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর এমন সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাকে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল। তারা খুবই খারাপ লোক ছিল, কাজেই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

আর এ নিয়ামতই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে দান করেছিলাম। স্বরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তারা উভয়ই একটি শস্য ক্ষেতের মোকদ্দমার ফায়সালা করছিল, যেখানে রাতের বেলা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য লোকদের ছাগল এবং আমি নিজেই দেখছিলাম তাদের বিচার। সে সময় আমি সুলাইমানকে সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, অথচ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমি উভয়কেই দান করেছিলাম। ৭০

দাউদের সাথে আমি পর্বতরাজী ও পক্ষীকুলকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো, ৭১ এ কাজের কর্তা আমিই ছিলাম।

পূর্বাংগেই তাকে এ পরিকল্পনার খবর দেয়। ফলে হযরত ইবরাহীম পালিয়ে হযরত নূহের কাছে আশ্রয় নেন। সেখানে তারেহ এসে তাঁর সাথে গোপনে দেখা করতে থাকে। শেষে পিতাপুত্র পরামর্শ করে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করা হয়। হযরত নূহ ও সামও এ পরিকল্পনা সমর্থন করেন। এভাবে তারেহ স্বীয় পুত্র ইবরাহীম, পৌত্র নূত এবং পৌত্রি ও পুত্রবধু সারাহকে নিয়ে উর থেকে হারান চলে আসে। (তালমূদ নির্বাচিত অংশ, এইচ, পোলানো লন্ডন, পৃষ্ঠা ৩০-৪২)

এ বর্ণনা দেখে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি একথা বলতে পারে যে, এটি কুরআনের উৎস হতে পারে ?

৬৭. মূলে “হকুম ও ইলম” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন সাধারণত হকুম ও ইলম দান নবুওয়াত দান করার সমার্থক হয়। “হকুম” অর্থ প্রজ্ঞাও হয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও হয়, আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব করার বিধিসংগত অনুমতি (Authority) লাভও হয়। আর “ইলম”-এর অর্থ হচ্ছে এমন সত্য ও যথার্থ ইলম যা অহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছে। হযরত নূতের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানানোর জন্যে দেখুন সূরা আ’রাফ ৮০-৮৪, সূরা হুদ ৬৯-৮৩ এবং সূরা আল হিজর ৫৭-৭৬ আয়াত।

৬৮. হযরত নূহের দোয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল নিজের জাতির সংশোধনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার পর শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যে দোয়া করেছিলেন **اِنِّى مَظْلُوْبٌ فَانصُرْ** “পরওয়ারদেগার ! আমি হেরে গেছি আমাকে সাহায্য করো।” (আল কামার : ১০) এবং **رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ بَيْرًا** “হে আমার রব! পৃথিবী পৃষ্ঠে একজন কাকেরকেও ছেড়ে দিয়ো না।” (সূরা নূহ : ২৬)

৬৯. “মহাবিপদ” অর্থ একটি অসং কর্মশীল জাতির মধ্যে জীবন যাপন করার বিপদ অথবা মহাপ্রাণ। হযরত নূহের কাহিনী বিস্তারিত জানানোর জন্যে দেখুন সূরা আল আ’রাফ ৫৯ থেকে ৬৪, সূরা ইউনুস ৭১ থেকে ৭৩, সূরা হুদ ২৫-৪৮ এবং বনী ইসরাঈল ৩ আয়াতসমূহ।

৭০. বাইবেলে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়নি। ইহুদী সাহিত্যেও আমরা এর কোনো চিহ্ন দেখি না। মুসলমান তাকসীরকারগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির শস্যক্ষেতে অন্য এক ব্যক্তির ছাগলগুলো রাতের বেলা ঢুকে পড়ে। সে হযরত দাউদের কাছে অভিযোগ করে। তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির ছাগলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে প্রথম ব্যক্তিকে দিয়ে দেবার ফায়সালা শুনিতে দেন। হযরত সূলায়মান এ ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি রায় দেন, ছাগলগুলো ততদিন পর্যন্ত ক্ষেতের মালিকের কাছে থাকবে যতদিন না সে আবার নিজের ক্ষেত শস্যে পূর্ণ করে নিতে পারে। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলছেন, সূলায়মানকে এ ফায়সালাটি আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু মোকদ্দমার এ বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে বর্ণিত হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীসেও এ বিবরণ আসেনি তাই একথা বলা যেতে পারে না যে, এ ধরনের মামলায় এটিই ইসলামী শরীয়াতের প্রামাণ্য আইন। এ কারণেই হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও অন্যান্য ইসলামী ফকীহগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে যে, যদি কারো ক্ষেত অন্যের পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা এবং দিতে হলে কোন্ অবস্থায় হবে এবং কোন্ অবস্থায় হবে না, তাছাড়া কিভাবে এ ক্ষতিপূরণ করা হবে। ?

এ প্রেক্ষাপটে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সূলায়মান (আ) এ বিশেষ ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, নবীগণ নবী হবার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অসাধারণ শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষই হতেন। আল্লাহর সার্বভৌম

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে থাকতো না। এ মোকদ্দমার ব্যাপারে অহীর মাধ্যমে হযরত দাউদকে সাহায্য করা হয়নি। ফলে তিনি ফায়সালা করার ব্যাপারে ভুলের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে হযরত সুলায়মানকে অহীর মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে, ফলে তিনি সঠিক ফায়সালা দিয়েছেন। অথচ দু'জনই নবী ছিলেন। সামনের দিকে এ উভয় নবীর যেসব দক্ষতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাও একথা বুঝাবার জন্যে যে, এসব আল্লাহ প্রদত্ত দক্ষতা এবং এ ধরনের দক্ষতার কারণে কেউ আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে যায় না।

এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারের এ মূলনীতিও জানা যায় যে, দু'জন বিচারপতি যদি একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করে এবং দুজনের ফায়সালা বিভিন্ন হয়, তাহলে যদিও একজনের ফায়সালাই সঠিক হবে তবুও দু'জনেই ন্যায়বিচারক বিবেচিত হবেন। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে বিচার করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাদের কেউ যেন অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা সহকারে বিচারকের আসনে বসে না যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথা আরো বেশী সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। বুখারীতে আমার ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا اجْتَهَدَ فَاَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ

“যদি বিচারক নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী ফায়সালা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান, তাহলে সঠিক ফায়সালা করার ক্ষেত্রে তিনি দু'টি প্রতিদান পাবেন এবং ভুল ফায়সালা করলে পাবেন একটি প্রতিদান।

আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় বুরাইদার (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নবী (স) বলেছেন : “বিচারক তিন প্রকারের। এদের একজন জ্ঞানাতী এবং দু'জন জাহান্নামী। জ্ঞানাতীর অধিকারী হচ্ছেন এমন বিচারক, যিনি সত্য চিহ্নিত করতে পারলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য চিহ্নিত করার পরও সত্য বিরোধী ফায়সালা দেয় সে জাহান্নামী। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই লোকদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতে বসে যায় সেও জাহান্নামী।”

৭১. মূল **لَاؤُدُ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, **لَاؤُدُ** বলা হয়নি। অর্থাৎ “দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য” নয় বরং “তীর সাথে” পাহাড় ও পাখীদেরকে অনুগত করা হয়েছিল এবং সে কারণে তারাও হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতো। একথাটিই সূরা সাদ-এ বলা হয়েছে :

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ ۝ وَالطُّيْرَ مَحْشُورَةً ۝ كُلٌّ لَّهِ اَوَابٌ ۝

“আমি তার সাথে পাহাড়গুলোকে অনুগত করে দিয়েছিলাম। সকাল-সন্ধ্যে তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর পাখিদেরকেও অনুগত করা হয়েছিল। তারা একত্র হতো, সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করতো।”

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لْتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ
 أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَسْلَيْمٌ الرَّبِّمْ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى
 الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا مَاءً وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٢٦﴾ وَمِنْ
 الشَّيْطَانِ مَنْ يَفْضُؤُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا
 لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٢٧﴾

আর আমি তাকে তোমাদের উপকারার্থে বর্ম নির্মাণ শিল্প শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করে,^{৭২} তাহলে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে ?^{৭৩} আর সুলাইমানের জন্য আমি প্রবল বায়ু প্রবাহকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে এমন দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছিলাম^{৭৪} আমি সব জিনিসের জ্ঞান রাখি। আর শয়তানের মধ্য থেকে এমন অনেককে আমি তার অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো এবং এছাড়া অন্য কাজও করতো, আমিই ছিলাম এদের সবার তত্ত্বাবধায়ক।^{৭৫}

সূরা সাবায় এর ওপর অতিরিক্ত বলা হয়েছে يَا جِبَالُ اُوبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرُ “পাহাড়গুলোকে আমি হকুম দিয়েছিলাম যে, তাঁর সাথে সাথে পৰ্ব্বতভা ও মহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করে এবং এই একই হকুম পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম।” এ বক্তব্যগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত দাউদ যখন আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা গীতি গাইতেন তখন তাঁর উচ্চতর ও সুরেলা আওয়াজে পাহাড় গুঞ্জরিত হতো, পাখিরা থেমে যেতো এবং একটা অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি হতো। এ অর্থের সমর্থন একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার হযরত আবু মুস্‌ আশ’আরী (রা) কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আওয়াজ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ শুনতে থাকলেন। তার পড়া শেষ হলে তিনি বললেন داود لقد اوتى زممارا من زماعير ال داود অর্থাৎ এ ব্যক্তি দাউদের সুরেলা কণ্ঠের একটা অংশ পেয়েছে।

সূরা সাবায় এর ওপর আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে :

وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتْ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ

“আর আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি (এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছি) যে, পূর্ণমাপের বর্ম তৈরি করো এবং বুনন করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাণ রক্ষা করো।”

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ হযরত দাউদকে লোহা ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। বিশেষ করে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বর্ম নির্মাণের কায়দা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ আয়াতের অর্থের ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে লৌহ যুগ (Iron age) শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ১২০০ ও ১০০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে। আর এটিই ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের যুগ। প্রথম দিকে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের হিট্টী (Hittites) জাতি লোহা ব্যবহার করে। ২০০০ থেকে ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ জাতির উত্থান দেখা যায়। তারা লোহা গলাবার ও নির্মাণের একটা জটিল পদ্ধতি জানতো। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে তারা একে কঠোরভাবে গোপন রাখে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে যে লোহা তৈরি হতো তা সোনা রূপার মতো এত বেশী মূল্যবান হতো যে, তা সাধারণ কাজে ব্যবহার করা যেত না। পরে ফিলিস্তিনীরা এ পদ্ধতি ছেনে নেয় এবং তারাও একে গোপন রাখে। তালুতের রাজত্বের পূর্বে হিট্টী ও ফিলিস্তিনীরা বনী ইসরাঈলকে যেভাবে উপর্যুপরি পরাজিত করে ফিলিস্তীন থেকে প্রায় বেদখল করে দিয়েছিল বাইবেলের বর্ণনা মতে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, তারা লোহার রথ ব্যবহার করতো এবং তাদের কাছে লোহার তৈরি অন্যান্য অস্ত্রও থাকতো। (যিহোশূয় ১৭ : ১৬, বিচারকর্ভূগণ ১ : ১৯, ৪ : ২-৩) খৃষ্ট পূর্ব ১০২০ অব্দে তালুত যখন আল্লাহর হুকুমে বনী ইসরাঈলদের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি তাদেরকে পরপর কয়েকবার পরাজিত করে ফিলিস্তিনের বেশীর ভাগ অংশ তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন। তারপর হযরত দাউদ (১০০৪-৯৬৫ খৃঃ পূঃ) শুধুমাত্র ফিলিস্তীন ও ট্রান্স জর্দানই নয় বরং সিরিয়ারও বড় অংশে ইসরাঈলী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় লৌহ নির্মাণ শিল্পের যে গোপন কলাকৌশল হিট্টী ও ফিলিস্তিনীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং কেবলমাত্র উন্মোচিত হয়েই থেমে যায়নি বরং লৌহ নির্মাণের এমন পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয় যার ফলে সাধারণ ব্যবহারের জন্য লোহার কম দামের জিনিসপত্রও তৈরি হতে থাকে। ফিলিস্তিনের দক্ষিণে আদম্ এলাকা আকরিক লোহার (Iron ore) সমৃদ্ধ ছিল। সম্প্রতি এ এলাকায় যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানো হয় তার ফলে এমন অনেক জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ পাওয়া গেছে যেখানে লোহা গলাবার চুল্লী বসানো ছিল। আকাবা ও আইলার সাথে সংযুক্ত হযরত সূলায়মান আলাইহিস সালামের জামানার বন্দর ইসরুন জাবেরের প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে যে চুল্লী পাওয়া গেছে তা পর্যবেক্ষণের পরে অনুমান করা হয়েছে যে, তার মধ্যে এমনসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো যা আজকের অত্যাধুনিক যুগের Blast Furnace এ প্রয়োগ করা হয়। এখন স্বাভাবিকভাবেই হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সবার আগে ও সবচেয়ে বেশী করে এ নতুন আবিষ্কারকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকবেন। কারণ কিছুকাল আগেই আশপাশের শত্রু জাতিরা এ লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে তাঁর জাতির জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল।

৭৩. হযরত দাউদ সম্পর্কে আরো বেশী জ্ঞানের জন্য দেখুন সূরা আল বাকারাহ ২৫১ আয়াত ও বনী ইসরাঈল ৭, ৬৩ টীকা)

৭৪. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সূরা সাবায় এভাবে :

وَلَسَلِمْنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاجُهَا شَهْرٌ

“আর সূলায়মানের জন্য আমি বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।”

এর আরো বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে সূরা সাদ-এ। সেখানে বলা হয়েছে :

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ يَشَاءُ .

“কাজেই আমি তার জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে সহজে চলাচল করতো যেদিকে সে যেতে চাইতো।”

এ থেকে জানা যায়, বাতাসকে হযরত সূলায়মানের হুকুমে এভাবে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর রাজ্যের এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত যে কোনো স্থানে তিনি সহজে সফর করতে পারতেন। যাওয়ার সময়ও সবসময় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনুকূল বাতাস পেতেন আবার ফেরার সময়ও। বাইবেল ও আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ বিষয়বস্তুর ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, হযরত সূলায়মান তাঁর রাজত্বকালে নৌবাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। একদিকে ইসমুন্ জাবের বন্দর থেকে তাঁর বাণিজ্য বহর লোহিত সাগরে ইয়ামেন এবং অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ দেশসমূহে যাতায়াত করতো এবং অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহ থেকে তাঁর নৌবহর (যাকে বাইবেলে তর্শীশী নৌবহর বলা হয়েছে) পশ্চিম দেশসমূহে যেতো। ইসমুন্ জাবের তাঁর সময়ের যে বিশাল চুল্লী পাওয়া গেছে তার সাথে তুলনীয় কোনো চুল্লী আজ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়নি। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণের মতে এখানে আদুমের আরাবাহ এলাকার খনি থেকে আশোধিত লোহা ও তামা আনা হতো এবং এই চুল্লীতে গলাবার পর সেগুলো অন্যান্য কাজ ছাড়া জাহাজ নির্মাণ কাজেও ব্যবহার করা হতো। এ থেকে কুরআন মজীদে হযরত সূলায়মান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সূরা সাবায় যে কথা বলা হয়েছে **وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَظْرِ** (আর আমি তার জন্য গলিত ধাতুর বরগা প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম) তার ওপর আলোকপাত হয়। তাছাড়া এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সামনে রাখলে হযরত সূলায়মানের জন্য এক মাসের পথ পর্যন্ত বায়ু প্রবাহকে “বশীভূত” করার অর্থ অনুধাবন করা যায়। সেকালে সামুদ্রিক সফর পুরোপুরি অনুকূল বাতাসের ওপর নির্ভর করতো। মহান আল্লাহ হযরত সূলায়মানের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন, যার ফলে তাঁর দুটি সামুদ্রিক বহর সবসময় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এই অনুকূল বাতাস পেতো। তবুও যদি বাতাসের ওপর হযরত সূলায়মানকে হুকুম চালাবার কোনো কর্তৃত্ব ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে যেমন **تَجْرِي بِأَمْرِهِ** (তার হুকুমে চলতো) এর শব্দাবলীর বাহ্যিক অর্থ থেকে মনে হয়, তাহলে আল্লাহর কুদরাতের জন্য এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তিনি নিজের রাজ্যের মালিক। নিজের যে কোনো বাস্তুকে যে কোনো ক্ষমতা তিনি চাইলে দিতে পারেন। তিনি কাউকে কোনো ইখতিয়ার ও ক্ষমতা দান করলে আমাদের মনকষ্টের কোনো কারণ নেই।

৭৫. সূরা সাবা-য় এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে :

وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۚ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجِفَانٍ
كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رُسِيَّتٍ ۖ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى
مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانَوْا
يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝ - سبا : ১২-১১

“আর জিনদের মধ্য থেকে এমন জিনকে আমি তার জন্য অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো। আর তাদের মধ্য থেকে যে কেউ আমার হুকুম অমান্য করতো আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাদ আশ্বাদন করালাম। তারা তার জন্য যেমন সে চাইতো প্রাসাদ, মূর্তি, হাউজের মতো বড় আকারের পাত্র এবং দৃঢ় ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করতো।.....তারপর যখন আমি সূলায়মানকে মৃত্যু দান করলাম, এই জিনদেরকে তার মৃত্যুর কথা জানালো কেবল মাটির পোকা (অর্থাৎ ঘূণ) যারা তার লাঠি খাচ্ছিল। তাই যখন সে পড়ে গেলো তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি সত্যিই অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে এত দীর্ঘ সময় সময় আবদ্ধ থাকতো না।” এ আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত সূলায়মানকে যেসব জিনের ওপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল এবং যারা তাঁর বিভিন্ন কাজ করে দিতো তারা এমন পর্যায়ে জিন ছিল যাদের সম্পর্কে আরব মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল এবং তারা নিজেরাও এ ভুল ধারণা পোষণ করতো যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে। এখন যে ব্যক্তি সতর্ক দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ পড়বে এবং নিজের পূর্বাহ্নের বন্ধমূল ধ্যান-ধারণার অনুসারী না হয়ে পড়বে, সে নিজেই দেখে নিতে পারে যেখানে কুরআন নির্বিশেষে “শয়তান” ও “জিন” শব্দ ব্যবহার করে সেখানে তার অর্থ হয় কোন ধরনের সৃষ্টি এবং আরবের মুশরিকরা যাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করতো কুরআনের দৃষ্টিতে তারা কোন ধরনের জিন।

আধুনিক যুগের মুফাসসিরগণ একথা প্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন যে, হযরত সূলায়মানের জন্য যেসব জিন ও শয়তানকে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল তারা মানুষ ছিল এবং আশেপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের শব্দাবলীর মধ্যে তাদের এ ধরনের জটিল অর্থ করার শুধু যে, কোনো অবকাশই নেই তাই নয় বরং কুরআনের যেখানেই এ ঘটনাটি এসেছে সেখানে আগে পিছের আলোচনা ও বর্ণনাতংগীই এ অর্থের পথে পরিষ্কার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। হযরত সূলায়মানের জন্য ইমারত নির্মাণকারীরা যদি মানুষই হয়ে থাকবে তাহলে তাদের এমন কি বিশেষত্ব ছিল যে, তাদের কথা কুরআন মজীদে এমন বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ?

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الضُّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّحِيمِينَ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ
أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مِّمَّا رَزَقْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ۝

আর (এ একই বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান) আমি আইয়ুবকে দিয়েছিলাম।^{৭৬} স্বরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাকলো, “আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।”^{৭৭} আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম।^{৭৮} এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য।^{৭৯}

মিসরের পিরামিড থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের গগনচুম্বী ইমারতগুলো পর্যন্ত কোনটি মানুষ তৈরি করেনি? অথচ কোনো বাদশাহ, ধনকুবের ও বিশ্বখ্যাত ব্যবসায়ীর জন্য এমন ধরনের “জিন” ও “শয়তান” সরবরাহ করা হয়নি যা হযরত সুলামানের জন্য করা হয়েছিল।

৭৬. হযরত আইয়ুবের (আ) ব্যক্তিত্ব, সময়, জাতীয়তা সব বিষয়েই মতবিরোধ আছে। আধুনিক যুগের মুফাসসিরগণের মধ্য থেকে কেউ তাঁকে ইসরাঈলী গণ্য করেন। কেউ বলেন, তিনি মিসরীয়। আবার কেউ বলেন, আরব ছিলেন। কারো মতে, তিনি ছিলেন হযরত মুসার পূর্ববর্তীকালের লোক। কেউ বলেন, তিনি হযরত দাউদ (আ) ও সুলায়মানের (আ) আমলের লোক। আবার কেউ তাঁকে তাঁদেরও পরবর্তীকালের পুরাতন নিয়মে সংযোজিত ইয়োব তথা আইয়ুবের সফর বা আইয়ুবের সহীফা। তার ভাষা, বর্ণনা ভংগী ও বক্তব্য দেখে এসব বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এ ইয়োব বা আইয়ুবের সহীফার অবস্থা হচ্ছে এই যে, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে বৈপরিত্য এবং এর বর্ণনা কুরআন মজীদে বর্ণনা থেকে এত বেশী ভিন্নতর যে, উভয়কে একসাথে মেনে নেয়া যেতে পারে না। কাজেই আমরা এর ওপর একটুও নির্ভর করতে পারি না। বড় জোর নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য যদি কিছু হয় তাহলে তা হচ্ছে এই যে, ইয়াসইয়াহ (যিসাই) নবী ও হিয়কীইল (যিহিক্কেল) নবীর সহীফায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সহীফা দু’টি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। ইয়াসইয়াহ নবী খৃষ্টপূর্ব অষ্টম এবং হিয়কীইল নবী খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম খৃষ্টপূর্ব নবম শতক বা এরও পূর্বের নবী ছিলেন। তাঁর জাতীয়তা সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সূরা নিসার ১৬৩ ও সূরা আনআমের ৮৪ আয়াতে যেভাবে তাঁর আলোচনা এসেছে তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ওহাব

ইবনে মুনাবিহের এ বর্ণনাও একেবারে অযৌক্তিক নয় যে, তিনি হযরত ইসহাকের (আ) পুত্র ইস্র বংশধর ছিলেন।

৭৭. দোয়ার ধরন অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়। সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন—“তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।” পরে কোনো অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোনো জিনিসের দাবী নেই। দোয়ার এই ভংগিমা যে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোনো পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্রিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোনো পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়। “আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল।” এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না।

৭৮. সূরা সাদের চতুর্থ রুকুতে এর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁকে বলেন :

أَرْكَضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مِفْتَاسَ بَارِدٍ وَشَرَابٍ

“নিজের পা দিয়ে আঘাত করো, এ ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য।”

এ থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণাধারা প্রবাহিত করেন। এ ঝরণার পানির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময়ে এদিকে ইংগিত করে যে, তাঁর কোনো মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল। বাইবেলের বর্ণনাও এর সমর্থক। বাইবেল বলছে, তাঁর সমস্ত শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল।

(ইসোব ২ : ৭)

৭৯. এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে কুরআন মজীদ হযরত আইয়ুবকে এমনভাবে পেশ করেছে যার ফলে তাঁকে সবরের প্রতিমূর্তি মনে হয়। এরপর কুরআন বলছে, তাঁর জীবন ইবাদাতকারীদের জন্য একটি আদর্শ। অন্যদিকে বাইবেলের আইয়ুবের সহীফা (ইসোব) পড়লে সেখানে এমন এক ব্যক্তির ছবি ফুটে উঠবে যিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার এবং নিজের বিপদের জন্য আপাদমস্তক ফরীয়াদী হয়ে আছেন। বারবার তাঁর মুখ থেকে এ বাক্যটি নিঃসৃত হচ্ছে : “বিলুপ্ত হোক সেদিন যেদিন আমার জন্য হয়েছিল।” “আমি কেন গর্ভে মরে যাইনি ?” “মায়ের পেট থেকে বের হওয়া মাত্র আমি কেন প্রাণত্যাগ করিনি ?” বারবার তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন “সর্বশক্তিমানের বান আমার ভিতরে প্রবিষ্ট, আমার আত্মা তাঁরই বিষণ্ণ করছে, ঈশ্বরীয় ত্রাসদল আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ।” “হে মনুষ্য দর্শক, আমি যদি পাপ করে থাকি, তবে আমার কর্মে তোমার কি হয় ? তুমি কেন আমাকে তোমার শর লক্ষ করেছে ? আমি তো আপনার ভার আপনি হয়েছি। তুমি আমার অধর্ম ক্ষমা কর না কেন ? আমার অপরাধ দূর কর না কেন ?” “আমি ঈশ্বরকে বলবো আমাকে দোষী করো না ; আমাকে বল আমার সাথে কি কারণে বিবাদ করছো। এটা কি ভাল যে, তুমি উপদ্রব করবে ? তোমার হস্তনির্মিত বস্তু তুমি তুচ্ছ

করবে ? দুষ্টগণের মন্ত্রণায় এসন্ন হবে ?" তাঁর তিন বন্ধু এসে তাঁকে সাহুনা দেন এবং ধৈর্য, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টিলাভ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা শুনেন না। তিনি তাদের পরামর্শের জবাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনতে থাকেন। এবং তাদের শত বুঝাবার পরও জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে, আল্লাহর এ কাজের মধ্যে কোনো প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নেই, আছে শুধু একটা জুলুম, যা আমার মতো মুতাকী ও ইবাদাতকারী ব্যক্তির প্রতি করা হচ্ছে। তিনি আল্লাহর ব্যবস্থাপনার কঠোর সমালোচনা করেন 'এই বলে যে, একদিকে দুষ্টকারীদেরকে অনুগৃহীত করা হয় এবং অন্যদিকে সুকৃতকারীদেরকে জুলুম নির্ঘাতনে অতিষ্ঠ করা হয়। নিজের সংকর্মগুলোকে তিনি এক এক করে গণনা করেন তারপর এর প্রতিদানে আল্লাহ তাঁকে যেসব কষ্ট দিয়েছেন সেগুলো বর্ণনা করতে থাকেন এবং এরপর বলেন, আল্লাহর কাছে যদি কোনো জবাব থাকে তাহলে তিনি বলুন কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমার সাথে এ ব্যবহার করা হয়েছে? নিজের সৃষ্টি ও প্রভুর বিরুদ্ধে তাঁর এ অভিযোগ ধীরে ধীরে এত বেশী বেড়ে যেতে থাকে যে, শেষে তাঁর বন্ধুরা তাঁর কথার জবাব দেয়া বন্ধ করে দেন। তারা চুপ করে যান। তখন চতুর্থ এক ব্যক্তি, যিনি তাঁদের কথা নিরবে শুনছিলেন, মাঝখান থেকে হস্তক্ষেপ করেন এবং আইয়ুবকে এ ব্যাপারে ভীষণভাবে তিরস্কার করতে থাকেন যে, "তিনি তো আল্লাহকে নয় বরং নিজেকে সঠিক গণ্য করছেন।" এ ভাষণ শেষ হবার আগেই মাঝখান থেকে আল্লাহ নিজেই বলে ওঠেন এবং তারপর তাঁর ও আইয়ুবের মধ্যে খুব মুখোমুখী বিতর্ক হতে থাকে। এ পুরো কাহিনীটি পড়তে পড়তে আমরা একবারও অনুভব করি না যে, আমরা এমন এক অভুলনীয় ধৈর্যশীল নবীর অবস্থা ও কথা পড়ছি যার চিত্র কুরআন ইবাদাতকারীদের জন্য শিক্ষণীয় ও আদর্শ হিসেবে পেশ করছে।

বিশ্বের ব্যাপার হচ্ছে, এ পুস্তকের প্রথম অংশ এক ধরনের কথা বলে, মাঝখানের অংশ বলে ভিন্ন কথা এবং শেষে ফলাফল দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্য কিছু। এ তিন অংশের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য নেই। প্রথম অংশ বলে, আইয়ুব একজন বড়ই সত্যনিষ্ঠ, খোদাভীরব ও কুর্কর্ম ত্যাগকারী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই সংগে তিনি এতই ধনাঢ্য ছিলেন যে, "পূর্ব দেশের লোকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড়লোক।" একদিন আল্লাহর কাছে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর নিজের) পুত্রগণ হাজির হন। তাদের সাথে শয়তানও আসে। আল্লাহ সেই মজলিসে তার বান্দা আইয়ুবের জন্য গর্ব করেন। শয়তান বলে, আপনি তাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তারপর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আর কি করবে ? তার প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন সেগুলো একবার ছিনিয়ে নেন তারপর দেখুন সে যদি আপনার মুখের ওপর আপনাকে অস্বীকার না করে থাকে তাহলে আমার নাম শয়তান নয়। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, তার সব কিছু তোমার হস্তগত করে দেয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র তার শারীরিক কোনো ক্ষতি করো না। শয়তান গিয়ে আইয়ুবের সমস্ত ধন-দৌলত ও পরিবার পরিজন ধ্বংস করে দেয়। আইয়ুব সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধুমাত্র একাই থেকে যান। কিন্তু এতে আইয়ুবের মনে কোনো দুঃখ ও ক্ষোভ জাগেনি। তিনি আল্লাহকে সিজদা করেন এবং বলেন, "আমি মায়ের গর্ভ থেকে উলংগ এসেছি এবং উলংগই ফিরে যাবো ; খোদাই দিয়েছেন আবার খোদাই নিয়েছেন, খোদার নাম ধন্য হোক।" আবার এক দিন আল্লাহর দরবারে একই ধরনের একটি মজলিস বসে। তাঁর ছেলেরা আসে, শয়তানও আসে। আল্লাহ

শয়তানকে বলেন, আইয়ুব কেমন সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছে দেখে নাও। শয়তান বলে, আচ্ছা, জনাব, তার শরীরকে একবার বিপদগ্রস্ত করে দেখুন সে আপনার মুখের ওপর আপনার কুফরী করবে। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে যাও, তাকে তোমার হাতে দেয়া হচ্ছে, তবে তার প্রাণটি যেন সংরক্ষিত থাকে। অতপর শয়তান ফিরে যায়। সে “আইয়ুবকে মাথার চাঁদি থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক কোড়ায় ভরে দেয়।” তার স্ত্রী তাকে বলে, “এখনো কি তুমি তোমার সত্যনিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে? আল্লাহকে অমান্য করো এবং প্রাণত্যাগ করো।” তিনি জবাব দেন, “তুমি মুচাঙ্গীর মতো কথা বলছো। আমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে শুধু সুখ পাবো, দুঃখ পাবো না।”

এ হচ্ছে আইয়ুবের সহীকার (ইয়োব পুস্তক) প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার। কিন্তু এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে একটি ভিন্নতর বিষয়কল্প শুরু হয়েছে। এটি বিয়াদ্বিশতম অধ্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এসব অধ্যায়ে হযরত আইয়ুবের ধৈর্যহীনতা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও দোষারোপের একটি ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে একথা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হযরত আইয়ুবের সম্পর্কে আল্লাহর অনুমান ভুল ও শয়তানের অনুমান সঠিক ছিল। তারপর বিয়াদ্বিশতম অধ্যায়ের শেষের দিকে আল্লাহর সাথে একচোট তর্ক বিতর্ক করার পর ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও তাওয়াক্বলের ভিত্তিতে নয় বরং আল্লাহর তিরস্কার ও ধমক খেয়ে আইয়ুব তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং তিনি তা গ্রহণ করে তার সমস্ত কষ্ট দূর করে দেন। এরপর তাকে পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী সম্পদ দান করেন। এ শেষ অংশটি পড়তে গিয়ে মনে হবে আইয়ুব ও আল্লাহ উভয়েই শয়তানের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন। তারপর নেহাত নিজেই কথার রাখার জন্যই আল্লাহ ধমক দিয়ে তাকে মাফ চাইতে বাধ্য করেন এবং মাফ চাওয়ার সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে নেন, যাতে শয়তানের সামনে তাঁকে লজ্জিত হতে না হয়।

এ পুস্তকটি নিজ মুখেই একথা ঘোষণা করছে যে, এটি আল্লাহর বা হযরত আইয়ুবের বাণী নয়। বরং হযরত আইয়ুবের জামানার বইও নয় এটি। তাঁর ইস্তিকালের শত শত বছর পরে কোনো এক ব্যক্তি আইয়ুবের ঘটনাকে ভিত্তি করে “ইউসুফ যোলায়খা” ধরনের একটি চমকপ্রদ কাহিনী কাব্য রচনা করেন। তাতে আইয়ুব (ইয়োব) তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয বিলদদ, নামাখীয় সোফর, বুখীয় বারখেলের পুত্র ইলীহু প্রমুখ কয়েকটি চরিত্র উপস্থাপন করে তাদের মুখ দিয়ে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আসলে তিনি নিজের মনগড়া দর্শন বর্ণনা করেছেন। তার কাব্য প্রতিভা ও চমৎকার বর্ণনা ভংগীর যতই প্রশংসা করতে পারেন করুন কিন্তু তাকে পবিত্র কিতাব ও আসমানী সহীকার অন্তরভুক্ত করার কোনো অর্থ নেই। আইয়ুব আলাইহিস সালামের জীবনী ও সীরাতেদের সাথে তার সম্পর্ক ঠিক ততটুকু যতটুকু সম্পর্ক আছে “ইউসুফ যোলায়খা”র সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালামের। বরং সম্ভবত ততটুকুও নেই। বড়জোর আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, এ পুস্তকের প্রথম ও শেষ অংশে যেসব ঘটনা বলা হয়েছে তার মধ্যে সঠিক ইতিহাসের একটি উপাদান পাওয়া যায়। কবি তা স্রুতি থেকে গ্রহণ করে থাকবেন, যা তাঁর যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল অথবা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এমন কোনো সহীফাহ থেকে নিয়ে থাকবেন।

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٥٠﴾
 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥١﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ
 مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمِ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
 وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَُنْ لَكَ نَجْيًا مِنَ الْغَمِّ ﴿٥٣﴾

আর এ নিয়ামতই ইসমাইল, ইদরীস^{৫০} ও যুলকিফলকে^{৫১} দিয়েছিলাম, এরা সবাই সবারকারী ছিল এবং এদেরকে আমি নিজের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম, তারা ছিল সংকর্মশীল।

আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম।^{৫২} স্বরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল^{৫৩} এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না।^{৫৪} শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো।^{৫৫} “তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।” তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

৮০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাকহীমুল কুরআন সূরা ক্রমের ৩৩ টাকা।

৮১. “যুলকিফল”-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে “ভাগ্যবান” এবং অর্থ হচ্ছে নৈতিক মাহাত্ম ও পরকালীন সওয়াবের দৃষ্টিতে ভাগ্যবান, পার্থিব স্বার্থ ও লাভের দৃষ্টিতে নয়। এটি সংশ্লিষ্ট মনীষীর নাম নয় বরং তাঁর উপাধি। কুরআন মজীদে দু’জায়গায় তাঁর কথা বলা হয়েছে। দু’জায়গায়ই তাকে এ উপাধির মাধ্যমে স্বরণ করা হয়েছে, নামের সাহায্যে নয়।

কে এই যুলকিফল? কি তাঁর পরিচয়? কোন্ দেশ ও জাতির সাথে তাঁর সম্পর্কে ছিল? তিনি কোন্ যুগের লোক ছিলেন? এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের উক্তিগুলো বড় বেশী বিক্ষিপ্ত। কেউ বলেন, এটি হযরত যাকারিয়া (আ) দ্বিতীয় নাম (অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল কথা। কারণ, তাঁর আলোচনা এর পরই সামনের দিকে আসছে)। কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ইলিয়াস (আ)। কেউ ইউশা’ ইবনে নূনের নাম নেন। কেউ বলেন, তিনি আল ইয়াসা (অথচ এটিও ভুল। কারণ, সূরা সা’দ-এ তাঁর কথাও “যুলকিফল”-এর কথা আলাদা আলাদা করে বলা হয়েছে।) কেউ তাঁকে হযরত আল ইয়াসার (আ) খলীফা বলেন। আবার কারোর বক্তব্য হচ্ছে, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ুবের ছেলে। হযরত আইয়ুবের (আ)

পরে তিনি নবী হন এবং তাঁর আসল নাম ছিল বিশর। আল্লামা আলসী তাঁর ক্বহল মা'আনী গ্রন্থে লিখেছেন : ইচ্ছাদীনের দাবী হচ্ছে, তিনি হিয়কিইল (যিহিক্কেল) নবী। বনী ইসরাঈলদের পরাধীনতার (৫৯৭ খৃঃ পূঃ) যুগে তিনি নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হন এবং খাবুর (কবার) নদীর তীরে একটি জনপদে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

এ বিভিন্ন উক্তি ও মতামতের ভিত্তিতে তিনি যথার্থই কোন্ নবী ছিলেন নিশ্চিত নির্ভরতার সাথে বলা যেতে পারে না। বর্তমান যুগের মুফাসসিরগণ হিয়কিইল নবীর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু এ মত গ্রহণের পক্ষে আমি কোনো ন্যায় সংগত যুক্তি-প্রমাণ পেলাম না। তবুও এর সপক্ষে কোনো যথার্থ প্রমাণ পেলে এ মতটিকে অধাধিকার দেয়া যেতে পারে। কারণ, বাইবেলের হিয়কিইল সর্হীফাটি দেখলে মনে হয় যথার্থই এ আয়াতে তাঁর যে প্রশংসা করা হয়েছে তিনি তার হকদার অর্থাৎ ধৈর্যশীল ও সংকল্পপরায়ণ। জেরুসালেম শেষবার ধ্বংস হবার আগে বখতে নসরের হাতে যারা শ্রেফতার হয়েছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন। বখতে নসর ইরাকে ইসরাঈলী কয়েদীদের একটি উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল খাবুর (কবার) নদীর তীরে এর নাম ছিল তেলআবীব। এ স্থানেই ৫৯৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে হযরত হিয়কিইল নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। অবিশ্রান্তভাবে ২২ বছর ধরে তিনি একদিকে বিপদগ্রস্ত ইসরাঈলীদেরকে এবং অন্যদিকে জেরুসালেমের গাফেল ও অস্থির-বিহ্বল অধিবাসী ও শাসকদেরকে সজাগ করার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও আত্মনিমগ্নতা অবশ্য গ্রন্থিধানযোগ্য। একটি ঘটনা থেকে এ বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে। নবুওয়াতের নবম বছরে তাঁর স্ত্রী, যাকে তিনি নিজেই বলেন, “নয়নের প্রীতি পাত্র” ইস্তিকাল করেন। লোকেরা শোক প্রকাশের জন্য তাঁর বাড়িতে জমায়েত হয়। এদিকে তিনি নিজের মানসিক যন্ত্রণা ও শোকের কথা বাদ দিয়ে নিজের সম্প্রদায়কে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকেন। এ আযাব সে সময় তাদের মাথার ওপর ঝুলছিল। (২৪ : ১৫-২৭) বাইবেলের যিহিক্কেল পুস্তক এমন একটি পুস্তক যা পড়ে মনে হয় সত্যি এটি আল্লাহর কালাম।

৮২. অর্থাৎ হযরত ইউনুছ (আ)। কোথাও সরাসরি তাঁর নাম নেয়া হয়েছে আবার কোথাও “যুনুস” ও “সাহেবুল হূত” বা মাছওয়ালা উপাধির মাধ্যমে তাঁকে স্বরণ করা হয়েছে। তিনি মাছ ধরতেন বা বেচতেন বলে তাঁকে মাছওয়ালা বলা হতো না বরং আল্লাহর হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল, তাই তাঁকে বলা হয়েছে মাছওয়ালা। সূরা সাফফাতের ১৪২ আয়াতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বেশী জ্ঞানার জন্য দেখুন তাকহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ৯৮-১০০ এবং আস সাফফাত ৭৭-৮৫ টীকা।

৮৩. অর্থাৎ তিনি নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখনো হিজরত করার হুকুম আসেনি, যার ফলে তাঁর পক্ষে নিজের কর্তব্য ত্যাগ করা জায়েয হতে পারতো।

৮৪. তিনি মনে করেছিলেন, আমার সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর আযাব এসে যাচ্ছে। এখন আমাকে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত। না হলে আমি নিজেও আযাবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে যাবো। নীতিগতভাবে এ বিষয়টি তো পাকড়াওযোগ্য ছিল না। কিন্তু নবীর পক্ষে আল্লাহর হুকুম ছাড়া দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়া ছিল পাকড়াওযোগ্য।

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَمْلَأْنَا لَه
زَوْجَهُ إِنَّمَا كَانُوا بُرْعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهْبًا ۝ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ۝

আর যাকারিয়ার কথা (শ্রবণ করো), যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল : “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ে না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।” কাজেই আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহইয়া দান করেছিলাম, আর তার স্ত্রীকে তার জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম।^{৮৬} তারা সংকাজে অপ্রাণ চেষ্টা করতো, আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতি সহকারে এবং আমার সামনে ছিল অবনত হয়ে।^{৮৭}

৮৫. অর্থাৎ মাছের পেটের মধ্য থেকে সেখানে তো অন্ধকার ছিলই, তার ওপর ছিল সাগরের অন্ধকার।

৮৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৩৭ থেকে ৪১ আয়াত টীকাসহ, সূরা মারযাম ২ থেকে ১৫ আয়াত টীকাসহ। স্ত্রীকে যোগ্য করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, তার বন্ধাত্ব দূর করে দেয়া এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তাকে গর্ভধারণের উপযোগী করা। “সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তুমিই” মানে হচ্ছে, তুমি সন্তান না দিলে কোনো দুঃখ নেই। তোমার পবিত্র সন্তা-উত্তরাধিকারী হবার জন্য যথেষ্ট।

৮৭. এই প্রেক্ষাপটে যে উদ্দেশ্যে নবীদের উল্লেখ করা হয়েছে তা আবার স্মৃতিপটে জাগিয়ে তুলুন। হযরত যাকারিয়ার (আ) ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা হৃদয়ংগম করানো যে, এ সকল নবীই ছিলেন নিছক বান্দা ও মানুষ। ইলাহী সার্বভৌমত্বের সামান্যতম গঙ্গও তাঁদের মধ্যে ছিল না। তারা অন্যদেরকে সন্তান দান করতেন না বরং নিজেরাই আল্লাহর সামনে সন্তানের জন্য হাত পাততেন। হযরত ইউনুসের কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, একজন মহিমামণ্ডিত নবী হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ভুল করে বসলেন তখন তাকে পাকড়াও করা হলো এবং যখন তিনি নিজের রবের সামনে অবনত হলেন তখন তাঁর প্রতি অনুগ্রহও এমনভাবে করা হয়েছে যে, মাছের পেট থেকে তাঁকে জীবিত বের করে আনা হয়েছে। হযরত আইয়ূবের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, নবীর বিপদে পড়া কোনো অভিনব ব্যাপার নয় এবং নবীও যখন বিপদে পড়েন তখন একমাত্র আল্লাহরই সামনে ত্রাণের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি অন্যের ত্রাণকারী নন বরং আল্লাহর কাছে ত্রাণ ভিক্ষাকারী। তারপর এসব কথার সাথে সাথে একদিকে এ সত্যটি মনে বদ্ধমূল করতে চাওয়া হয়েছে যে, এ সকল নবীই ছিলেন তাওহীদের প্রবক্তা এবং নিজেদের

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا
 آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ مِنْ آيَاتِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّا نُرَبِّكُمْ
 فَاَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿٥٢﴾

আর সেই মহিলা যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ৫০ আমি তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম নিজের রূহ থেকে ৫১ এবং তাকে ও তার পুত্রকে সারা দুনিয়ার জন্য নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম। ৫০

তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমার ইবাদাত করো। কিন্তু (নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে) লোকেরা পরস্পরের মধ্যে নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। ৫১—সবাইকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।

প্রয়োজন তাঁরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সামনে পেশ করতেন না আবার অন্যদিকে একথাও বুঝিয়ে দেয়া কাম্য যে, আল্লাহ হামেশা অস্বাভাবিকভাবে নিজের নবীদেরকে সাহায্য করতে থেকেছেন। শুরুতে তাঁরা যতই পরীক্ষার সম্মুখীন হোন না কেনো শেষ পর্যন্ত অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে।

৮৮. এখানে হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে।

৮৯. হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও বলা হয়েছে :

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝ فَإِذْ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ
 سَجْدًا ۝

“আমি মাটি থেকে একটি মানুষ তৈরি করছি। কাজেই (হে ফেরেশতারা!) যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে তৈরি করে নেবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে যাবে।” (সাদ : ৭১-৭২)

একথাই হযরত ইসা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে :

رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَدُوحٌ مِّنْهُ

“আল্লাহর রসূল এবং তাঁর ফরমান, যা মারিয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তার পক্ষ থেকে একটি রূহ।” (১৭১ আয়াত)

সূরা তাহরীমে বলা হয়েছে :

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا

“আর ইমরানের মেয়ে মারযাম যে নিজের লজ্জাহানের হেফাজত করেছিল, কাজেই ফুঁকে দিলাম আমি তার মধ্যে নিজের রুহ।” (১২ আয়াত)

এ সংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকা দরকার যে, মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ) ও হযরত আদমের (আ) জনাকে পরস্পরের সদৃশ গণ্য করেন। তাই সূরা আলে ইমরানে বলেন :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

“ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের মতো, যাকে আল্লাহ মাটি থেকে তৈরি করেন তারপর বলেন, “হয়ে যাও” এবং সে হয়ে যায়।” (৫৯ আয়াত)

এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে একথা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক সৃষ্টি পদ্ধতির পরিবর্তে যখন আল্লাহ কাউকে নিজের হুকুমের সাহায্যে অস্তিত্বশীল করে জীবন দান করেন তখন একে “নিজের রুহ থেকে ফুঁকে দিয়েছি” শব্দাবলীর সাহায্যে বিবৃত করেন। এ রুহের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সম্ভবত এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফুঁকে দেওয়াটা অলৌকিক ধরনের। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাকহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ২১২-২১৩ টীকা।

৯০. অর্থাৎ তারা মা ও ছেলে দু'জনের কেউই আল্লাহ বা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক ছিলেন না বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ছিলেন। তারা কোন অর্থে নিদর্শন ছিলেন ? এর ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন তাকহীমুল কুরআন সূরা মারযাম ২১ এবং সূরা আল মু'মিনুন ৪৩ টীকা।

৯১. এখানে ‘তোমরা’ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মানবতাকে। এর অর্থ হচ্ছে, হে মানব জাতি! তোমরা সবাই আসলে একই দল ও একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন তাঁরা সবাই একই দীন ও জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। আর তাঁদের সেই আসল দীন এই ছিল : কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহই মানুষের রব এবং এক আল্লাহরই বন্দেগী ও পূজা করা উচিত। পরবর্তীকালে যতগুলো ধর্ম তৈরী হয়েছে সবগুলো এ দীনেরই বিকৃত রূপ। কেউ এর কোনো একটি জিনিস নিয়েছে, কেউ অন্যটি, আবার কেউ তৃতীয়টি। এদের প্রত্যেকে আবার এই দীনের একটি অংশ নিয়ে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেক কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। এভাবে এই অসংখ্য দীন ও মিল্লাতের সৃষ্টি হয়েছে। এখন অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের ভিত গড়েছেন এবং নবীগণ মানব জাতিকে এই বহুধর্ম ও বহু মিল্লাতে বিভক্ত করেছেন, এ ধরনের কথা নিছক বিভ্রান্ত চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব দীন ও মিল্লাত নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন দেশের নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করছে বলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় বিভিন্নতা নবীদের সৃষ্টি। আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ দশটি বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করা শিক্ষা দিতে পারেন না।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা মুমিনুন ৫১-৭৭ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আল মু'মিনুন

২৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাখিলের সময়-কাল

বর্ণনাতন্ত্রী ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি মকী যুগের মাঝামাঝি সময় নাখিল হয়। প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্বাসন নিশ্চিত চরমে পৌঁছে যায়নি। ৭৫-৭৬ আয়াত থেকে পরিষ্কার সাক্ষ পাওয়া যায় যে, মকী যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাখিল হয়। উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরা নাখিল হওয়ার আগেই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল করীর বরাত দিয়ে হযরত উমরের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাখিল হয়। অহী নাখিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি ঝঞ্জেই দেখেছিলেন এবং এ অবস্থা অভিবাহিত হবার পর নবী (সা) বলেন, এ সময় আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাখিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মাননগে পুরোপুরি উত্তরে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শোনান।

বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

রসূলের আনুগত্য করার আহ্বান হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এখানে বিবৃত সমগ্র ভাষণটি এ কেন্দ্রের চারদিকেই আবর্তিত।

বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় : যারা এ নবীর কথা মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবে এ ধরনের লোকেরাই দুনিয়ায় ও আখেরাতে সাফল্য লাভের যোগ্য হয়।

এরপর মানুষের জন্ম, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া যে, এ নবী তাওহীদ ও আখেরাতের যে চিরন্তন সত্যগুলো তোমাদের মেনে নিতে বলছেন তোমাদের নিজেদের সন্তা এবং এই সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থা সেগুলোর সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে।

তারপর নবীদের ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী শুরু হয়ে গেছে। আপাত দৃষ্টিতে এগুলো কাহিনী মনে হলেও মূলত এ পদ্ধতিতে শ্রোতাদেরকে কিছু কথা বুঝানো হয়েছে :

এক : আজ তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উত্থাপন করছো সেগুলো নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বেও যেসব নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন, যাদেরকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে থাকো, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে তাঁদের যুগে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা এ একই আপত্তি করেছিল। এখন দেখো ইতিহাসের শিক্ষা কি, আপত্তি উত্থাপনকারীরা সত্যপথে ছিল, না নবীগণ?

দুই : তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা দিচ্ছেন এই একই শিক্ষা প্রত্যেক যুগের নবী দিয়েছেন। তার বাইরে এমন কোন অভিনব জিনিস আজ পেশ করা হচ্ছে না যা দুনিয়াবাসী এর আগে কখনো শুনেনি।

তিন : যেসব জাতি নবীদের কথা শোনেনি এবং তাঁদের বিরোধিতার ওপর জিদ ধরেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।

চার : আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক যুগে একই দীন এসেছে এবং সকল নবী একই জাতি বা উম্মাহত্বুক্ত ছিলেন। সেই একমাত্র দীনটি ছাড়া অন্য যেসব বিচিত্র ধর্মমত তোমরা দুনিয়ার চারদিকে দেখতে পাচ্ছে এগুলো সবই মানুষের স্বকপোলকল্পিত। এর কোনটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়।

এ কাহিনীগুলো বলার পর লোকদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, পার্থিব সমৃদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এমন জিনিস নয় যা কোন ব্যক্তি বা দলের সঠিক পথের অনুসারী হবার নিশ্চিত আলামত হতে পারে। এর মাধ্যমে একথা বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তার নীতি ও আচরণ আল্লাহর কাছে প্রিয়। অনুরূপভাবে কারোর পরীষ ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার ও তার নীতির প্রতি বিরূপ। আসল জিনিস হচ্ছে মানুষের ঈমান, আল্লাহ তীতি ও সততা। এরি ওপর তার আল্লাহর প্রিয় অপ্রিয় হওয়া নির্ভর করে। একথাগুলো এছানো বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় সে সময় যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল তার সকল নায়কই ছিল মক্কার বড় বড় নেতা ও সরদার। তারা নিজেরাও এ আত্মতরিতায় ভুগছিল এবং তাদের প্রভাবাধীন লোকেরাও এ ভুল ধারণার শিকার হয়েছিল যে, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং যারা একনাগাড়ে সামনের দিকে এগিয়েই চলছে তাদের ওপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ও দেবতাদের নেক নজর রয়েছে। আর এ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত লোকেরা যারা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আছে এদের নিজেদের অবস্থাই তো একথা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ এদের সাথে নেই এবং দেবতাদের কোপ তো এদের ওপর পড়েই আছে।

এরপর মক্কাবাসীদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাসী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে, তোমাদের ওপর এই যে দুর্ভিক্ষ নাযিল হয়েছে এটা একটা সতর্ক বাণী। এ দেখে তোমরা

নিজেরা সংশোধিত হয়ে যাও এবং সরল সঠিক পথে এসে যাও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। নয়তো এরপর আসবে আরো কঠিন শাস্তি, যা দেখে তোমরা আতঁনাদ করতে থাকবে।

তারপর বিশ্ব-জাহানেও তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট করা হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, চোখ মেলে দেখো। এই নবী যে তাওহীদ ও পরকালীন জীবনের তাৎপর্য ও স্বরূপ তোমাদের জানাচ্ছেন চারদিকে কি তার সাক্ষদানকারী নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে নেই? তোমাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতি কি তার সত্যতা ও নির্ভুলতার সাক্ষ দিচ্ছে না?

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তোমার সাথে যাই ব্যবহার করে থাকুক না কেন তুমি ভালোভাবে তাদের প্রত্যুত্তর দাও। শয়তান যেন কখনো তোমাকে আবেগ উচ্ছল করে দিয়ে মন্দের জ্বাবে মন্দ করতে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ না পায়।

বক্তব্য শেষে সত্য বিরোধীদেরকে আখেরাতে জবাবদিহির ভয় দেখানো হয়েছে। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের আহবায়ক ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যা করছো সেজন্য তোমাদের কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝
 فَتَقَطُّ عَوَا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَئِيْمُهُمْ فَرَحُونَ ۝

৪ রুক্ব

হে রসূল! ৪৫ পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো। ৪৬ তোমরা যা কিছুই করো না কেন আমি তা ভালোভাবেই জানি। আর তোমাদের এ উম্মত হচ্ছে একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব, কাজেই আমাকেই তোমরা ভয় করো। ৪৭

কিন্তু পরে লোকেরা নিজেদের দীনকে পরস্পরের মধ্যে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তার মধ্যেই তারা নিমগ্ন হয়ে গেছে। ৪৮

নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম। বরং বলা হয়েছে, তাদের দু'জনকে মিলিয়ে একটি নিদর্শনে পরিণত করা হয়েছিল। এর অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, পিতা ছাড়া ইবনে মারুয়ামের জন্য হওয়া এবং স্বামীর সাহচর্য ছাড়া মারুয়ামের গর্ভধারণ করাই এমন একটি জিনিস যা তাদের দু'জনকে একটি নিদর্শনে পরিণত করে দেয়। যারা পিতা ছাড়া হযরত ইসার জন্য অস্বীকার করে তারা মাতা ও পুত্রের একটি নিদর্শন হবার কি ব্যাখ্যা দেবেন? (আরো বিস্তারিত জ্ঞানার জন্য তাক্বীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৪৪-৫৩; আন নিসা, ১৯০, ২১২, ২১৩; মারুয়াম, ১৫ থেকে ২২ এবং আল আরিয়া, ৮৯-৯০ টীকা দেখুন) এখানে দু'টি কথা আরো ব্যাখ্যা যোগ্য। এক, হযরত ইসা ও তাঁর মাতার ব্যাপারটি মূখ্য লোকদের আর একটি দুর্বলতা চিহ্নিত করেছে। ওপরে যে সকল নবীর কথা আলোচনা করা হয়েছে তাদের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি তো এ বলে অস্বীকার করা হয়েছে যে, তোমরা তো মানুষ আর মানুষ কি কখনো নবী হতে পারে? কিন্তু লোকেরা যখন হযরত ইসার ও তাঁর মায়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তাদের ভক্ত হয়ে গেলো তখন তাদেরকে মানুষের মর্যাদা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আদ্বাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মর্যাদায় পৌছিয়ে দিল। দুই, যারা হযরত ইসার অলৌকিক জন্ম এবং দোলনায় শায়িত অবস্থায় তাঁর ভাষণ শুনে তাঁর মুজিয়া হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখে নেয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং হযরত মারুয়ামকে অপবাদ দিয়েছিল তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হয়েছিল যা সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য চিরকালীন শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

৪৪. বিভিন্ন জন এ থেকে বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি ছিল দামেশক। কেউ বলেন, আরুরম্লাহ। কেউ বলেন, বাইতুল মাক্দিস আবার কেউ বলেন মিসর। খৃষ্টীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মারুয়াম হযরত ইসার জন্মের পর তাঁর

হেফাজতের জন্য দু'বার স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রথমবার বাদশাহ হিরোডিয়ানের আমলে তিনি তাকে মিসরে নিয়ে যান এবং বাদশাহর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তারপর আর্থালাউসের শাসনামলে তাকে পালীর নাসেরাহ শহরে আশ্রয় নিতে হয়। (মিথি ২ ১৩ থেকে ২৩) এখন কুরআন কোন্ স্থানটির প্রতি ইশ্টিগত করছে তা নিশ্চয়তা সহকারে বলা কঠিন। আভিধানিক অর্থে "রাবওয়াহ" এমন সুউচ্চ ভূমিকে বলা হয় যা সমতল এবং আশপাশের এলাকা থেকে উচু। অন্যদিকে "যা-তি কারার" (ذات قرار) মানে হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং অবস্থানকারী সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারে। আর "মাসিন" (معين) মানে হচ্ছে বহমান পানি বা নিরুপরিগী।

৪৫. আগের ২টি রুকু'তে বিভিন্ন নবীর কথা বলার পর এখন **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ** বলে সকল নবীকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, সকল নবী এক সংগে এক জায়গায় ছিলেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। বরং এ থেকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, প্রতি যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতির মধ্যে আগমনকারী নবীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের সবাইকে একই হুকুম দেয়া হয়েছিল। পরের আয়াতে যেহেতু সকল নবীকে এক উম্মত, এক জামায়াত ও এক দলভুক্ত গণ্য করা হয়েছে তাই এখানে এমন বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যার কলে চোখের সামনে তাদের সবার এক দলভুক্ত হবার ছবি ভেসে ওঠে। তারা যেন সবাই এক জায়গায় সমবেত আছেন এবং সবাইকে একই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ যুগের একদল স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন লোক এ বর্ণনা রীতির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারেননি এবং তারা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এ সম্বোধনটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আগমনকারী নবীদেরকে করা হয়েছে এবং এ থেকে তাঁর পরে নবুওয়াতের ধারা পরম্পরা জারি হবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাবতে অবাক লাগে যে, যারা ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসবোধ থেকে এত বেশী বঞ্চিত তারা আবার কুরআনের ব্যাখ্যা করার দুঃসাহস করেন।

৪৬. পাক-পবিত্র জিনিস বলে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা নিজেও পাক-পবিত্র এবং হালাল পথে অর্জিতও হয়। পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার দিকে ইশ্টিগত করা হয়েছে। মুসলমান বৈরাগী ও যোগীর মতো পবিত্র জীবিকা থেকে যেমন নিজেই বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি দুনিয়া পূজারী ও ভোগবাদীর মতো হালাল-হারামের পার্থক্য না করে সব জিনিসে মুখও লাগাতে পারে না।

সংকাজ করার আগে পবিত্র ও হালাল জিনিস খাওয়ার নির্দেশের মধ্যে এদিকে পরিষ্কার ইশ্টিগত রয়েছে যে, হারাম খেয়ে সংকাজ করার কোন মানে হয় না। সংকাজের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে হালাল রিয়িক খাওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "হে লোকেরা! আল্লাহ নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন।" তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন এবং তারপর বলেন :

فَذَرْهُمْ فِي غَمَرٍ مُّحْتَمٍ ۖ ۞٨٩ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِلُّ هُمْ فِيهِ
مِنْ مَّالٍ وَبَنِيٍّ ۖ ۞٩٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ۞٩١

—বেশ, তাহলে ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক নিজেদের গাফিলতির মধ্যে
একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত। ৪৯

তারা কি মনে করে, আমি যে তাদেরকে অর্থ ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে
যাচ্ছি, তা হারা আমি তাদেরকে কল্যাণ দানে তৎপর রয়েছি? না, আসল ব্যাপার
সম্পর্কে তাদের কোন চেতনাই নেই। ৫০

الرَّجُلُ يَطِيلُ السَّفَرُ أَشْعَثُ أَغْبَرَ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ
حَرَامٌ وَغَنِيٌّ بِالْحَرَامِ يَمْدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِلَّذِي

“এক ব্যক্তি আসে সুদীর্ঘ পথ সফর করে। দেহ ধূলি ধূসরিত। মাথার চুল এলোমেলো।
আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করে : হে প্রভু! হে প্রভু! কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই
যে, তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, কাপড় চোপড় হারাম এবং হারাম খাদ্যে তার
দেহ প্রতিপালিত হয়েছে। এখন কিস্তাবে এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে।” [মুসলিম,
তিরমিযী ও আহমাদ, আবু হুরাইরা (রা) থেকে]

৪৭. “তোমাদের উম্মত একই উম্মত”—অর্থাৎ তোমরা একই দলের লোক।
“উম্মত” শব্দটি এমন ব্যক্তি সমষ্টির জন্য বলা হয় যারা কোন সম্মিলিত মৌলিক বিষয়ের
জন্য একতাবদ্ধ হয়। নবীগণ যেহেতু স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই বিশ্বাস, একই
জীবন বিধান ও একই দাওয়াতের ওপর একতাবদ্ধ ছিলেন, তাই বলা হয়েছে, তাঁদের
সবাই একই উম্মত। পরবর্তী বাক্য নিজেই সে মৌলিক বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছে যার
ওপর সকল নবী একতাবদ্ধ ও একমত ছিলেন। (অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল
বাকারাহ, ১৩০ থেকে ১৩৩; আল ইমরান, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৪, ৬৪ ও ৭৯ থেকে
৮৫; আন নিসা, ১৫০ থেকে ১৫২; আল আ'রাফ, ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; ইউসুফ, ৩৭
থেকে ৪০; মারয়াম, ৪৯ থেকে ৫৯ এবং আল আহিয়া, ৭১ থেকে ৯৩ আয়াত।)

৪৮. এটা নিছক ঘটনার বর্ণনা নয় বরং সূরার শুরু থেকে যে যুক্তিধারা চলে আসছে
তার একটি পর্যায়। যুক্তির সারসংক্ষেপ হচ্ছে, নূহ আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ইসা
আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবী যখন এ তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়ে
এসেছেন তখন অনিবার্যভাবে এ থেকে প্রমাণ হয়, এ ইসলামই মানব জাতির আসল দীন
বা ধর্ম। অন্যান্য যেসব ধর্মের অস্তিত্ব আজ দুনিয়ার বুক পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো এ দীনটিরই
বিকৃত রূপ। এর কোন কোন নির্ভুল অংশের চেহারা বিকৃত করে এবং তার মধ্যে অনেক
মনগড়া কথা বাড়িয়ে দিয়ে সেগুলো তৈরী করা হয়েছে। এখন যারা এসব ধর্মের ভক্ত-অনুরক্ত
তারা এই ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে। অন্যদিকে যারা এগুলো ত্যাগ করে আসল দীনের
দিকে আহ্বান জানাচ্ছে তারা মোটেই বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে না।

৪৯. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যের মাঝখানে একটি ফাঁক আছে। এ ফাঁকটি ভরে দেয়ার পরিবর্তে প্রোতার চিন্তা-কল্পনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ ভাষণের পটভূমি নিজেই তাকে ভরে ফেলছে। এ পটভূমি হচ্ছে, আত্মাহর এক বান্দা পাঁচ ছয় বছর থেকে মানুষকে আসল দীনের দিকে ডাকছেন। যুক্তির সাহায্যে তাদেরকে নিজের কথা বুঝিয়ে বলছেন। ইতিহাসের নজীর পেশ করছেন। তার দাওয়াতের প্রভাব ও ফলাফল কার্যত চোখের সামনে আসছে। তারপর তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রও সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। কিন্তু এ সত্ত্বেও লোকেরা শুধু যে বাপ-দাদাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাতিলের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে তা নয় এবং শুধু যে সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সহকারে যে সত্য পেশ করা হচ্ছে তাকে মেনে নিতেও তারা প্রস্তুত হয়নি তা নয়। বরং তারা আদাপানি খেয়ে সত্যের আহবায়কের পিছনেও লেগে যায় এবং তাঁর দাওয়াতকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য ইঠকারিতা, অপবাদ রটনা, झूलूम, নিপীড়ন, মিথ্যাচার তথা যাবতীয় নিকৃষ্ট ধরনের কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকছে না। এহেন পরিস্থিতিতে আসল সত্য দীনের একক অস্তিত্ব এবং পরবর্তীতে উদ্ভাবিত ধর্মসমূহের স্বরূপ বর্ণনা করার পর “ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক তারা নিজেদের গাফিলতির মধ্যে” একথা বলা স্বত্ফূর্তভাবে এ অর্থ প্রকাশ করে যে, “ঠিক আছে, যদি এরা না মেনে নেয় এবং নিজেদের ভ্রষ্টতার মধ্যে আকষ্ট ডুবে থাকতে চায় তাহলে এদেরকে সেভাবেই থাকতে দাও।” এই “ছেড়ে দাও”-কে একেবারেই শাসনিক অর্থে গ্রহণ করে “এখন আর প্রচারই করো না” বলে মনে করা বাকভঙ্গী সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রমাণ করবে। এ ধরনের অবস্থায় একথা প্রচার ও উপদেশ দানে বিরত থাকার জন্য নয় বরং গাফিলদেরকে ঝাঁকুনি দেবার জন্য বলা হয়ে থাকে। তারপর “একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত” শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি গভীর সতর্ক সংকেত। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ গাফিলতির মধ্যে ডুবে থাকার ব্যাপারটা দীর্ঘক্ষণ চলতে পারবে না। এমন একটি সময় আসবে যখন তারা সজাগ হয়ে যাবে এবং আহবানকারী যে জিনিসের দিকে আহবান করছিল তার স্বরূপ তারা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তারা নিজেরা যে জিনিসের মধ্যে ডুবে ছিল তার সঠিক চেহারাও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

৫০. এখানে এসে সূরার সূচনা পর্বের আয়াতগুলোর ওপর আর একবার নজর বুগিয়ে নিল। সে একই বিষয়বস্তুকে আবার অন্যভাবে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা “কল্যাণ”, “ভালো” ও “সমৃদ্ধি”র একটি সীমিত বস্তুবাদী ধারণা রাখতো। তাদের মতে, যে ব্যক্তি ভালো খাবার, ভালো পোশাক ও ভালো ঘর-বাড়ি লাভ করেছে, যাকে অর্থ-সম্পদ ও সম্ভ্রান-সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে এবং সমাজে যে খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছে সে সাফল্য লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ যৌলিক বিভ্রান্তির ফলে তারা আবার এর চেয়ে অনেক বড় আর একটি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সেটি ছিল এই যে, এ অর্থে যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে সে নিশ্চয়ই সঠিক পথে রয়েছে বরং সে আত্মাহর প্রিয় বান্দা, নয়তো এসব সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে এ সাফল্য থেকে যাদেরকে আমরা প্রকাশ্যে বঞ্চিত দেখছি তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ভুল পথে রয়েছে এবং তারা খোদা বা খোদাদের গববের শিকার হয়েছে। এ বিভ্রান্তিটি আসলে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী লোকদের ভ্রষ্টতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্যতম। একে কুরআনের

বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে ঋণন করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে প্রকৃত সত্য কি তা বলে দেয়া হয়েছে। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ১২৬ ও ২১২; আল আ'রাফ, ৩২; আত্ তাওবাহ, ৫৫, ৬৯ ও ৮৫; ইউনুস, ১৭; হূদ, ৩, ২৭ থেকে ৩১, ৩৮ ও ৩৯; আর রা'আদ, ২৬; আল কাহুফ, ২৮, ৩২ থেকে ৪৩ ও ১০৩ থেকে ১০৫; মারয়াম, ৭৭ থেকে ৮০; ত্বা-হা, ১৩১ ও ১৩২ ও আল আযিয়া, ৪৪ আয়াত এবং এই সংশ্লিষ্ট টীকাগুলো)।

এ ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য রয়েছে যেগুলো ভালোভাবে অনুধাবন না করলে চিন্তা ও মন-মানস কখনোই পরিচ্ছন্ন হতে পারে না।

এক : “মানুষের সাফল্যকে কোন ব্যক্তি, দল বা জাতির নিছক বস্তুবাদী সমৃদ্ধি ও সাময়িক সাফল্য অর্থে গ্রহণ করার চাইতে তা অনেক বেশী ব্যাপক ও উন্নত পর্যায়ের জিনিস।

দুই : সাফল্যকে এ সীমিত অর্থে গ্রহণ করার পর যদি তাকেই সত্য ও মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দে মানদণ্ড গণ্য করা হয় তাহলে তা এমন একটি মৌলিক ভ্রষ্টতায় পরিণত হয় যার মধ্য থেকে বাইরে বের না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষ কখনো বিশ্বাস, চিন্তা, নৈতিকতা ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে সঠিক পথ লাভ করতেই পারে না।

তিন : দুনিয়াটা আসলে প্রতিদান দেবার জায়গা নয় বরং পরীক্ষাগৃহ। এখানে নৈতিক শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকলেও তা বড়ই সীমিত পর্যায়ের ও অসম্পূর্ণ ধরনের এবং তার মধ্যেও পরীক্ষার দিকটি রয়েছে। এ সত্যটি এড়িয়ে গিয়ে একথা মনে করা যে, এখানে যে ব্যক্তি যে নিয়ামতই লাভ করছে তা লাভ করছে “পুরস্কার” হিসেবেই এবং সেটি লাভ করা পুরস্কার লাভকারীর সত্য, সৎ ও আল্লাহর প্রিয় হবার প্রমাণ আর যার ওপর যে বিপদও আসছে তা হচ্ছে তার “শাস্তি” এবং তা একথাই প্রমাণ করছে যে, শাস্তিলাভকারী মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে অসৎ ও আল্লাহর কাছে অপ্রিয়। আসলে এসব কিছু একটি বিভ্রান্তি বরং নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভবত আমাদের সত্য সম্পর্কিত ধারণা ও নৈতিকতার মানদণ্ডকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় আর কোন জিনিস নেই। একজন সত্যসন্ধানীকে প্রথম পদক্ষেপেই একথা অনুধাবন করতে হবে যে, এ দুনিয়াটি মূলত একটি পরীক্ষাগৃহ এবং এখানে অসংখ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যক্তিদের, জাতিদের ও সমগ্র বিশ্বমানবতার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে লোকেরা যে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয় সেগুলো পুরস্কার ও শাস্তির শেষ পর্যায় নয়। কাজেই সেগুলোকে মতবাদ, চিন্তাধারা, নৈতিকতা ও কর্মকাণ্ডের সঠিক ও বেঠিক হওয়ার মানদণ্ডে পরিণত করা এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় ও অপ্রিয় হবার আলামত গণ্য করা যাবে না।

চার : সাফল্যের প্রাপ্ত নিশ্চিতভাবেই সত্য ও সৎকর্মের সাথে বান্ধা আছে এবং মিথ্যা ও অসৎকর্মের পরিণাম ক্ষতি এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দুনিয়ায় যেহেতু মিথ্যা ও অসৎকর্মের সাথে সাময়িক ও বাহ্যিক সাফল্য এবং অনুরূপভাবে সত্য ও সৎকর্মের সাথে প্রকাশ্য ও সাময়িক ক্ষতি সম্ভবপর আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ জিনিসটি ধোঁকা বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাই সত্য-মিথ্যা ও সৎ-অসৎ যাচাই করার জন্য একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ
 رَبِّهِمْ يَوْمُونُ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يَسْرَكُونَ ۝ وَالَّذِينَ
 يَتُوتَنَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
 يَسْرِعُونَ فِي الْحَيَرِ وَهُمْ لَهَا سَاقُونَ ۝ وَلَا نَكْثُفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعًا
 وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

আসলে কল্যাণের দিকে দৌড়ে যাওয়া ও অগ্রসর হয়ে তা অর্জনকারী লোক^{৫০(ক)}
 তো তারা। যারা নিজেদের রবের ভয়ে ভীত,^{৫১} যারা নিজেদের রবের আয়াতের
 প্রতি ঈমান আনে,^{৫২} যারা নিজেদের রবের সাথে কাউকে শরীক করে না^{৫৩}
 এবং যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যা কিছুই দেয় এমন অবস্থায় দেয় যে, তাদের
 অন্তর এ চিন্তায় কঁপতে থাকে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে
 হবে।^{৫৪} আমি কোন ব্যক্তির ওপর^{৫৪(ক)} তার সাধের বাইরে কোন দায়িত্ব
 অর্পণ করি না^{৫৫} এবং আমার কাছে একটি কিতাব আছে যা (প্রত্যেকের অবস্থা)
 ঠিকমতো জানিয়ে দেয়^{৫৬} আর কোনক্রমেই লোকদের প্রতি জুলুম করা হবে
 না।^{৫৭}

মানদণ্ডের প্রয়োজন, যার মধ্যে প্রভাবগর ভয় থাকবে না। নবীগণের শিক্ষা ও আসমানী
 কিতাবসমূহ আমাদের এ মানদণ্ড সরবরাহ করে। মানুষের সাধারণ জ্ঞান (Common-
 sense)-এর সঠিক হওয়ার সত্যতা বিধান করে এবং “মার্কফ” ও “মুনকার” তথা সং-
 কাজ ও অসংকাজ সম্পর্কিত মানব জাতির সম্মিলিত মানসিক চিন্তা-অনুভূতি এর
 সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

পাঁচ : যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি একদিকে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং
 ফাসেকী, অপ্রীল কার্যকলাপ, জুলুম ও সীমালংঘন করতে থাকে এবং অন্যদিকে তার
 ওপর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে তখন বুঝতে হবে, বুদ্ধি ও কুরআন উভয় দৃষ্টিতে আল্লাহ
 তাকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং তার ওপর আল্লাহর করুণা নয় বরং
 তাঁর ক্রোধ চেপে বসেছে। ভুলের কারণে যদি তার ওপর আঘাত আসতো তাহলে এর এই
 অর্থ হতো যে, আল্লাহ এখনো তার প্রতি অনুগ্রহশীল আছেন, তাকে সতর্ক করছেন এবং
 সংশোধিত হবার সুযোগ দিচ্ছেন। কিন্তু ভুলের জন্য “পূরস্কার” এ অর্থ প্রকাশ করে যে,
 তাকে কঠিন শাস্তি দেবার ফায়সালা হয়ে গেছে এবং পেট ভরে পানি নিয়ে ডুবে যাওয়ার
 জন্য তার নৌকাটি ভাসছে। পক্ষান্তরে যেখানে একদিকে থাকে আল্লাহর প্রতি সত্যিকার
 আনুগত্য, চারিত্রিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্ন লেনদেন, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদাচার, দয়া, স্নেহ

ও মমতা এবং অন্যদিকে তার প্রতি বিপদ-আপদ ও কাঠিন্যের অবিরাম ধারা বর্ষিত হতে থাকে এবং আঘাতের পর আঘাতে সে হতে থাকে জর্জরিত সেখানে তা আল্লাহর ক্রোধের নয় বরং হয় তাঁর অনুগ্রহেরই আলামত। স্বর্ণকার স্বর্ণকে খুব বেশী উত্তপ্ত করতে থাকে যাতে তা খুব বেশী ঝকঝকে ডকডকে হয়ে যায় এবং দুনিয়াবাসীর সামনে তার পূর্ণ নিখাদ হওয়া প্রমাণ হয়ে যায়। দুনিয়ার বাজারে তার দাম না বাড়লে কিছু আসে যায় না। স্বর্ণকার নিজেই তার দাম দেবে। বরং নিজের অনুগ্রহে বেশী দিয়ে দেবে। তার বিপদ-আপদে যদি ক্রোধের দিক থেকে থাকে তাহলে তা তার নিজের জন্য নয় বরং তার শত্রুদের জন্য অথবা যে সমাজে সৎকর্মশীলরা উৎপীড়িত হয় এবং আল্লাহর নাফরমানরা হয় অনুগৃহীত সে সমাজের জন্য।

৫০(ক). এখানে আমাদের ভাষায় সহজ ভাব প্রকাশের জন্য আমি ৬১ আয়াতের অনুবাদ আগে করেছি এবং ৫৭ থেকে ৬০ পর্যন্ত আয়াতের অনুবাদ করেছি পরে। কেউ যেন ৬১ আয়াতের অনুবাদ ছুটে গিয়েছে বলে মনে না করেন।

৫১. অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি শূন্য ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করে না। যা মনে আসে তাই করে না এবং ওপরে একজন আল্লাহ আছেন তিনি জুলুম ও বাড়াবাড়ি করলে পাকড়াও করেন একথা কখনো ভুলে যায় না। বরং তাদের মন সবসময় তাঁর ভয়ে ভীত থাকে এবং তিনিই তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে থাকেন।

৫২. আয়াত বলে দু ধরনের আয়াতই বুঝানো হয়েছে। সেসব আয়াতও যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ পেশ করেন আবার সেগুলোও যেগুলো মানুষের নিজের মনের মধ্যে এবং বিশ্ব চরাচরে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কিতাবের আয়াতের প্রতি ইমান আনা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়ারই নামান্তর এবং বিশ্ব চরাচর ও মানব মনের আয়াতের অর্থাৎ নিদর্শনাবলীর প্রতি ইমান আনা মূলত সেগুলো যেসব সত্য প্রকাশ করেছে তার প্রতি ইমান আনাই প্রমাণ করে।

৫৩. যদিও আয়াতের প্রতি ইমান আনার অনিবার্য ফল এ দাঁড়ায় যে মানুষ তাওহীদ বিশ্বাসী ও আল্লাহর একক সত্তার প্রবক্তা হবে কিন্তু এ সন্তোষ শিরক না করার কথা আলাদাভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক সময় মানুষ আয়াত মেনে নিয়েও কোন না কোনভাবে শিরকে লিপ্ত হয়। যেমন রিয়্যা বা প্রদর্শনেক্ষা। এটিও এক ধরনের শিরক। অথবা নবী ও অলীগণের শিকার মধ্যে এমন ধরনের বাড়াবাড়ি করা যা শিরক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা। কিংবা ষেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রবের বন্দেগী ও আনুগত্য এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রভুর আইন মেনে চলা। কাজেই আল্লাহর আয়াতের প্রতি ইমান আনার পর আলাদাভাবে শিরক না করার কথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্বকে সম্পূর্ণরূপে একক আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নেয় এবং তার গায়ে অন্য কারোর বন্দেগীর সামান্যতম গন্ধও লাগায় না।

৫৪. আরবী ভাষায় “দেয়া” (إيتاء) শব্দটি শুধুমাত্র সম্পদ বা কোন বস্তু দেয়া অর্থেই ব্যবহার হয় না বরং বিমূর্ত জিনিস দেয়া অর্থেও বলা হয়। যেমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য

গ্রহণ করার জন্য বলা হয় **اتَيْنَهُ مِنْ نَفْسِ الْقَبُولِ** আবার কোন ব্যক্তির আনুগত্য অস্বীকার করার জন্য বলা হয় **اتَيْنَهُ مِنْ نَفْسِ الْإِبَاءَةِ** কাজেই এ দেয়ার মানে শুধুমাত্র এই নয় যে, তারা আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ দান করে বরং আল্লাহর দরবারে আনুগত্য ও বন্দেগী পেশ করাও এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

এ অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতের পুরোপুরি মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তারা যা কিছু সদাচার, সেবামূলক কাজ ও ত্যাগ করে সে জন্য একটুও অহংকার ও তাকওয়ার বড়াই করে না এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবার অহমিকায় লিপ্ত হয় না। বরং নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সবকিছু করার পরও এ মর্মে আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে থাকে যে, নাজানি এসব তাঁর কাছে গৃহীত হবে কিনা, নিজেদের গোনাহের মোকাবিলায় এগুলো ভারী প্রমাণিত হবে কিনা এবং রবের কাছে মাগফেরাতের জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে কিনা। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম ও জারির বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিই এ অর্থ প্রকাশ করে। এখানে হযরত আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : “হে আল্লাহর রসূল! এর অর্থ কি এই যে, এক ব্যক্তি চুরি, ব্যাভিচার ও শরাব পান করার সময়ও আল্লাহকে ভয় করবে?” এ প্রশ্ন থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা একে **يَأْتُونَ مَا آتَوْا** অর্থে গ্রহণ করছিলেন অর্থাৎ “যা কিছু করে করেই যায়। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

**لَا يَأْبِئُكَ الصِّدِّيقُ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيُصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ -**

“না, হে সিদ্দীকের মেয়ে! এর অর্থ হচ্ছে এমন লোক, যে নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয় এবং মহান আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।”

এ জবাব থেকে জানা যায় যে, আয়াতের সঠিক পাঠ **يَأْتُونَ** নয় বরং **يُؤْتُونَ** এবং এ শুধু অর্থ-সম্পদ দান করার সীমিত অর্থে নয় বরং আনুগত্য করার ব্যাপক অর্থে।

একজন মু'মিন কোন ধরনের মানসিক অবস্থা সহকারে আল্লাহর বন্দেগী করে এ আয়াতটি তা বর্ণনা করে। হযরত উমরের (রা) অবহাই এর পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে। তিনি সারা জীবনের অতুলনীয় কার্যক্রমের পর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকেন তখন আল্লাহর জবাবদিহির ভয়ে ভীত হতে থাকেন এবং বলে যেতে থাকেন, যদি আখেরাতে সমান সমান হয়ে মুক্তি পেয়ে যাই তাহলেও বাঁচোয়া। হযরত হাসান বাসরী (র) বড়ই চমৎকার বলেছেন : মু'মিন আনুগত্য করে এরপরও ভয় করে এবং মুনাফিক গোনাহ করে তারপরও নির্ভীক ও বেপরোয়া থাকে।

৫৪(ক). উল্লেখ্য, ৬১ আয়াতের অনুবাদ ৫৭ আয়াতের আগে করা হয়েছে। এখান থেকে ৬২ আয়াতের অনুবাদ শুরু হচ্ছে।

৫৫. এ প্রেক্ষাপটে এ বাক্যটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। একে ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। আগের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে তারা প্রকৃত কল্যাণ আহরণকারী। কারা অগ্রবর্তী

হয়ে তা অর্জন করে এবং তাদের গুণাবলী কি কি। এ আলোচনার পর সংগে সংগেই একথা বলা হলো, আমি কখনো কাউকে তার সামর্থের বাইরে কষ্ট দেই না। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, এ চরিত্র, নৈতিকতা ও কার্যক্রম কোন অতিমানবিক জিনিস নয়। তোমাদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষেরাই এ পথে চলে দেখিয়ে দিচ্ছে। কাজেই তোমরা একথা বলতে পারো না যে, তোমাদের কাছে এমন কোন জিনিসের দাবী জানানো হচ্ছে যা মানুষের সাধারণ বাইরে। তোমরা যে পথে চলছো তার ওপর চলার ক্ষমতা যেমন মানুষের আছে তেমনি তোমাদের নিজেদের জাতির কতিপয় মুমিন যে পথে চলছে তার ওপর চলার ক্ষমতাও মানুষের আছে। এখন এ দু'টি সম্ভাব্য পথের মধ্যে কে কোনটি নির্বাচন করে, শুধুমাত্র তার ওপরই ফায়সালা নির্ভর করে। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করে যদি তোমরা আজ তোমাদের সমস্ত শ্রম ও প্রচেষ্টা অকল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করো এবং কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাও তাহলে আগামীতে নিজেদের এ বোকামির দণ্ড নিতেই হবে। সে দণ্ড থেকে এ খোঁড়া অজুহাত তোমাদের বাঁচাতে পারবে না যে, কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছা তোমাদের সামর্থের বাইরে ছিল। তখন এ অজুহাত পেশ করলে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, এ পথ যদি মানুষের সামর্থের বাইরে থেকে থাকে তাহলে তোমাদেরই মতো অনেক মানুষ তার ওপর চলতে সক্ষম হলো কেমন করে?

৫৬. কিতাব বলে এখানে আমলনামাকে বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির এ আমলনামা পৃথক পৃথকভাবে তৈরী হচ্ছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি নড়াচড়া এমনকি চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা-সংকল্পের প্রত্যেকটি অবস্থা পর্যন্ত তাতে সন্নিবেশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কেই সূরা কাহফে বলা হয়েছে :

لَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَلِّتُنَا
مَالَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا
مَاعْمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا -

“আর আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তারপর তোমরা দেখবে অপরাধীরা তার মধ্যে যা আছে তাকে ভয় করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য। এ কেমন কিতাব, আমাদের ছোট বা বড় এমন কোন কাজ নেই যা এখানে সন্নিবেশিত হয়নি। তারা যে যা কিছু করেছিল সবই নিজেদের সামনে হাজির দেখতে পাবে। আর তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করেন না।” (৪৯ আয়াত)

কেউ কেউ এখানে কিতাব অর্থে কুরআন গ্রহণ করে আয়াতের অর্থ উল্টে দিয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ কারোর বিরুদ্ধে এমন কোন দোষারোপ করা হবে না যে জন্য সে মূলত দায়ী নয়। কারোর এমন কোন সংকাজ গ্রাস করে ফেলা হবে না যার প্রতিদানের সে প্রকৃতপক্ষে হকদার। কাউকে অনর্থক শাস্তি দেয়া হবে না। কাউকে সত্য অনুযায়ী যথার্থ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রাখাও যাবে না।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ يِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ
لَهَا عَمِلُونَ ﴿٥٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ
يَجْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ اتَّٰبَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصِرُونَ ﴿٦٠﴾ قَدْ كَانَتْ
آيَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰٰ آعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦١﴾

কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অচেতন।^{৫৮} আর তাদের কার্যাবলীও এ পঙ্কতির (যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে) বিপরীত। তারা নিজেদের এসব কাজ করে যেতে থাকবে, অবশেষে যখন আমি তাদের বিলাসপ্রিয়দেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করবো^{৫৯} তখন তারা আবার চিৎকার করতে থাকবে^{৬০}—এখন বন্ধ করো^{৬১} তোমাদের আতঁচিৎকার আমার পক্ষ থেকে এখন কোন সাহায্য দেয়া হবে না। আমার আয়াত তোমাদের শোনানো হতো, তোমরা তো (রসূলের আওয়াজ শুনতেই) পিছন ফিরে কেটে পড়তে,^{৬২}

৫৮. অর্থাৎ যা কিছু তারা করছে, বলছে ও চিন্তা-অবনা করছে—এসব কিছু অন্য কোথাও সন্নিবেশিত হচ্ছে এবং কখনো এর হিসেব হবে না, এ ব্যাপারে তারা বেখবর।

৫৯. “مُتْرَفِينَ” শব্দের অনুবাদ এখানে করা হয়েছে “বিলাসপ্রিয়”। “মুত্ৰফীন” আসলে এমনসব লোককে বলা হয় যারা পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার থেকে গাফিল হয়ে গেছে। “বিলাসপ্রিয়” শব্দটির মাধ্যমে এ শব্দটির সঠিক মর্মকথা প্রকাশ হয়ে যায়, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে একে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির খায়েশ পূর্ণ করার অর্থে গ্রহণ করা যাবে না বরং বিলাস প্রিয়তার ব্যাপকতার অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

আযাব বলতে এখানে সম্ভবত আখেরাতের আযাব নয় বরং দুনিয়ার আযাবের কথা বলা হয়েছে। জ্বালেমরা দুনিয়ায়ই এ আযাবের মুখোমুখি হয়।

৬০. মূল “جَوَار” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অত্যধিক কষ্টের মধ্যে গরুর মুখ দিয়ে যে আওয়াজ বের হয় তাকে “জ্বার” বলে। এ শব্দটি এখানে নেহাত ফরিয়াদ ও কাতর আতঁনাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং এমন ব্যক্তির আতঁনাদ ও ফরিয়াদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে কোন প্রকার করুণার যোগ্য নয়। এর মধ্যে ব্যাণ্ড ও তাক্লিন্যাতাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এর মধ্যে এ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে, “বেশ, এখন নিজের কৃতকর্মের মজা টের পাওয়ার সময় এসেছে, তাই তো জোরে জোরে চিৎকার করছো।”

৬১. অর্থাৎ তখন তাদেরকে একথা বলা হবে।

৬২. অর্থাৎ তাঁর কথা শুনতেই তো প্রস্তুত ছিলে না। তাঁর আওয়াজ কানে পড়ুক এতটুকুও সহ্য করতে না।

تُسَكِّرِينَ ۖ بِهِ سِرُّهُمْ جَهِنُّونَ ۝۶۳ أَلَمْ يَرَوْا الْقَوْلَ إِذْ
جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۖ أَلَمْ يَرَوْا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ
مُنْكَرُونَ ۖ أَلَمْ يَقُولُوا بِهِ جَنَّةٌ مُبْلَغَةٌ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَآثَرُهَا
لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ۝۶۴

অহংকারের সাথে তা অগ্রাহ্য করতে, নিজেদের আড্ডায় বসে তার সম্পর্কে গল্প
দিতে ৬৩ ও আজেবাজে কথা বলতে।

তারা কি কখনো এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা করেনি? ৬৪ অথবা সে এমন কথা নিয়ে
এসেছে যা কখনো তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি? ৬৫ কিংবা তারা নিজেদের
রসূলকে কখনো চিনতো না বলেই (অপরিচিত ব্যক্তি হবার কারণে) তাকে
অস্বীকার করে? ৬৬ অথবা তারা কি একথা বলে যে, সে উদ্ভাস? ৬৭ না, বরং সে
সত্য নিয়ে এসেছে এবং সত্যই তাদের অধিকাংশের কাছে অপছন্দনীয়।

৬৩. মূলে سِرًّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। سمر মানে রাতের বেলা কথাবার্তা বলা,
গল্প করা, কথকতা করা ও গল্প-কাহিনী শুনানো। গ্রামীন ও মফস্বল শহরে জীবনে
সাধারণত এ রাত্রিকালের গল্পসপ্ হয় বৈঠক খানায় ও দহলিজে বসে। মক্কাবাসীদের
রীতিও এটাই ছিল।

৬৪. অর্থাৎ তাদের এ মনোভাবের কারণ কি? তারা কি এ বাণী বোঝেইনি, তাই
একে মানছে না? মোটেই না, কারণ এটা নয়। কুরআন কোন হেঁয়ালি নয়। কোন দূর্বোধ
ভাষায় কিতাবটি লেখা হয়নি। কিতাবটিতে এমন সব বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটানো হয়নি
যা মানুষের বোধগম্য নয়। তারা এর প্রত্যেকটি কথা ভালোভাবে বোঝে। এরপরও
বিরোধিতা করছে। কারণ তারা একে মানতে চায় না। এমন নয় যে, তারা একে বুঝার
চেষ্টা করছে কিন্তু বুঝতে পারছে না তাই মানতে চায় না।

৬৫. অর্থাৎ তিনি কি এমন একটি অভিনব কথা পেশ করছেন যা তাদের কান
কোনদিন শুনেনি এবং এটিই তাদের অস্বীকারের কারণ? মোটেই না, কারণ এটাও নয়।
আব্রাহার পক্ষ থেকে নবীদের আসা, কিতাবসহকারে আসা, তাওহীদের দাওয়াত দেয়া,
আখেরাতের জবাবদিহির ভয় দেখানো এবং নৈতিকতার পরিচিত সংবৃদ্ধিগুলো পেশ করা,
এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও এমন নয় যা ইতিহাসে আজ প্রথমবার দেখা দিয়েছে
এবং ইতিপূর্বে আর কখনো এসব কথা শুনা যায়নি। তাদের আশপাশের দেশগুলোয়
ইরাকে, সিরিয়ায় ও মিসরে নবীর পর নবী এসেছেন। তীরা এসব কথাই বলেছেন। এগুলো
তারা জানে না এমন নয়। তাদের নিজেদের দেশেই ইবরাহীম ও ইসমাইল আলাইহিমা
সালাম এসেছেন। হুদ, সালেহ ও শোআইব আলাইহিমুস সালামও এসেছেন। তাঁদের নাম

আজ্ঞা তাদের মুখে মুখে। তারা নিজেরাই তাঁদেরকে আত্মাহর প্রেরিত বলে মানে। তারা একথাও জানে যে, তারা মুশরিক ছিলেন না বরং এক আত্মাহর বংশেগীর শিক্ষা দিতেন। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্বীকারের কারণ এই নয় যে, তারা এমন একটি পুরোপুরি আনকোরা নতুন কথা শুনছে যা ইতিপূর্বে কখনো শোনেনি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন আল ফুরকান, ৮৪; আস্ সাহাদাহ, ৫ ও সাবা ৩৫ টীকা)।

৬৬. অর্থাৎ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে তারা কোনদিনই জানতো না, হঠাৎ তাদের মধ্যে এসে পড়েছেন এবং বলছেন আমাদের মেনে নাও, এটাই কি তাদের অস্বীকারের কারণ? না, একথা মোটেই নয়। যিনি এ দাওয়াত পেশ করছেন তিনি তাদের নিজেদের গোত্রের ও আত্মসমাজের লোক। তাঁর বংশগত মর্যাদা তাদের অজানা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তাদের চোখের আড়ালে নেই। তিনি তাদের সামনেই শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। তাঁর সত্যতা, সত্যতা, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পর্কে তারা খুব ভালোভাবেই জানে। তারা নিজেরাই তাঁকে আমীন বলতো। তাদের সমগ্র আত্মসমাজ তাঁর বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা করতো। তাঁর নিকটতম শত্রুও একথা স্বীকার করে যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। সমগ্র যৌবনকালেই তিনি ছিলেন পূতপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী। সবাই জানে তিনি একজন অত্যন্ত সৎ, ভদ্র ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, সত্যসেবী ও শান্তিপ্রিয় লোক। তিনি ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থাকেন। পরিচ্ছন্ন লেনদেন করেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাঁর জুড়ি নেই। নিজে জুলুম করেন না এবং জালেমদের সাথে সহযোগিতাও করেন না। কোন হকদারের হক আদায় করতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হননি। প্রত্যেক বিদগ্ধ, অভাবী ও অসহায়ের জন্য তাঁর দরজা হচ্ছে একজন দয়ার্প্রসিদ্ধ, স্নেহ পরায়ণ সহানুভূতিশীলের দরজা। তারপর তারা এও জানতো যে, নবুওয়াতের দাবীর একদিন আগে পর্যন্তও কেউ তাঁর মুখ থেকে এমন কোন কথা শোনেনি যা থেকে এ সন্দেহ করা যেতে পারে যে, তিনি কোন দাবী করার প্রত্নুতি নিচ্ছেন। আর যেদিন তিনি দাবী করেন তার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একই কথা বলে আসছেন। তিনি কোন মোড় পরিবর্তন করেননি বা ডিগবাজী খাননি। নিজের দাওয়াত ও দাবীর মধ্যে কোন রদবদল করেননি। তাঁর দাবীর মধ্যে এমন কোন পর্যায়েক্রমিক ক্রমবিকাশ দেখা যায়নি যার ফলে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, ধীরে ধীরে পা শক্ত করে দাবীর ময়দানে এগিয়ে চলার কাজ চলছে। আবার তাঁর জীবন যাপন প্রণালী সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অন্যদেরকে তিনি যা কিছু বলেন, তা সবার আগে নিজে পালন করে দেখিয়ে দেন। তাঁর কথায় ও কাজে বৈপরীত্য নেই। তাঁর কাছে হাতির দাঁত নেই, যা দেখাবার জন্য এক রকম এবং খাবার জন্য আবার অন্য রকম। তিনি নেবার জন্য এক পান্না এবং দেবার জন্য ভিন্ন পান্না ব্যবহার করেন না। এ ধরনের সুপরিচিত ও সুপরীক্ষিত ব্যক্তি সম্পর্কে তারা একথা বলতে পারে না যে, “ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। বড় বড় প্রতারক আসে এবং হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় কথা বলে প্রথম প্রথম আসর জমিয়ে ফেলে, পরে জানা যায় সবই ছিল ধোকা। এ ব্যক্তিও কি জানি আসলে কি এবং বানোয়াট পোশাক আশাক নামিয়ে ফেলার পর ভেতর থেকে কে বের হয়ে আসে কি জানি। তাই একে মেনে নিতে আমাদের মনে সংশয় জাগছে।” (এ প্রসঙ্গে আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাকহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, ২১; ইউনুস, ২১ ও বনী ইসরাঈল, ১০৫ টীকা)

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ ١١ ۚ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ يَوْمَ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝ ١٢ ۚ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ١٣ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ۝ ١٤

—আর সত্য যদি কখনো তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যের সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ওলট পাগল হয়ে যেতো^{৬৮}—না, বরং আমি তাদের নিজেদের কথাই তাদের কাছে এনেছি এবং তারা নিজেদের কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।^{৬৯}

তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছে? তোমার জন্য তোমার রব যা দিয়েছেন, সেটাই ভালো এবং তিনি সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা।^{৭০} তুমি তো তাদেরকে সহজ সরল পথের দিকে ডাকছো, কিন্তু যারা পরকাল স্বীকার করে না তারা সঠিক পথ থেকে সরে ভিন্ন পথে চলতে চায়।^{৭১}

৬৭. অর্থাৎ তাদের অস্বীকার করার কারণ কি এই যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল মনে করে? মোটেই না, এটাও আসলে কোন কারণই নয়।

কারণ মুখে তারা যাই বলুক না কেন মনে মনে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি দিয়ে চলছে। তাছাড়া একজন পাগল ও সুহ-সচেতন ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য এমন কোন অংশই বিবয় নয় যে, উভয়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। একজন হঠকারী ও নির্ভর্য ব্যক্তি ছাড়া কে এ বাণী শোনার পর একথা বলতে পারে যে, এটা একজন পাগলের প্রলাপ এবং এ ব্যক্তির জীবনধারা দেখার পর এ অতিমত ব্যক্ত করতে পারে যে, এটা একজন বুদ্ধিহীন উনাদের জীবন? বড়ই অজুত সেই পাগলামি (অথবা পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের প্রলাপ অনুযায়ী মৃগীরোগীর সংজ্ঞাহীনতা) যার মধ্যে মানুষের মুখ দিয়ে কুরআনের মতো অলৌকিক সৌন্দর্যময় বাণী বের হয়ে আসে এবং যার মাধ্যমে মানুষ একটি আন্দোলনের এমন সফল পথনির্দেশনা দেয় যার ফলে কেবলমাত্র নিজের দেশেরই নয়, সারা দুনিয়ার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৬৮. এ ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে একটি অনেক বড় কথা বলা হয়েছে। এটি ভালোভাবে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। দুনিয়ার সাধারণত অজ্ঞ মুখ লোকদের নিয়ম এই হয়ে

থাকে যে, তাদের সামনে যে ব্যক্তি সত্য কথাটি বলে দেয় তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। প্রকারান্তরে তারা যেন বলতে চায়, যা সত্য ও বাস্তব সম্বন্ধে তা না বলে তাদের মনের মতো কথা বলা হোক। অথচ কেউ পছন্দ করুক বা না করুক সত্য সব অবস্থায়ই সত্য থাকে। সারা দুনিয়ার লোকেরা এক জোট হলেও সত্য ও বাস্তবতাকে এক এক ব্যক্তির ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী ঢেলে বের করে আনা এবং প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বিপরীতমুখী বাসনার সাথে একাত্ম হওয়া তো দূরের কথা কোন বাস্তব ঘটনাকে অবাস্তব এবং সত্যকে অসত্যে পরিণত করাও সম্ভবপর নয়। নির্বৃত্তিতার আক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তি কখনো একথা চিন্তা করার প্রয়োজনই বোধ করে না যে, সত্য ও তাদের বাসনার মধ্যে যদি বিরোধ থাকে তাহলে এ দোষটা সত্যের নয় বরং তাদের নিজেদের। তার বিরোধিতা করে তারা তার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না বরং নিজেদেরই ক্ষতি করবে। বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল ব্যবস্থা যেসব অবিচল সত্য ও আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তার ছত্রছায়ায় বাস করে মানুষের জন্য নিজের চিন্তা, বাসনা ও কর্মপদ্ধতিকে সত্য অনুযায়ী তৈরী করে নেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য জ্ঞানার চেষ্টা করতে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কেবলমাত্র একজন নির্বোধই এখানে যা কিছু সে বোঝে বা যা কিছু হয়ে থাক বলে তার মন চায় অথবা নিজের বিচ্ছিন্ন মনোভাবের কারণে যা কিছু হয়েছে বা হওয়া উচিত বলে সে ধারণা করে নিয়েছে তার ওপর বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া এবং তার বিরুদ্ধে কারোর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি-প্রমাণও শুনতে প্রস্তুত না হওয়ার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

৬৯. এখানে 'কথা' শব্দটির তিনটি অর্থ হওয়া সম্ভব এবং তিনটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

(ক) 'কথা' প্রকৃতির বর্ণনা অর্থে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, আমি অন্য কোন জগতের কথা বলছি না। বরং তাদের নিজেদেরই সত্য ও প্রকৃতি এবং তার দাবী-দাওয়া তাদের সামনে পেশ করছি, যাতে তারা নিজেদের এ ভুলে যাওয়া পাঠ মনে করতে পারে। কিন্তু তারা এটা গ্রহণ করতে পিছনও হচ্ছে। তাদের এ পলায়ন কোন অসম্প্রদিত জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই কথা থেকে।

(খ) 'কথা' উপদেশ অর্থে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যা কিছু পেশ করা হচ্ছে তা তাদেরই ভালোর জন্য একটি উপদেশ এবং তাদের এ পলায়ন অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই কল্যাণের কথা থেকে।

(গ) 'কথা' সম্মান ও মর্যাদা অর্থে। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, আমরা এমন জিনিস তাদের কাছে এনেছি যা তারা গ্রহণ করলে তারাই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে। এ থেকে তাদের এ মুখ ফিরিয়ে নেয়া অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই উন্নতি এবং নিজেদেরই উত্থানের একটি সুবর্ণ সুযোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নামান্তর।

৭০. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে আর একটি প্রমাণ। অর্থাৎ নিজের এ কাজে আপনি পুরোপুরি নিব্বাধ। কোন ব্যক্তি সত্যতার সাথে এ দোষারোপ করতে পারে না যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপনার সামনে রয়েছে তাই আপনি এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে আপনার ভালোই উন্নতি হচ্ছিল।

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجُحُومِ ۝^{٩٢}
 وَلَقَدْ أَخَذَ نَهْمٌ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝^{٩٣}
 حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مَبْلُؤُونَ ۝^{٩٤}

যদি আমি তাদের প্রতি করুণা করি এবং বর্তমানে তারা যে দুঃখ-কষ্টে ভুগছে তা দূর করে দেই, তাহলে তারা নিজেদের অব্যাহতার স্রোতে একেবারেই ভেসে যাবে।^{৭২} তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে দিয়েছি, তারপরও তারা নিজেদের রবের সামনে নত হয়নি এবং বিনয় ও দীনতাও অবলম্বন করে না। তবে যখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, আমি তাদের জন্য কঠিন আযাবের দরজা খুলে দেবো তখন অকস্মাত তোমরা দেখবে যে, এ অবস্থায় তারা সকল প্রকার কল্যাণ থেকে হতাশ হয়ে পড়েছে।^{৭৩}

এখন দারিদ্র ও অর্বসকেটের সম্মুখীন হলেন। জাতির মধ্যে আপনাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। লোকেরা মাথায় করে রাখতো। এখন পালাপালি ও মার খাচ্ছেন বরং প্রাণ নাশের পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে নিচ্চিন্তে সুখে জীবন বাপন করছিলেন। এখন এমন একটি কঠিন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে পড়ে গেছেন যার ফলে এক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস ফেলতে পারছেন না। এর ওপর আরো সমস্যা হলো এমন বিষয় নিয়ে সামনে এসেছেন যার ফলে সারা দেশের লোক শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি নিজের জাতি ভাইরা আপনাকে হত্যা করার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছে। কে বলতে পারে, এটা একজন স্বার্থবাদী লোকের কাজ? স্বার্থবাদী লোক তো নিজের জাতি ও গোত্রপীতির ঝাণ্ডা উচিয়ে নিজের যোগ্যতা ও যোগসাজশের মাধ্যমে নেতৃত্ব লাভ করার প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি কখনো এমন কোন বিষয় নিয়ে আবির্ভূত হতেন না যা কেবলমাত্র সমগ্র জাতীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থপীতির বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জই নয় বরং আরবের মুশরিকদের মধ্যে তার গোত্রের সরদারী যে জিনিসের বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে তার শিকড়ও কেটে দেয়। এটি এমন একটি যুক্তি যা কুরআনে শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নয় বরং সাধারণভাবে সকল নবীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে বারবার পেশ করা হয়েছে। বিস্তারিত জ্ঞানার জন্য দেখুন, আল আন'আম, ৯০; ইউনুস, ৭২; হূদ, ২৯ ও ৫১; ইউসূফ, ১০৪; আল ফুরকান, ৫৭; আশ শূ'আরা, ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৫ ও ১৮০; সাবা ৪৭; ইয়াসীন, ২১; সাদ, ৮৬; আশশূরা, ২৩ ও আনু নাজম, ৪০ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও দেখুন।

৭১. অর্থাৎ আখেরাত অস্বীকার করার ফলে তারা দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং দায়িত্বের অনুভূতি না থাকায় তারা একেবারেই বেপরোয়া হয়ে গেছে। তাদের এ জীবনের একটা সমাপ্তি ও ফলাফল যে আছে এবং কারোর সামনে এ সমগ্র জীবনকালের

কার্যাবলীর হিসেব যে দিতে হবে, এটাই যখন তারা বুঝে না, তখন সত্য কি ও মিথ্যা কি তা নিয়ে তাদের কিংবা চিন্তা হতে পারে? ক্ষত-জানোয়ারের মতো দেহ ও প্রবৃত্তির প্রয়োজন খুব ভালোভাবে পূর্ণ হতে থাকুক এটিই হয় তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পর সত্য ও মিথ্যার আলোচনা তাদের কাছে নেহাতই অর্থহীন। আর এ উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি দেখা দিলে বড় জোর তারা এ ত্রুটির কারণ কি এবং কিভাবে একে দূর করা যায় এতটুকুই চিন্তা করবে। এ ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা কোন দিন সঠিক পথ চাইতে পারে না এবং পেতেও পারে না।

৭২. দুর্ভিক্ষের কারণে আরববাসী যে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে অবস্থান করছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত করতে গিয়ে কেউ কেউ দু'টি দুর্ভিক্ষকে এক সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন। এর ফলে এটি হিজরতের আগের না পরের ঘটনা তা বুঝা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। আসল ঘটনা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মক্কাবাসীরা দ্বার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। একবার নবুওয়্যাতের সূচনার কিছুদিন পর। দ্বিতীয়বার হিজরাতের কয়েক বছর পর যখন সামামাহ ইবনে উসাল ইয়ামামাহ থেকে মক্কার দিকে খাদ্য শস্য রফতানী করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখানে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষটির নয় প্রথমটির কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যখন কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত অস্বীকার করতেই থাকলো এবং কঠোরভাবে বাধা দিতে শুরু করলো তখন তিনি দোয়া করলেন :

اللهم اعنني عليهم بسبع كسبع يوسف

“হে আল্লাহ! এদের মোকাবিলায় ইউসুফের সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মতো সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।”

ফলে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেলো যে, মুতের গোশত খাওয়ার ঘটনাও ঘটলো। মকী সূরাগুলোতে বহু জায়গায় এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা আল আন'আম, ৪২ থেকে ৪৪; আল আ'রাফ, ৯৪ থেকে ৯৯; ইউনুস, ১১, ১২, ২১; আন নহল, ১১২, ১১৩ ও আদ. দুখান, ১০ থেকে ১৬ আয়াত এবং এ সংগে সংশ্লিষ্ট টীকাগুলোও।

৭৩. মূলے مُبْلِسُونَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হতাশা শব্দটি এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। مُبْلِسٌ ও مُبْلَسٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ হয়। বিষয়ে হতবাক হয়ে যাওয়া, ভয়ে ও আতঙ্কে নিখর হয়ে যাওয়া, দুঃখে ও শোকে মনমরা হয়ে যাওয়া, সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে সাহস হারিয়ে ফেলা এবং এরি একটি দিক হতাশা ও ব্যর্থতার ফলে মরিয়া (Desperate) হয়ে ওঠা। এ কারণেই শয়তানের নাম ইবলিস রাখা হয়েছে। এ নামের মধ্যে যে অর্থ প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা হলো, হতাশা ও নিরাশার (Frustration) ফলে তার আহত অহমিকা এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, এখন সে প্রাণের মামা ত্যাগ করে মরণ খেলায় নামতে এবং সব ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠানে উদ্যত হয়েছে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা যুমার

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আয যুমার

৩৯

নামকরণ

আয়াত নম্বর ৭১ ও ৭৩ (وَسَيُقَاسُ الْكَافِرَاتُ بِمَا كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمْرًا) এবং وَسَيُقَاسُ (الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمْرًا) থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'যুমার' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাখিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা যে হাবশায় হিজরত করার পূর্বে নাখিল হয়েছিল, সে ব্যাপারে ১০ নম্বর আয়াত (وَأَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً) থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়াজাতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব ও তার সংগী সাখীগণ হাবশায় হিজরতের সংকল্প করলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাখিল হয়েছিল (রুহুল মাযানী, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২৬)।

বিশয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

হাবশায় হিজরতের কিছু পূর্বে মকার পরিবেশ ছিল জুলুম-নির্যাতন এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় ভরা। ঠিক এ পরিবেশে এ গোটা সূরাটিকে একটি অভ্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে শেখ করা হয়েছে। এটা একটা নসীহত। এতে মাঝে মাঝে ইমানদারদের সর্বোধন করা হলেও বেশীরভাগ কুরাইশ গোত্রের কাকেরদের সর্বোধন করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মানুষ যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে এবং তার আল্লাহপ্রীতিকে অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য দ্বারা কলুষিত না করে। এ মৌলিক নীতিকে বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে অভ্যন্ত জোরালো পন্থায় তাওহীদের সত্যতা এবং তা মেনে চলার উত্তম ফলাফল আর শিরকের ভ্রান্তি ও তা অকিড়ে ধরে থাকার মন্দ ফলাফল অভ্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে ডাক্ত আচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমানদারদেরকে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর দাসত্বের জন্য একটি জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর এ পৃথিবী অনেক প্রশস্ত। নিজের দীনকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের ঐশ্বর্যের পুরস্কার দান করবেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, কাকেরদের জুলুম-নির্যাতন একদিন না একদিন তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, এমন দুরাশা কাকেরদের মন থেকে দূর করে দাও এবং পরিষ্কারভাবে বলে দাও যে, আমার পথ রোধ করার জন্য তোমরা যা কিছু করতে চাও করো, আমি আমার কাজ চালিয়েই যেতে থাকবো।

আয়াত ৭৫

সূরা আয-যুমার-মকী

রুকু' ৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝

এ কিতাব মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।^১

[হে মুহাম্মাদ (সা)] আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব নাযিল করেছি।^২
তাই তুমি একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর ইবাদাত করো।^৩

১. এটা এ সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের ব্যথা নয় যা অস্বীকারকারীরা বলছে। বরং এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি নিজে এ বাণী নাযিল করেছেন। এর সাথে আল্লাহর দু'টি গুণ উল্লেখ করে শ্রোতাদেরকে দু'টি মহাসত্য সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে যাতে তারা এ বাণীকে যামুনি জিনিস মনে না করে, বরং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। বর্ণিত গুণের একটি হচ্ছে, যে আল্লাহ এ বাণী নাযিল করেছেন তিনি "আযীয" অর্থাৎ এমন মহা পরাক্রমশালী যে কোন শক্তিই তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তাবলী কার্যকরী হওয়া ঠেকাতে পারে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এমন কোন শক্তিও নেই। আরেকটি গুণ হচ্ছে, তিনি 'হাকীম' অর্থাৎ এ কিতাবে তিনি যে হিদায়াত দিচ্ছেন তা আগাগোড়া বিজ্ঞোচিত। কেবল কোন অজ্ঞ ও মুর্থই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাকহীমুল কুরআন, আস সাজদা, টীকা, ১)

২. অর্থাৎ তার মধ্যে যা আছে তা ন্যায় ও সত্য, বাস্তবের কোন সংমিশ্রণ তার মধ্যে নেই।

৩. এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। এর মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এ আয়াতটি পড়ার সময় অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। বরং এর অর্থ ও প্রতিপাদ্য বিষয়টি ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করা উচিত। এর মৌলিক বিষয় দু'টি। এ দু'টি বিষয় বুঝে নেয়া ছাড়া আয়াতটির অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। একটি বিষয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সে ইবাদাত হবে এমন যা আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে করা হয়।

ইবাদাত শব্দের শব্দমূল বা ধাতু হচ্ছে عبد । এ শব্দটি আরবী ভাষায় 'বান্দীন' শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে 'দাস' বা 'ক্ৰীতদাস' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে 'ইবাদাত' শব্দের মধ্যে দু'টি অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছে পূজা-অর্চনা। আরবী ভাষার বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য অভিধান 'লিসানুল আরবে' আছে عبد الله অর্থাৎ التمسك ، والتعبد ، تاله له । আরেকটি অর্থ হচ্ছে সবিনয় আনুগত্য এবং সম্মতি ও সাগ্রহ আদেশ পালন। যেমন 'লিসানুল আরবে' বলা হয়েছে : الطاعة-العبادة ।

ومعنى العبادة فى اللغة الطاعة مع الخضوع - وكل من دان لملك فهو عابد له (وقومهما لنا عابدون) والعابد ، الخاضع لربه المستسلم المنقاد لامره - عبد الطاغوت ، اطاعه يعنى الشيطان فيما سول له واغواه - اياك نعبد ، اى نطيع الطاعة التى يخضع معها - اعبدوا ربكم ، اطيعوا ربكم -

সূত্রাং অভিধানের এসব নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থ শুধু তাঁর পূজা-অর্চনার দাবী করাই নয়, বরং বিনা বাধ্যতায় তাঁর আদেশ নিষেধ পালন, তাঁর শরয়ী আইন-কানুন সমুদয় চিন্তে সাগ্রহে মেনে চলা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মনেপ্রাণে অনুসরণ করার দাবীও বুঝায়।

আরবী ভাষায় دين (দীন) শব্দ কতিপয় অর্থ ধারণ করে :

একটি অর্থ হচ্ছে, আধিপত্য ও ক্ষমতা, মালিকানা ও প্রভুত্বমূলক মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও সার্বভৌম ক্ষমতা এবং অন্যদের ওপর সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা। তাই 'লিসানুল আরবে' আছে :

دان الناس ، اى قهرهم على الطاعة - دنتهم ، اى قهرتهم - دنته ، سسته وملكته - وفى الحديث الكيس من دان نفسه ، اى اذلها واستعبدها - الديان ، القاضى ، الحكم ، القهار ، ولا انت ديانى ، اى لست بقاهرلى فتسوس امرى - ما كان لياخذ اخاه فى دين الملك ، اى فى تضاء الملك -

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য, আদেশ পালন ও দাসত্ব। লিসানুল আরব অভিধানে আছে : الدين ، الطاعة - دنته ودنت له ، اى اطعته - والدين لله ، انما هو طاعته والتعبد له - فى الحديث اريد من قريش كلمة تدين لهم

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي
مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كُذِّبَ كَفَّارٌ ۝

সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদাত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য।^৪ যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে (আর নিজেদের এ কাজের কারণ হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের ইবাদাত করি শুধু এই কারণে যে, সে আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে।^৫ আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করছিলো।^৬ আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও হক অস্বীকারকারী।^৭

بها العرب ، اى تطيعهم وتخضع لهم - ثم دانت بعد الرباب ، اى
ذلت له و اطاعته - يمرقون من الدين ، اى انهم يخرجون من طاعة
الامام المفترض الطاعة ، المدين ، العبد - فلولا ان كنتم غير
مدنين ، اى غير مملوكين -

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে অভ্যাস ও পন্থা-পদ্ধতি—মানুষ যা অনুসরণ করে। মিসানুল আরবে আছে,

الدين ، العادة والشأن - يقال ما زال ذلك دينى ودينى ، اى عادتى

এ তিনটি অর্থের প্রতি বেয়াল রাখলে এ আয়াতে ‘দীন’ শব্দটি এমন কর্মপদ্ধতি ও আচরণকে বুঝায় যা মানুষ কারো ষেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং কারো আনুগত্য গ্রহণ করার মাধ্যমে অবলম্বন করে। আর “দীন”কে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর দাসত্ব করার অর্থ হলো “আল্লাহর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না বরং শুধু তাঁরই পূজা করবে, তাঁরই অনুসরণ এবং তাঁরই হুকুম আহকাম ও আদেশ পালন করবে।”

৪. এটা একটা বাস্তবসম্মত ও সত্য ব্যাপার। ওপরে বর্ণিত দাবীর সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ এটা পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমার উচিত দীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর বন্দগী ও দাসত্ব করা। কারণ নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহর অধিকার। অন্য কথায় বন্দগী ও দাসত্ব পাওয়ার মত অন্য কেউ আদতেই নেই। সুতরাং আল্লাহর সাথে তাঁর পূজা-অর্চনা করা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম ও আইন-কানূনের আনুগত্য করার কোন প্রব্রই ওঠে না। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো একনিষ্ঠ ও অবিমিশ্র

দাসত্ব করে তাহলে সে ভ্রান্ত কাজ করে। অনুরূপভাবে সে যদি আল্লাহর দাসত্বের সাথে সাথে অন্য কারো দাসত্বের সংমিশ্রণ ঘটায় তাহলে সেটাও সরাসরি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক ইয়াযীদ আর বাকাসী থেকে উদ্ধৃত হাদীসটিই এ আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা নাম ডাক সৃষ্টি করার জন্য আমাদের অর্থ-সম্পদ দেই। এতে কি আমরা কোন পুরস্কার পাব? নবী (সা) বললেন : না। সে জিজ্ঞেস করলো : আমাদের নিয়ত যদি আল্লাহর পুরস্কার এবং দুনিয়ার সুনাম অর্জন দু'টিই থাকে? তিনি বললেন :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَنْ أَخْلَصَ لَهُ

“কোন আমল যতক্ষণ না আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে হবে ততক্ষণ তিনি তা গ্রহণ করেন না।” এরপর নবী (সা) এ আয়াত পাঠ করলেন।

৫. মকার কাকেররা বলতো, আর সাধারণত দুনিয়ার সব মুশরিকও একথাই বলে থাকে যে, আমরা সৃষ্টা মনে করে অন্যসব সত্তার ইবাদাত করি না। আমরা তো আল্লাহকেই প্রকৃত সৃষ্টা বলে মানি এবং সত্যিকার উপাস্য তাকেই মনে করি। যেহেতু তাঁর দরবার অনেক উঁচু। আমরা সেখানে কি করে পৌঁছতে পারি? তাই এসব বোয়র্গ সন্তাদেরকে আমরা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি যাতে তারা আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেন।

৬. একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কেবল তাওহীদের ব্যাপারেই ঐকমত্য হওয়া সম্ভব। শিরূকের ব্যাপারে কোন প্রকার ঐকমত্য হতে পারে না। কোন্ কোন্ সত্তা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে দুনিয়ার মুশরিকরা কখনো একমত হতে পারেনি। কারো কাছে কোন দেবতা বা দেবীরা এর মাধ্যম। কিন্তু তাদের মধ্যেও সব দেবতা ও দেবী সম্পর্কে ঐকমত্য নেই। কারো কাছে চাঁদ, সূর্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এর মাধ্যম। কিন্তু তাদের মধ্যে কবর কি মর্যাদা এবং কে আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে তারাও পরস্পর একমত নয়। কারো মতে মৃত মহাপুরুষগণ এর মাধ্যম। কিন্তু এদের মধ্যেও অসংখ্য ভিন্নমত বিদ্যমান। কেউ একজন মহাপুরুষকে মানলে আরেকজন অপর একজনকে মানছে। এর কারণ হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন এসব মহাপুরুষ সম্পর্কে তাদের এই ধারণা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কোন তালিকাও আসেনি যাতে বলা হয়েছে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত। সুতরাং আমাকে পেতে হলে তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো। এটা বরং এমন এক আকীদা—যা কেবল কুসংস্কার ও অন্ধভক্তি এবং পুরনো দিনের লোকদেরকে অযৌক্তিক এবং অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। তাই ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা অবশ্যজ্ঞাবী।

৭. আল্লাহ এখানে সেসব লোকের জন্য দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি كَذِب (মিথ্যাবাদী) এবং অপরটি كُفَّار (অস্বীকারকারী)। তাদেরকে كَذِب বলা হয়েছে এ জন্য যে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা এ আকীদা বানিয়ে নিয়েছে এবং অন্যদের মধ্যে এ মিথ্যাই প্রচার করেছে। আর 'কাফর' শব্দের দু'টি অর্থ। একটি, ন্যায় ও সত্যের চরম

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ
هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑧

আল্লাহ যদি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে চাইতেন তাহলে তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিতেন।^৮ তিনি এ থেকে পবিত্র (যে, কেউ তাঁর পুত্র হবে)। তিনি আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর বিজয়ী।^৯

অস্বীকারকারী। অর্থাৎ তাওহীদের শিক্ষা সামনে আসার পর এরা এ ভ্রান্ত আকীদা আঁকড়ে ধরে আছে। আরেকটি, নিয়ামতের অস্বীকারকারী। অর্থাৎ এরা নিয়ামত লাভ করছে আল্লাহর কাছ থেকে আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে সেসব সন্তার যাদের সম্পর্কে তারা নিজের থেকেই ধরে নিয়েছে যে, তাদের হস্তক্ষেপের কারণেই তারা এসব নিয়ামত লাভ করছে।

৮. অর্থাৎ আল্লাহর ছেলে হওয়া একেবারেই অসম্ভব; যা সম্ভব তা হচ্ছে, আল্লাহ কাউকে বাছাই করে নিতে পারেন। আর যাকে তিনি বাছাই করবেন সে অবশ্যই সৃষ্টির মধ্যকার কেউ হবে। কারণ পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি। এ কথাও সবার জানা যে, সৃষ্টি যত সম্মানিতই হোক সে কখনো সন্তানের মর্যাদা পেতে পারে না। কারণ সৃষ্টি ও সৃষ্টির মধ্যে বিরাট মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু সন্তান হওয়াটা পিতা ও সন্তানের মধ্যে মৌলিক ঐক্যের দাবী করে।

সাথে সাথে এ বিষয়টির প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে যে, “আল্লাহ যদি কাউকে ছেলে বানাতে চাইতেন তাহলে এ রকম করতেন” কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। একথা থেকে বতই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ কখনো এরূপ করতে চাননি। এ বর্ণনা ভঙ্গি দ্বারা একথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, কাউকে বেটা হিসেবে গ্রহণ করা তো দূরের কথা এরূপ করার ইচ্ছাও আল্লাহ কখনো পোষণ করেননি।

৯. এসব যুক্তি প্রমাণ দিয়েই সন্তান হওয়ার আকীদা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

প্রথম প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা’আলা সব রকমের ত্রুটি, দোষ এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র। একথা সুস্পষ্ট যে, সন্তানের প্রয়োজন হয় অকর্মণ্য ও দুর্বলের। যে ব্যক্তি নখর ও ধ্বংসশীল সে-ই সন্তান লাভের মুখাপেক্ষী হয় যাতে তার বংশ ও প্রজন্ম টিকে থাকে। আর কাউকে পালক পুত্রও কেবল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে হয়তো উত্তরাধিকারীহীন হওয়ার কারণে কাউকে উত্তরাধিকারী বানানোর প্রয়োজন অনুভব করে। নয়তো ভালবাসার আবেগে তাদ্ভিত হয়ে কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে। এসব মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর ওপর আরোপ করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস রচনা করে নেয়া মূর্খতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি ছাড়া আর কি?

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং একক সন্তার অধিকারী, কোন বস্তু বা দ্রব্যের কিংবা কোন পুরুষের অংশ নন। আর এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, সন্তান সমগোত্রীয় হয়ে থাকে। আর দাম্পত্য জীবন ছাড়া সন্তানের কল্পনাই করা যায় না। আর দাম্পত্য সম্পর্কও

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ
النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَلَاثِينَ أَنْوَاعًا يُخَلِّقُكُمْ فِي بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتَنِي تُصَرِّفُونَ ۝

তিনি আসমান ও যমীনকে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞোচিতভাবে সৃষ্টি করেছেন।^{১০} তিনিই দিনের প্রান্তসীমায় রাতকে এবং রাতের প্রান্তসীমায় দিনকে জড়িয়ে দেন। তিনি সূর্য ও চাঁদকে এমনভাবে অনুগত করেছেন যে, প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিশীল আছে। জেনে রাখো, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমশালী।^{১১} তিনি তোমাদের একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়াও সৃষ্টি করেছেন।^{১২} আর তিনিই তোমাদের জন্য চতুশ্চন্দ জন্তুর আটজোড়া নর ও মাদি সৃষ্টি করেছেন।^{১৩} তিনি তোমাদেরকে মায়ের গর্ভে তিন তিনটে অঙ্ককার পর্দার অভ্যন্তরে একের পর এক আকৃতি দান করে থাকেন।^{১৪} এ আগ্নাহই (যার এ কাজ) তোমাদের 'রব'^{১৫} তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী,^{১৬} তিনি হাড়া আর কোন উপাস্য নেই,^{১৭} তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে কৌন্দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।^{১৮}

কেবল সমগোত্রীদের সাথেই হতে পারে। সুতরাং একক ও অধিতীয় সন্তা আগ্নাহর সন্তান থাকার কথা যে ব্যক্তি বলে সে চরম মূর্খ ও নির্বোধ।

তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি قهار বা অপরাজ্য এক মহাশক্তি। অর্থাৎ পৃথিবীতে সব জিনিসই তাঁর অজ্ঞেয় আধিপত্যের অধীন। এ বিশ্ব-জাহানের কোন কিছুই কোন পর্যায়েই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই কোন জিনিস সম্পর্কেই এ ধারণা করা যেতে পারে না যে, আগ্নাহর সাথে তার কোন আত্মীয়তার বন্ধন আছে।

১০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাকহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, টীকা ২৬; আন নাহল, টীকা ৬; আল আনকাবুত, টীকা ৭৫।

১১. অর্থাৎ এমন মহাপরাক্রমশালী যে, তিনি যদি তোমাদের আঘাব দিতে চান তাহলে কোন শক্তিই তা রোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এটা তাঁর মেহেরবানী যে তোমরা এসব

অপরাধ ও অবমাননা করা সত্ত্বেও তখনই তোমাদের পাকড়াও করছেন না, বরং একের পর এক অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এখানে শান্তি দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা এবং অবকাশ দেয়াকে ক্ষমা (দেখেও না দেখা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. একবার অর্থ এ নয় যে, প্রথমে হযরত আদম থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে বক্তব্যের মধ্যে সময়ের পরস্পরার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বর্ণনার পরস্পরার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষায়ই এ ধরনের দৃষ্টান্ত বর্তমান। যেমন : আমরা বলি ভূমি আজ যা করেছে তা জানি এবং গতকাল যা করেছে তাও আমার জানা আছে। এ ধরনের বর্ণনার অর্থ এ নয় যে, গতকালের ঘটনা আজকের পরে সংঘটিত হয়েছে।

১৩. গবাদি পশু অর্থ উট, গরু, ভেড়া, বকরী। এ চারটি নর ও চারটি মাদি মিলে মোট আটটি নর ও মাদি হয়।

১৪. তিনটি পর্দা অর্থ পেট, গর্ভাবস্থি এবং ঝিল্লি (সে ঝিল্লি যার মধ্যে বাচ্চা জড়িয়ে থাকে)।

১৫. অর্থাৎ মালিক, শাসক ও পালনকর্তা।

১৬. অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক তিনিই। গোটা বিশ্ব-জাহান তার হকুমেই চলছে।

১৭. অন্যকথায় এখানে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে যে, তিনিই যখন তোমাদের প্রভু এবং সমস্ত রাজত্ব তাঁরই তখন নিশ্চিতভাবে তোমাদের ইলাহও (উপাস্য) তিনিই। অন্য কেউ কি করে ইলাহ হতে পারে যখন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার কোন অংশ নেই এবং রাজত্বের ক্ষেত্রেও তার কোন দখল নেই। তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির কাছে একথা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, যমীন-আসমানের সৃষ্টিকর্তা হবেন আল্লাহ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আনুগত্য গ্রহণকারী আর রাতের পর দিন ও দিনের পর রাত আনয়নকারীও হবেন আল্লাহ। তাছাড়া তোমাদের নিজেদের এবং সমস্ত জীব-জন্তুর সৃষ্টা ও পালনকর্তাও হবেন আল্লাহ অথচ তোমাদের উপাস্য হবে তিনি ছাড়া অন্যরা?

১৮. একথাটি চিন্তা করে দেখার মত। এখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? বরং বলা হয়েছে এই যে, তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? অর্থাৎ অন্য কেউ তোমাদের বিপথগামী করছে এবং তোমরা তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সাদামাটা যুক্তিসংগত কথাও বুঝতে পারছো না। এ বর্ণনাবলি থেকে দ্বিতীয় যে কথাটি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে 'তোমরা' বলে সরোধান করে যারা ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে সরোধান করা হয়নি, বরং যারা তাদের প্রভাবে পড়ে ফিরে যাচ্ছিলো তাদেরকে সরোধান করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করলে যা সহজেই বোঝা যায়। যারা ফিরিয়ে নিচ্ছিলো তারা সে সমাজে সবার চোখের সামনেই ছিলো এবং সবখানে প্রকাশ্যেই কাজ করছিলো। তাই তাদের নাম নিয়ে বলার প্রয়োজন ছিলো না। তাদের সরাসরি সরোধান করাও ছিলো নিরর্থক। কারণ, তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরতে এবং অন্যদের দাসত্বে শৃঙ্খলিত করতে এবং করিয়ে রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এটা জানা কথা যে, এ ধরনের লোকদের বুঝলেও

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ
تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
مَرْجِعُكُمْ فَمِنْهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٣

যদি তোমরা কুফরী করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন।^{১৯} কিন্তু তিনি তাঁর বান্দার জন্য কুফরী আচরণ পছন্দ করেন না।^{২০} আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন।^{২১} আর কেউ-ই অপর কারো গোনাহর বোঝা বহন করবে না।^{২২} অবশেষে তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানাবেন তোমরা কি করছিলে। তিনি মনের খবর পর্যন্ত জানেন।

তারা তা বুঝতে রাজি ছিল না। কারণ, না বুঝার মধ্যেই তাদের স্বার্থ নিহিত ছিল এবং বুঝার পরও তারা তাদের স্বার্থ ত্যাগ করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবে জনসাধারণ যারা তাদের প্রতারণা ও চতুরতার ফাঁদে পতিত হচ্ছিলো তারা ছিল করুণার পাত্র। এ কারবারে তাদের কোন স্বার্থ ছিল না। তাই তাদেরকে বুঝালে বুঝতে পারতো এবং চোখ কিছুটা খুলে যাওয়ার পরে তারা এও দেখতে পারতো যে, যারা তাদেরকে আল্লাহর নিকট থেকে সরিয়ে অন্যদের আস্তানার পথ দেখাচ্ছে তারা তাদের এ কারবার থেকে কি স্বার্থ হাসিল করছে। এ কারণেই গোমরাহীতে নিক্ষেপকারী মুষ্টিমেয় লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে গোমরাহীর দিকে অগ্রসরমান জনসাধারণকে সতর্কতা করা হচ্ছে।

১৯. অর্থাৎ তোমাদের কুফরীর কারণে তাঁর প্রভুত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হতে পারে না। তোমরা মানলেও তিনি আল্লাহ, না মানলেও তিনি আল্লাহ আছেন এবং থাকবেন। তাঁর নিজের ক্ষমতায়ই তাঁর কর্তৃত্ব চলছে। তোমাদের মানা বা না মানাতে কিছু এসে যায় না। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন :

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَآخِرُكُمْ وَآئِسْكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرٍ
قَلْبَ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا -

“হে আমার বান্দারা, যদি তোমরা আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার কোন সর্বাধিক পাণ্ডিত্য ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাতেও আমার বাদশাহীর কোন ক্ষতি হবে না।” (মুসলিম)।

২০. অর্থাৎ নিজের কোন স্বার্থের জন্য নয়, বরং বান্দার স্বার্থের জন্য তার কুফরী করা পছন্দ করেন না। কেননা, কুফরী তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর। এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এক জিনিস এবং তাঁর সন্তুষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيَ مَا كَانَ يُدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝

মানুষের ওপর যখন কোন বিপদ আসে^{২৩} তখন সে তার রবের দিকে ফিরে যায় এবং তাঁকে ডাকে।^{২৪} কিন্তু যখন তার রব তাকে নিয়ামত দান করেন তখন সে ইতিপূর্বে যে বিপদে পড়ে তাঁকে ডাকছিলো^{২৫} তা ভুলে যায় এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতে থাকে^{২৬} যাতে তারা আল্লাহর পথ থেকে তাকে গোমরাহ করে।^{২৭} (হে নবী,) তাকে বলো, তোমার কুফরী দ্বারা অল্প কিছুদিন মজা করে নাও। নিশ্চিতভাবেই তুমি দোষেহে যাবে।

আত্রেকটি জিনিস। পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী কোন কাজ হতে পারে না। কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টির পরিপন্থী কাজ হতে পারে এবং রাত দিন হয়ে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ : পৃথিবীতে বেচ্ছাচারী ও জ্বালেমদের শাসনকর্তা হওয়া, চোর ও ডাকাতদের অস্তিত্ব থাকা এবং হত্যাকারী ও বাতিলকারীদের বর্তমান থাকা এ কারণেই সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রচিত প্রাকৃতিক বিধানের এসব অকল্যাণ ও অপকর্মের অস্তিত্ব লাভের অবকাশ রেখেছেন। তাছাড়া তাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগও তিনিই দেন এবং ঠিক তেমনিভাবে দেন যেমনভাবে সৎকর্মশীলদের সৎকাজ করার সুযোগ দেন। তিনি যদি এসব কাজ করার আদৌ কোন সুযোগ না রাখতেন এবং যারা এসব কাজ করে তাদের আদৌ কোন সুযোগই না দিতেন তাহলে পৃথিবীতে কখনো কোন অকল্যাণ আত্মপ্রকাশ করতো না। এসব কিছুই তাঁর ইচ্ছার ভিত্তিতে হচ্ছে। কিন্তু ইলাহী ইচ্ছার অধীনে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টিও রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একথাটিকে এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন যে, কেউ যদি হারাম পন্থার মাধ্যমে তার রিযিক লাভের চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তাকে ঐ পন্থায়ই রিযিক দান করেন। এটা তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার অধীনে চোর, ডাকাত বা ঘুসখোরকে রিযিক দেয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ চুরি, ডাকাতি এবং ঘুসখোর পছন্দ করেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা একথাটাই বলছেন যে, তোমরা কুফরি করতে চাইলে করো। আমি জোর করে তাতে বাধা দিয়ে তোমাদেরকে মুমিন বানাবো না। তবে তোমরা বান্দা হয়ে ঠাট্টা ও পালনকর্তার সাথে কুফরি করবে তাও আমার পছন্দ নয়। কারণ, তা তোমাদের জন্যই ক্ষতিকর। এতে আমার প্রভুত্ব আদৌ কোন আঁচড় লাগে না।

২১. এখানে 'কুফর' এর বিপরীতে 'ইমান' শব্দ ব্যবহার না করে 'শোকার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে আপনা থেকেই এ বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায় যে, কুফরী প্রকৃতপক্ষে অকৃতজ্ঞতা ও নেমক হারামির নাম আর ইমান প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনিবার্য

أَمِنْ هَؤُلَاءِ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا
رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلُوا الْآلْبَابِ ۝

(এ ব্যক্তির আচরণই সুনসর না সে ব্যক্তির আচরণ সুনসর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, আবেহরাতকে ভয় করে এবং নিস্কর রবের রহমতের আশা করে? এদের জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে? কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

দাবী। যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীর সামান্য অনুভূতিও আছে সে ইমান ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণে 'শোকর' ও 'ইমান' এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, যেখানে শোকর থাকবে সেখানে ইমানও অবশ্যই থাকবে। অপর দিকে যেখানে কুফরী থাকবে সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতা থাকার কোন প্রসই ওঠে না। কারণ কুফরীর সাথে "শোকরের" কোন অর্থ হয় না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে তার কাজ-কর্মের জন্য দায়ী। কেউ যদি অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা তার অসন্তুষ্টি থেকে বাচার জন্য কুফরী করে তাহলে সে লোকেরা তার কুফরীর বোঝা নিজেদের মাথায় উঠিয়ে নেবে না। বরং তাকেই তার কাজের পরিণাম ভোগ করার জন্য রেখে দেবে। সুতরাং কুফরীর ভ্রান্তি এবং ইমানের সত্যতা যার কাছে পরিকার হয়ে যাবে তার উচিত ভুল আচরণ পরিত্যাগ করে সঠিক আচরণ গ্রহণ করা এবং নিজের বংশ, জাতি-পোষ্টী বা সম্প্রদায়ের সাথে থেকে নিজেকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত না বানানো।

২৩. মানুষ বলতে এখানে সেসব কাফেরদের বুঝানো হয়েছে যারা অকৃতজ্ঞতার আচরণ করে যাচ্ছে।

২৪. অর্থাৎ সুদিনে সে যেসব উপাস্যকে ডাকতো সেই সময় তাদের কথা মনে হয় না। সে তখন তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। সে যে তার মনের গভীরে অন্য উপাস্যদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন হওয়ার অনুভূতি রাখে এবং আল্লাহই যে প্রকৃত ক্ষমতা-ইখতিয়ারের মালিক এ বাস্তবতাবোধও তার মন-মস্তিষ্কের কোথাও না কোথাও অবদমিত হয়ে পড়ে আছে এটা যেন তারই প্রমাণ।

২৫. অর্থাৎ যে সময় সে অন্যসব উপাস্যদের পরিত্যাগ করে কেবল একক ও লা-শরীক আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করছিলো সে দুঃসময়ের কথা তার মনে থাকে না।

২৬. অর্থাৎ অন্যদের দাসত্ব করতে শুরু করে। তাদেরই আনুগত্য করে। তাদের কাছেই প্রার্থনা করে এবং তাদের সামনেই নযর-নিয়াজ পেশ করতে শুরু করে।

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২ রুক'

[হে নবী, (সা)] বলো, হে আমার সেসব বান্দা যারা ইমান গ্রহণ করেছো, তোমাদের রবকে ভয় করো।^{২৯} যারা এ পৃথিবীতে সদাচরণ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ।^{৩০} আর আল্লাহর পৃথিবী তো অনেক বড়।^{৩১} ধৈর্যশীলদেরকে তো অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে।^{৩২}

২৭. অর্থাৎ নিজে পঞ্চতট হয়েই ক্ষান্ত হয় না। অন্যদেরকেও একথা বলে পঞ্চতট করে যে, আমার ওপর যে বিপদ এসেছিলো তা অমুক হযরতের কিংবা অমুক বুযর্গের বা অমুক দেবী ও দেবতাকে নয়রানা পেশ করে দূর হয়েছে। এতে আরো অনেক মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের ভক্ত ও অনুসারী হয়ে যায় আর প্রত্যেক জাহেল এ ধরনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে জনসাধারণের গোমরাহী বাড়িয়ে তুলতে থাকে।

২৮. প্রকাশ থাকে যে, এখানে দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর মানুষ দুঃসময় আসলে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে গায়রুল্লাহর বন্দেগী করে। আরেক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর দাসত্বকে তাদের স্থায়ী নীতি বানিয়ে নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ইবাদাত করা তাদের একনিষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ। এর মধ্যে প্রথম দলের অন্তরভুক্ত লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা বড় বড় গ্রন্থাগার চষে থাকলেও কিছু এসে যায় না। আর দ্বিতীয় দলের অন্তরভুক্ত লোকদেরকে জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে একেবারে নিরক্ষর হলেও কিছু এসে যায় না। কারণ, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে সত্য সম্পর্কে জ্ঞান ও তদানুযায়ী কাজ। এর ওপরেই মানুষের সাফল্য নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন : এই দুই শ্রেণীর মানুষ কি করে সমান হতে পারে। কি করে সম্ভব যে, তারা দুনিয়ায় মিলে মিশে একই নিয়ম-পন্থায় চলবে এবং আখেরাতেও একই পরিণামের সম্মুখীন হবে।

২৯. অর্থাৎ শুধু মেনে নেবে তাই নয়, বরং তার সাথে সাথে তাকওয়াও অবলম্বন করো, আল্লাহ যেসব কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন তার ওপর আমল করো, যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকো এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা মনে রেখে দুনিয়াতে কাজ করো।

৩০. দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির কল্যাণ। তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেরই কল্যাণ সাধিত হবে।

৩১. অর্থাৎ যদি একটি শহর, অঞ্চল বা দেশ আল্লাহর বান্দাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যেখানে বিপদাপদ নেই সেখানে চলে যাও।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَنْ
 أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۖ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۖ فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ
 مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۖ

(হে নবী,) এদের বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করি। আমাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যেন আমি সবার আগে মুসলমান হই।^{৩৩} বলো, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে আমার একটি ভয়ানক দিনের ভয় আছে। বলে দাও, আমি আনুগত্যসহ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করবো। তোমরা তাঁর ছাড়া আর যাদের ইচ্ছা দাসত্ব করতে থাকো। বলো, প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভাল করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা।^{৩৪}

৩২. যারা আল্লাহতীকৃত ও নেকীর পথে চলার ক্ষেত্রে সব রকমের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছে কিন্তু ন্যায়ের পথ থেকে সরেনি তার মধ্যে সেসব লোক অন্তরভুক্ত যারা দীন ও ইমানের কারণে হিজরত করে দেশান্তরিত হওয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে এবং সেসব লোকও অন্তরভুক্ত যারা জুলুম-নির্যাতনে ভরা দেশে থেকে সাহসিকতার সাথে সব বিপদের মোকাবিলা করতে থাকবে।

৩৩. অর্থাৎ আমার কাজ শুধু অন্যদের বলা নয়, নিজে করে দেখানোও। আমি যে পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাই সর্বপ্রথম আমিই সে পথে চলি।

৩৪. কোন ব্যক্তির কারবারে খাটানো সমস্ত পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং বাজারে তার পাওনাদারের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, নিজের সবকিছু দিয়েও সে দায়মুক্ত হতে পারে না তাহলে এরূপ অবস্থাকেই সাধারণভাবে দেউলিয়াত্ব বলে। এখানে আল্লাহ তা'আলা কাকের ও মুরিকদের জন্য এ রূপক ভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। মানুষ এ পৃথিবীতে জীবন, আয়ু, জ্ঞান-বুদ্ধি, শরীর, শক্তি, যোগ্যতা, উপায়-উপকরণ এবং সুযোগ-সুবিধা যত জিনিস লাভ করেছে তার সমষ্টি এমন একটি পুঁজি যা সে পার্থিব জীবনের কারবারে খাটায়। কেউ যদি এ পুঁজির সবটাই এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে খাটায় যে, কোন ইলাহ নেই কিংবা অনেক ইলাহ আছে আর সে তাদের বান্দা। তাকে কারো কাছে হিসেব দিতে হবে না, কিংবা হিসেব-নিকেশের সময় অন্য কেউ এসে তাকে রক্ষা করবে, তাহলে

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ
 عِبَادَهُ ۖ يَعْبَادُونَ ۖ فَاتَّقُوا ۝ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
 وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
 فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُدِيَ لَهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ

الْأَبَاب ۝

তাদেরকে মাথার ওপর থেকে এবং নীচে থেকে আগুনের স্তর আচ্ছাদিত করে রাখবে। এ পরিণাম সম্পর্কেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জীতি প্রদর্শন করেন, হে আমার বান্দারা, আমার গযব থেকে নিজেদের রক্ষা করো। কিন্তু যেসব লোক তাওতের^{৩৫} দাসত্ব বর্জন করেছে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে তাদের জন্য সু-সংবাদ। [হে নবী (সা)] আমার সেসব বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার ভাল দিকটি অনুসরণ করে।^{৩৬} এরাই সেসব মানুষ যাদের আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং এরাই বুদ্ধিমান।

তার অর্থ হচ্ছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং নিজের সবকিছু খুঁয়ে বসলো। এটা হচ্ছে প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে, এ ভ্রান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সে যত কাজই করলো সেসব কাজের ক্ষেত্রে সে নিজেকে সহ দুনিয়ার বহু মানুষ, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং আল্লাহর আরো বহু সৃষ্টির ওপর জীবনভর জুলুম করলো। তাই তার বিরুদ্ধে অসংখ্য দাবী আসলো। কিন্তু তার কাছে এমন কিছুই নেই যে, সে এসব দাবী পূরণ করতে পারে। তাছাড়া আরো একটি ক্ষতি হচ্ছে, সে নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না, বরং নিজের সন্তান-সন্ততি, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতিকেও তার ভ্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভ্রান্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করলো। এ তিনটি ক্ষতির সমষ্টিকে আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম ক্ষতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩৫. طَغَوْتَ শব্দটি طَغِيَان শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিদ্রোহ। কাউকে طَغَى বিদ্রোহী না বলে যদি 'ভাঙত' (বিদ্রোহ) বলা হয় তাহলে তার অর্থ হয় চরম মাত্রার বিদ্রোহী। উদাহরণ স্বরূপ কাউকে সুন্দর বলার পরিবর্তে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হয় সে যারপর নাই সুন্দর। আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উপাস্যদের ভাঙত বলার কারণ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করা তো নিছক বিদ্রোহ। কিন্তু যে অন্যদের দিয়ে নিজের দাসত্ব করায় সে চরম পর্যায়ের বিদ্রোহী। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাক্বীমুল কুরআন, আল-বাকারাহ, টীকা, ২৮৬; আন নাহল, টীকা, ৩২)। এখানে طَغَوْتَ শব্দটি طَرَاغِيَت অর্থাৎ বহু সংখ্যক বিদ্রোহী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

أَفَمِنْ حَقِّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۚ لَكِنَّ الَّذِينَ
 اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۝ الرُّرَّتَانِ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
 ثُمَّ يَهْرِجُ مُتَقَرَّبًا ثُمَّ جَعَلَ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي
 الْأَلْبَابِ ۝

(হে নবী,) যে ব্যক্তিকে আযাব দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তাকে কে রক্ষা করতে পারে? ৩৭ যে আগুনের মধ্যে পড়ে আছে তাকে কি তুমি রক্ষা করতে পার? তবে যারা তাদের রবকে ভয় করে চলছে তাদের জন্য রয়েছে বহুতল সু উচ্চ বৃহৎ প্রাসাদ যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তারপর তাকে পৃথিবীর ওপর স্রোত, ঝর্ণাধারা এবং নদীর আকারে ৩৮ প্রবাহিত করেছেন। অতপর সেই পানি দ্বারা তিনি নানা রংএর শস্য উৎপাদন করেন। পরে সে শস্য পেকে শুকিয়ে যায়। তারপর তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। অবশেষে আল্লাহ তা ভূমিতে পরিণত করেন। নিচয়ই জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্নদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে। ৩৯

তাই يُعَذِّبُونَهَا أَنْ বলা হয়েছে। যদি একবচন হতো তাহলে ব্যবহৃত শব্দ হতো يَعْبُدُونَهَا ।

৩৬. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তারা যে কোন কথা শুনেই তা অনুসরণ করে না। তারা প্রত্যেকের কথা শুনে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং যেটি ন্যায় ও সত্য কথা তা গ্রহণ করে। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তারা কোন কথা শুনে তার ভুল অর্থ করার চেষ্টা করে না বরং তার ভাল অর্থ গ্রহণ করে।

৩৭. অর্থাৎ যে নিজেই নিজেকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহও তাকে শাস্তি দানের ফায়সালা করেছেন।

أَفَمِنْ شَرِّ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
 قُلُوبِهِم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝

৩ রুকু'

আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন^{৪০} এবং যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আলোতে চলছে^{৪১} সে কি (সে ব্যক্তির মত হতে পারে যে এসব কথা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি?) ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর উপদেশ বাণীতে আরো বেগী কঠোর হয়ে গিয়েছে।^{৪২} সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।

৩৮. মূল আয়াতে يَنَابِيعُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা এ তিনটি জিনিস বুঝাতেই ব্যবহার করা হয়।

৩৯. অর্থাৎ এ থেকে একজন বুদ্ধিমান মানুষ এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, দুনিয়ার এ জীবন ও এর সব সৌন্দর্য ও চাকচিক্য অস্থায়ী। প্রতিটি বসন্তের পরিণামই শরতের মর্শ্বিনতা এবং যৌবনের পরিণাম বার্ধক্য ও মৃত্যু। প্রতিটি উত্থানই অবশেষে পতনে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং এ পৃথিবী এমন জিনিস নয় যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষ আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে যেতে পারে এবং এখানকার স্বপ্নস্বায়ী বসন্তের মজা উপভোগ করার জন্য এমন আচরণ করবে যা তার পরিণামকে ধ্বংস করবে। তাছাড়া একজন বুদ্ধিমান লোক এসব দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে যে, এ দুনিয়ার বসন্ত ও শরত আল্লাহর ইচ্ছাভিত্তিক। তিনি যাকে ইচ্ছা উত্থান ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা দুর্দশাগ্রস্ত করেন। আল্লাহ যাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করছেন তার বেড়ে ওঠা যেমন কেউ রোধ করতে পারে না। তেমনি আল্লাহ যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে মাটিতে মিশে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তিও কারো নেই।

৪০. অর্থাৎ এ সমস্ত বাস্তব ব্যাপার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ এবং ইসলামকে অকাটা ও নির্ভুল সত্য বলে মেনে নেয়ার যোগ্যতা ও সুযোগ আল্লাহ যাকে দিয়েছেন। কোন ব্যাপারে মানুষের বক্ষ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া মূলত এমন একটি মানসিক অবস্থার নাম, যখন তার মনে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা সন্দেহ-সংশয় থাকে না এবং কোন বিপদের আতঙ্ক বা কোন ক্ষতির আশংকাও তাকে ঐ বিষয় গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারে না। বরং সে পূর্ণ মানসিক তৃপ্তির সাথে এ সিদ্ধান্ত করে যে, এ জিনিসটি ন্যায় ও সত্য। তাই যাই ঘটুক না কেন আমাকে এর ওপরই চলতে হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন ব্যক্তি যখন ইসলামের পথ অবলম্বন করে তখন আল্লাহ ও রসুলের পক্ষ থেকে যে নির্দেশই আসে তা সে অনিচ্ছায় নয় খুশী ও আগ্রহের সাথে মেনে নেয়। কিতাব ও সূরাহ থেকে যে অকাইদ ও ধ্যান-ধারণা এবং যে নীতিমালা ও নিয়ম-কানুন তার সামনে আসে তা সে এমনভাবে গ্রহণ করে যেন সেটাই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। কোন অবৈধ সুবিধা পরিত্যাগ করতে তার কোন অনুশোচনা হয় না। সে মনে করে ঐগুলো তার

اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَنْفَعُ مَنْ جُلُوْدُ الدِّينِ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنَ جُلُوْدَهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدٰى
اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাখিল করেছেন, এমন একটি গ্রন্থ যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ^{৪১} যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এসব শুনে সে লোকদের লোম শিউরে ওঠে যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত। এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে নিয়ে আসেন। আর যাকে আল্লাহ নিজেই হিদায়াত দান করেন না তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই।

জ্ঞান কল্যাণকর কিছু ছিল না। বরং তা ছিল একটি ক্ষতি যা থেকে সে আল্লাহর অনুগ্রহে রক্ষা পেয়েছে। অনুরূপ ন্যায় ও সত্যের ওপর কায়ম থাকার কারণে তার যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে সে সেই জ্ঞান আফসোস করে না, ঠাণ্ডা মাথায় তা বরদাশত করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তার কাছে ঐ ক্ষতি হালকা মনে হয়। বিপদাপদ আসলে তার এ একই অবস্থা হয়। সে মনে করে, আমার দ্বিতীয় কোন পথই নেই— এ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য, যে পথ দিয়ে আমি বের হয়ে যেতে পারি। আল্লাহর সরল সোজা পথ একটিই। আমাকে সর্বাবস্থায় ঐ পথেই চলতে হবে। বিপদ আসলে আসুক।

৪১. অর্থাৎ জ্ঞানের আলো হিসেবে সে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সূরাত লাভ করেছে যার উজ্জ্বল আলোতে সে জীবনে চলার অসংখ্য ছোট ছোট পথের মধ্যে কোনটি ন্যায় ও সত্যের সোজা রাস্তা তা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পায়।

৪২. “শরহে সদর” (উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন) এর বিপরীতে মানুষের মনের দু’টি অবস্থা হতে পারে। একটি হচ্ছে ‘দীকে সদর’ (বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, মন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া) এর অবস্থা। এ অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কিছু না কিছু অবকাশ থাকে। দ্বিতীয়টি ‘কাসাওয়াতে কালব’ (মন কঠিন হয়ে যাওয়া) এর অবস্থা। এ অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কোন সুযোগই থাকে না। দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলছেন : যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তার জন্য সর্বাত্মক ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই। এর অর্থ হচ্ছে, মনের সংকীর্ণতার সাথে হলেও কেউ যদি একবার ন্যায় ও সত্যকে কোনভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলেও তার জন্য রক্ষা পাওয়ার কিছু না কিছু সম্ভাবনা থাকে। আয়াতের বর্ণনাতন্ত্রি হতে এ দ্বিতীয় বিষয়টি আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা তা সুস্পষ্ট করে বলেননি। কারণ, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় জেদ ও হঠকারিতা করতে একপায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিলো যে, কোনমতেই তাঁর কোন কথা মানবে না, আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে এ মর্মে

أَفَمَن يَتَّقِي بُوْجَهُ سَوَاءٌ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاتَمَرَّ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٨٥﴾ فَادْفَعُوا لِللَّهِ الْحِجْرَةَ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ
الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كُنْتُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

তুমি সে ব্যক্তির দুর্দশা কি করে উপলব্ধি করবে যে কিয়ামতের দিন আগ্রাহর আঘাতের কঠোর আঘাত তার মুখমণ্ডলের ওপর নেবে? ৪৪ এসব জালেমদের বলে দেয়া হবে : এখন সেসব উপার্জনের ফল ভোগ করো যা তোমরা উপার্জন করেছিলে। ৪৫ এদের পূর্বেও বহু লোক এভাবেই অস্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত এমন এক দিক থেকে তাদের ওপর আঘাত আপতিত হয়েছে যা তারা কল্পনাও করতে পারতো না। আগ্রাহ দুনিয়ার জীবনেই তাদেরকে লাঞ্ছনার শিকার করেছেন। আখেরাতের আঘাত তো তার চেয়েও অধিক কঠোর। হায়! তারা যদি তা জানতো।

সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এ জিদ ও ইচ্ছাকৃতিকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে মনে করে থাকো। কিন্তু আগ্রাহর যিকর এবং তাঁর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বাণী শুনে বিনয় হওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি আরো বেশী কঠোর হয়ে যায় তাহলে একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় অযোগ্যতা ও দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই।

৪৩. ঐ সব বাণীর মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা কিতাব একই দাবী, একই আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা ও কর্মের একই আদর্শ পেশ করে। এর প্রতিটি অংশ অন্য সব অংশের এবং প্রতিটি বিষয় অন্য সব বিষয়ের সত্যায়ন, সমর্থন এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। অর্থ ও বর্ণনা উভয় দিক দিয়েই এ গ্রন্থের পূর্ণ মিল ও সামঞ্জস্য (Consistency) বিদ্যমান।

৪৪. মানুষ মুখমণ্ডলের ওপর কোন আঘাত তখনই গ্রহণ করে যখন সে পুরোপুরি অক্ষম ও নিরুপায় হয়ে পড়ে। অন্যথায় যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে প্রতিরোধের সামান্যতম শক্তিও থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শরীরের প্রত্যেকটি অংশে আঘাত সহ্য করতে থাকে কিন্তু মুখের ওপর আঘাত লাগতে দেয় না। তাই এখানে ঐ ব্যক্তির চরম অসহায়ত্বের চিত্র অংকন করা হয়েছে এই বলে যে, সে নিজের মুখের ওপর চরম আঘাত সহ্য করবে।

৪৫. মূল আয়াতে **كَسَبَ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মজীদে পরিভাষায় **كَسَبَ** শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি তার কর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে শাস্তি ও পুরস্কারলাভের যে উপযুক্ততা অর্জন করে তাই। সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের আসল উপার্জন হচ্ছে এই যে, সে তার কাজের ফলশ্রুতিতে আগ্রাহর কাছে পুরস্কারের যোগ্য হয়ে যায়। আর গোমরাহী ও

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾
 قَرَأْنَا عَرَبِيًّا وَغَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ
 شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّكَ مِيتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿١٩﴾ ثَمَّ أَنْكَرُوا الْقِيمَةَ
 عِنْدَ بَكْرٍ تَخْتَصِمُونَ ﴿٢٠﴾

এ কুরআনের মধ্যে আমি মানুষের জন্য নানা রকমের উপমা পেশ করেছি যাতে তারা সাবধান হয়ে যায়, আরবী ভাষার কুরআন^{৪৬}— যাতে কোন বক্তৃতা নেই।^{৪৭} যাতে তারা মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ একটি উপমা পেশ করেছেন। একজন ক্রীতদাসের—যে কতিপয় রূঢ় চরিত্র প্রভুর মালিকানাভুক্ত, যারা সবাই তাকে নিজের দিকে টানে এবং আরেক ব্যক্তির যে পুরোপুরি একই প্রভুর ক্রীতদাস। এদের দু'জনের অবস্থা কি সমান হতে পারে^{৪৮} সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।^{৪৯} কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে।^{৫০} [হে নবী (সা)] তোমাকেও মরতে হবে এবং এসব লোককেও মরতে হবে।^{৫১} অবশেষে তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সামনে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবে।

বিপথগামিতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের প্রকৃত উপার্জন হচ্ছে, সে শাস্তি যা সে আখেরাতে লাভ করবে।

৪৬. অর্থাৎ এ কিতাব অন্য কোন ভাষায় নাখিল হয়নি যে, তা বুঝার জন্য মক্কা ও আরবের লোকদের কোন অনুবাদক বা ব্যাখ্যাকারের দরকার হয়। এ কিতাব তাদের নিজের ভাষায় নাখিল হয়েছে। যা তারা নিজেরাই সরাসরি বুঝতে সক্ষম।

৪৭. অর্থাৎ তার মধ্যে কোন বক্তৃতা বা জটিলতাপূর্ণ কোন কথা নেই যে, তা বুঝা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন হবে। বরং এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে সহজ-সরল কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এখান থেকে ছেনে নিতে পারে এ গ্রন্থ কোন জিনিসকে ভ্রান্ত বলে এবং কেন বলে? কোন জিনিসকে সঠিক বলে এবং কিসের ভিত্তিতে? কি স্বীকার করাতে চায় এবং কোন জিনিস অস্বীকার করাতে চায়। কোন কোন কাজের নির্দেশ দেয় এবং কোন কোন কাজে বাধা দেয়।

৪৮. এ উপমাতে আল্লাহ তা'আলা শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য এবং মানব জীবনের ওপর এ দু'টির প্রভাব এমন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এতো বড় বিষয়কে এর চেয়ে সঠিকভাবে কথায় এবং এতটা কার্যকর পন্থায় বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। একথা সবাই

স্বীকার করবে যে, যে ব্যক্তি অনেক মালিক বা মনিবের অধীন এবং তারা প্রত্যেকেই তাকে নিজের দিকে টানে। তারা এমন বদমেজাজী যে, প্রত্যেকে তার সেবা গ্রহণ করতে চায় কিন্তু অন্য মালিকের নির্দেশ পালনের সুযোগ তাকে দেয় না, তাছাড়া তাদের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ শুনতে গিয়ে যার নির্দেশই সে পালন করতে অপারগ হয় সে তাকে শুধু ধমক ও বকাঝকা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং শাস্তি দিতেও বদ্ধপরিকর হয়, এমন ব্যক্তির জীবন অনিবার্যরূপেই অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্যে পতিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একই মনিবের চাকর সে ব্যক্তি অতীব আরাম ও শান্তিতে জীবন যাপন করবে। তাকে অন্য কারো খেদমত এবং সন্তোষ বিধান করতে হয় না। এটা এমন সহজ সরল কথা যা বুঝার জন্য বড় বেশী চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হয় না। এ উপমা পেশ করার পর কারো জন্য একথা বুঝাও কঠিন নয় যে এক আল্লাহর দাসত্বে মানুষের জন্য যে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে বহু সংখ্যক ইলাহর দাসত্ব করে কখনো তা লাভ করা যেতে পারে না।

এখানে একথাও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, পাথরের মূর্তির সাথে বহু সংখ্যক বস্ত্র বস্ত্রাবের এবং পরস্পর কলহপ্রিয় মনিবদের উপমা খাটে না। এ উপমা সেসব জীবন্ত মনিবদের ক্ষেত্রেই খাটে যারা কার্যতই পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দান করে এবং বাস্তবেও তাকে নিজের দিকে টানতে থাকে। পাথরের মূর্তি কাকে কবে আদেশ দেয় এবং কাকে কখন নিজের খেদমতের জন্য ডাকে? এ তো জীবন্ত মনিবদের কাজ। মানুষের নিজের প্রবৃত্তির মধ্যে এক মনিব বসে আছে। সে নানা রকমের ইচ্ছা-আকাংখা তার সামনে পেশ করে এবং তা পূরণ করতে বাধ্য করে। আরো অসংখ্য মনিব ও প্রভু আছে। তারা ঘরের মধ্যে, বংশের মধ্যে, জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে, জাতি ও দেশের সমাজের মধ্যে, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে, শাসক ও আইন প্রণেতাদের মধ্যে, কায়কারবার ও জীবিকার গতির মধ্যে এবং পৃথিবীর সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিসমূহের মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। তাদের পরস্পর বিরোধী আকাংখা ও বিভিন্ন দাবী মানুষকে সদসময় নিজের দিকে টানতে থাকে। সে তাদের যার আকাংখা ও দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তাকে নিজের কর্মের গতির মধ্যে শান্তি না দিয়ে ছাড় দেয় না। তবে প্রত্যেকের শান্তির উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ মনে আঘাত দেয়, কেউ অসন্তুষ্ট হয়, কেউ উপহাস করে, কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেউ নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করে, কেউ ধর্মের ওপর আক্রমণ করে এবং কেউ আইনের আশ্রয় নিয়ে শাস্তি দেয়। মানুষের জন্য এ সংকীর্ণতা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র উপায় আছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদের পথ গ্রহণ করে শুধু এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়া এবং গলদেশ থেকে অন্যদের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করা।

তাওহীদের পথ অবলম্বন করারও দু'টি পন্থা আছে এবং এর ফলাফলও ভিন্ন ভিন্ন।

একটি পন্থা এই যে, কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু আশে-পাশের পরিবেশ তার সহযোগী হবে না। এ ক্ষেত্রে তার জন্য বাইরের হন্দ্র-সংঘাত ও সংকীর্ণতা আগের চেয়েও বেড়ে যেতে পারে। তবে সে যদি সরল মনে এ পথ অবলম্বন করে থাকে তাহলে মনের দিক দিয়ে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে। সে প্রবৃত্তির এমন প্রতিটি আকাংখা প্রত্যাখ্যান করবে যা আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী বা যা পূরণ করার পাশাপাশি আল্লাহতীক্ষ্ণতার দাবী পূরণ করা যেতে পারে না। সে পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, সরকার, ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং আর্থিক কর্তৃত্বেরও এমন কোন দাবী গ্রহণ করবে না

যা আগ্রাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এর ফলে সে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে পারে তথা অনিবার্যরূপেই হবে কিন্তু তার মন এ ব্যাপারে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত থাকবে যে, আমি যে আগ্রাহর বান্দা তার দাসত্বের দাবী আমি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করছি। আর আমি যাদের বান্দা নই আমার কাছে তাদের এমন কোন অধিকার নেই, যে কারণে আমি আমার রবের নির্দেশের বিরুদ্ধে তাদের দাসত্ব করবো। দুনিয়ার কোন শক্তিই তার থেকে মনের এ প্রশান্তি এবং আত্মার এ শান্তি ও তৃপ্তি ছিনিয়ে নিতে পারে না। এমনকি তাকে যদি ফাঁসি কাঠেও চড়তে হয় তাহলে সে প্রশান্ত মনে ফাঁসি কাঠেও ঝুলে যাবে। সে একথা ভেবে সামান্য অনুশোচনাও করবে না যে, আমি কেন মিথ্যা প্রভুদের সামনে মাথা নত করে আমার জীবন রক্ষা করলাম না।

আরোহি পছন্দ এই যে, গোটা সমাজ তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক এবং সেখানে নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, আইন-কানুন, রীতিনীতি ও দেশাচার, রাজনীতি, অর্থনীতি মোট কথা জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে সেরা মূলনীতি মেনে নেয়া হোক এবং কার্যত চালু করা হোক যা মহান আগ্রাহ তাঁর কিতাব ও রসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন। আগ্রাহর দীন যেটিকে গোনাহ বলবে আইন সেটিকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে, সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সেগুলোকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে, শিক্ষা-দীক্ষা সেটি থেকে বাঁচার জন্য মন-মানসিকতা তৈরী করবে। মিথার ও মিহরাব থেকে এর বিরুদ্ধেই আওয়াজ উঠবে, সমাজ এটিকে দোষণীয় মনে করবে এবং জীবিকা অর্জনের প্রতিটি কায়-কারবারে তা নিষিদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে আগ্রাহর দীন যে জিনিসকে কল্যাণ ও সুকৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করবে আইন তাকেই সমর্থন করবে। ব্যবস্থাপনার শক্তি তার লাগন-পালন করবে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা মন-মগজে সেটিকে বহুমূল করতে এবং চরিত্র ও কর্মে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবে। মিথার ও মিহরাব তারই শিক্ষা দেবে, সমাজও তারই প্রশংসা করবে। তার ওপরেই প্রচলিত রীতিনীতি কার্যত প্রতিষ্ঠিত করবে এবং কায়-কারবার ও জীবন জীবিকার প্রক্রিয়াও সে অনুসারেই চলবে। এভাবেই মানুষ পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তি লাভ করে এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমস্ত দরজা তার জন্য খুলে যায়। কারণ, আগ্রাহ ও গায়রুগ্গাহর দাসত্বের দাবীর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা তখন প্রায় শেষ হয়ে যায়।

ইসলাম যদিও প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বলে আহবান জানায় যে, দ্বিতীয় অবস্থাটা সৃষ্টি হোক বা না-হোক সর্বাবস্থায় সে তাওহীদকেই তার আদর্শ হিসেবে মেনে চলবে এবং সব রকম বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করে আগ্রাহর দাসত্ব করবে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য এ দ্বিতীয় অবস্থা সৃষ্টি করা। সমস্ত নবী ও রসূল আলাইহিমুস সালামের প্রচেষ্টা ও দাবীও এই যে, একটি মুসলিম উম্মাহর উত্থান ঘটুক যারা কুফর ও কাফেরদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে জামায়াত বদ্ধভাবে আগ্রাহর দীন অনুসরণ করবে। কুরআন ও সূরাত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিবেক-বুদ্ধিহীন না হয়ে কেউই একথা বলতে পারে না যে, নবী রসূল আলাইহিমুস সালামের চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য ছিল শুধু ব্যক্তিগত ঈমান ও আনুগত্য। সামাজিক জীবনে 'দীনে হক' বা ন্যায় ও সত্যের আদর্শ কয়েম করার উদ্দেশ্যে আদৌ তাঁদের ছিল না।

فَمِنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ
 أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۖ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ
 بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

৪ রুকু'

সে ব্যক্তির চাইতে বড় জ্বালাম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তার সামনে যখন সত্য এসেছে তখন তা অস্বীকার করেছে? এসব কাফেরের জন্য কি জাহান্নামে কোন জায়গা নেই? আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই আযাব থেকে রক্ষা পাবে।^{৫২}

৪৯. এখানে “আলহামদুলিল্লাহ” এর অর্থ বুঝার জন্য মনের মধ্যে এ চিত্রটি অংকন করুন যে, ঘোড়াদের সামনে উপরোক্ত প্রশ্ন পেশ করার পর বক্তা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন যাতে তাওহীদের বিরোধিতাকারীদের কাছে তার কোন জবাব থাকলে যেন দিতে পারে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে যখন কোন জবাব আসলো না এবং কোন দিক থেকে এ জবাবও আসলো না যে, দু’টি সমান, তখন বক্তা বললেন ‘আলহামদুলিল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহর শুকরিয়া যে তোমরা নিজেরাও মনে মনে এ দু’টি অবস্থার পার্থক্য অনুভব করে থাকো। একজন মনিবের দাসত্বের চেয়ে অনেক মনিবের দাসত্ব উত্তম বা দু’টি সমান পর্যায়ে একথা বলার ধূর্ততা তোমাদের কারোই নেই।

৫০. অর্থাৎ একজন মনিবের দাসত্ব ও বহু সংখ্যক মনিবের দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য তো বেশ বুঝতে পার কিন্তু এক প্রভুর দাসত্ব ও বহু সংখ্যক প্রভুর দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য যখন বুঝানোর চেষ্টা করা হয় তখন অজ্ঞ সেজে বসো।

৫১. এ বাক্যাংশ ও পূর্ববর্তী বাক্যাংশের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা আছে যা স্থান কাল ও পূর্বাণর বিষয়ে চিন্তা করে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেই পূর্ণ করতে পারেন। এখানে এ বিষয়টি প্রচ্ছন্ন আছে যে, তোমরা এভাবে একটি পরিষ্কার সহজ-সরল কথা সহজ-সরল উপায়ে এসব লোককে বুঝাচ্ছে আর এরা ইচ্ছাকৃত করে তোমাদের কথা শুধু প্রত্যাখ্যানই করছে না বরং এ সুস্পষ্ট সত্যকে পরাভূত করার জন্য তোমাদের চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক আছে! চিরদিন তোমরাও থাকবে না, এরাও থাকবে না। একদিন উভয়কেই মরতে হবে। তখন সবাই যার যার পরিণাম জানতে পারবে।

৫২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলার আদালতে যে মোকদ্দমা দায়ের হবে তাতে কোন্ লোকেরা শাস্তি লাভ করবে তা তোমরা আজই শুনে নাও। তাতে নিশ্চিতভাবে সে লোকেরাই শাস্তি পাবে যারা এ মিথ্যা আকীদা গড়ে নিয়েছিলো যে, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ইখতিয়ার এবং অধিকারে অন্য কিছু সত্তাও শরীক আছে। তাদের আরো বড় অপরাধ ছিল এই যে, তাদের সামনে সত্য পেশ করা হয়েছে কিন্তু তারা তা মানেনি। বরং যিনি সত্য পেশ করেছেন উন্টো তাকেই মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে।

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۚ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَاءٍ ۝

তারা তাদের রবের কাছে যা চাইবে তা-ই পাবে।^{৫৩} এটা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। যাতে সর্বাপেক্ষা খারাপ যেসব কাজ তারা করেছে আল্লাহ তাদের হিসেব থেকে সেগুলো বাদ দেন এবং যেসব ভাল কাজ তারা করেছে তার বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার দান করেন।^{৫৪}

[হে নবী, (সা)] আল্লাহ নিজে কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? এসব লোক তাঁকে বাদ দিয়ে তোমাদেরকে অন্যদের ভয় দেখায়।^{৫৫} অথচ আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে নিষ্কেপ করেন তাকে কেউ পথপ্রদর্শন করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ কি মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?^{৫৬}

পক্ষান্তরে যিনি সত্য এনেছেন আর যারা তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে আল্লাহর আদালতে তাদের শাস্তি পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

^{৫৩}. একথা লক্ষ রাখতে হবে যে, এখানে فِي الْجَنَّةِ (জান্নাতে) না বলে عِنْدَ رَبِّهِمْ (তাদের রবের কাছে) কথাটি বলা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে মৃত্যুর পরেই কেবল বান্দা তার রবের কাছে পৌছে। তাই জান্নাতে পৌছার পর এ আচরণ করা হবে না। বরং মৃত্যুর পর থেকে জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত সময়ও মু'মিন নেক্কার বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলা এ আচরণ করবেন। এটাই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় বলে মনে হয়। ইমানদার সৎকর্মশীল বান্দা বরযখের আযাব থেকে, কিয়ামতের দিনের কষ্ট থেকে, হিসেবের কঠোরতা থেকে, হাশরের ময়দানের অপমান থেকে এবং নিজের দুর্বলতা ও অপরাধের কারণে পাকড়াও থেকে অবশ্যই রক্ষা পেতে চাইবে, আর মহিমান্বিত আল্লাহ তার এসব আকাংখা পূরণ করবেন।

^{৫৪}. যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ইমান এনেছিলো তাদের দ্বারা জাহেলী যুগে আকীদাগত ও চরিত্রগত উভয় ধরনের জঘন্যতম গোনাহর কাজও সংঘটিত হয়েছিল। ইমান গ্রহণের পর তারা যে শুধু পূর্ব অনুসৃত মিথ্যা পরিত্যাগ করে

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٩﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٧١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٧٢﴾

তোমরা যদি এদের জিজ্ঞেস করো যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ। এদের বলে দাও, বাস্তব ও সত্য যখন এই তখন আল্লাহ যদি আমার ক্ষতি করতে চান তাহলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব দেবীদের তোমরা পূজা করো তারা কি তাঁর ক্ষতির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? কিংবা আল্লাহ যদি আমাকে রহমত দান করতে চান তাহলে এরা কি তাঁর রহমত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? তাদের বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তারই ওপর ভরসা করে।^{৫৭} তাদেরকে পরিকার করে বলে দাও হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাকো।^{৫৮} আমি আমার কাজ করে যাবো। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব আসে এবং কে চিরস্থায়ী আযাবে নিষ্কিন্ত হয়। [হে নবী (সা)] আমি সব মানুষের জন্য এ সত্য (বিধান সহ) কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যে সোজা পথ অনুসরণ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পথভ্রষ্টতার প্রতিফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। তার জন্য তুমি দায়ী হবে না।^{৫৯}

নবীর (সা) পেশকৃত সত্যকে গ্রহণ করেছিলো এবং এটিই তাদের একমাত্র নেকীর কাজছিল তাই নয়, বরং তারা নৈতিক চরিত্র, ইবাদাত এবং পারস্পরিক লেনদেন ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নেক আমল করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন : জাহেলী যুগে তাদের দ্বারা যেসব জঘন্যতম কাজকর্ম সংঘটিত হয়েছিলো তাদের হিসেব থেকে তা

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ
 فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

৫ রুকু'

মৃত্যুর সময় আল্লাহই রুহসমূহ কবজ করেন আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রুহ কবজ করেন।^{৬০} অতপর যার মৃত্যুর ফায়সালা কার্যকরী হয় তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের রুহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে।^{৬১}

মুছে দেয়া হবে এবং তাদের আমলনামায় সর্বোত্তম যেসব নেক আমল থাকবে তার হিসেবে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে।

৫৫. মক্কার কাফেররা নবীকে (সা) বলতো, তুমি আমাদের উপাস্যদের সাথে বেআদবী করে থাকো এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকো। তারা কত বড় সম্মানিত সন্তা তা তুমি জানো না। যে-ই তাদের অবমাননা ও অপমান করেছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে। তুমি যদি তোমার কথাবার্তা থেকে বিরত না হও তাহলে এরা তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

৫৬. অর্থাৎ এটাও তাদের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলশ্রুতি। কারণ এসব উপাস্যদের শক্তি ও মর্যাদার প্রতি এসব নির্বোধদের ভাল খেয়াল আছে। কিন্তু এ খেয়াল তাদের কখনো আসে না যে, আল্লাহ এক মহা পরাক্রমশালী সন্তা, শিরক করে এরা তাঁর যে অপমান ও অবমাননা করছে সে জন্যও শাস্তি হতে পারে।

৫৭. ইবনে আবী হাতেম ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনেছেন :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
 يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا
 فِي يَدَيْهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ -

“যে ব্যক্তি সব মানুষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতে চায় সে যেন আল্লাহর ওপর ‘তাওয়াক্কুল’ করে, যে ব্যক্তি সবার চেয়ে অধিক ধনবান হতে চায় সে যেন তার নিজের কাছে যা আছে তার চেয়ে আল্লাহর কাছে যা আছে তার ওপর বেশী আস্থা ও নির্ভরতা রাখে, আর যে ব্যক্তি সবার চেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী হতে চায় সে যেন মহান আল্লাহকে ভয় করে।”

أَتَاخَذُ وَأَمِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَآ يَمْلِكُونَ شَيْئًا
وَلَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

এসব লোক কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে? ৬২ তাদেরকে বলো, তাদের ক্ষমতা ও ইচ্ছাতিয়ায়ে যদি কিছু না থাকে এবং তারা কিছু না বুঝে এমতাবস্থায়ও কি সুপারিশ করবে? বলো, সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাতিয়ারাধীন। ৬৩ আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক তিনিই। তোমাদেরকে তারই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

৬৮. অর্থাৎ আমাকে পরাভূত করার জন্য তোমরা যা কিছু করছো এবং যা কিছু করতে সক্ষম তা করে যাও, এ ব্যাপারে কোন কসুর করো না।

৬৯. অর্থাৎ তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার কাজ শুধু এই যে, তাদের সামনে সত্য পথটি পেশ করো। এরপর যদি তারা পথভ্রষ্ট থেকে যায় তাতে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।

৬০. ঘুমন্ত অবস্থায় রুহ কবজ করার অর্থ অনুভূতি ও বোধ, উপলব্ধি ও অনুধাবন এবং ক্ষমতা ও ইচ্ছা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। এটা এমন এক অবস্থা যে “ঘুমন্ত মানুষ ও মৃত মানুষ সমান” এ প্রবাদ বাক্যটি এ ক্ষেত্রে হুবহু খাটে।

৬১. একথা দ্বারা আল্লাহ তা’আলা প্রত্যেক মানুষকে এ অনুভূতি দিতে চাচ্ছেন যে, জীবন ও মৃত্যু কিভাবে তাঁর অসীম ক্ষমতার করায়ত্ত। রাতে ঘুমালে সকালে অবশ্যই জীবিত উঠবে এ নিশ্চয়তা কোন মানুষের জন্যই নেই। কেউ-ই জানে না এক মুহূর্তের মধ্যে তার ওপর কি বিপদ আসতে পারে। আবার পরবর্তী মুহূর্তটি তার জন্য জীবনের মুহূর্ত না মৃত্যুর মুহূর্ত তাও কেউ জানে না। শয়নে, জাগরনে, ঘরে অবস্থানের সময় কিংবা কোথাও চলাফেরা করার সময় মানব দেহের আভ্যন্তরীণ কোন ক্রটি অথবা বাইরের অজানা কোন বিপদ অকস্মাত এমন মোড় নিতে পারে যা তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। যে মানুষ আল্লাহর হাতে এতটা অসহায় সে যদি সেই আল্লাহ সম্পর্কে এতটা অমনোযোগী ও বিদ্রোহী হয় তাহলে সে কত অজ্ঞ।

৬২. অর্থাৎ এসব লোক নিজের পক্ষ থেকেই ধরে নিয়েছে যে, কিছু সত্তা এমন আছে যারা আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তাদের সুপারিশ কখনো বিফলে যায় না। অথচ ভল্লা যে সুপারিশকারী এ ব্যাপারে না আছে কোন প্রমাণ, না আল্লাহ তা’আলা কখনো বলেছেন যে, আমার দরবারে তাদের এ ধরনের মর্যাদা রয়েছে, না ঐ সব সত্তা ও ব্যক্তিবর্গ দাবী করেছেন যে আমরা নিজেদের ক্ষমতায় তোমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেবো। তাদের আরো নির্বুদ্ধিতা এই যে, তারা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে সব অনুমানকৃত

وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ
وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٦٦﴾

যখন শুধু আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না। তাদের মন কষ্ট অনুভব করে। আর যখন তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলা হয় তখন তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।^{৬৫} বলা, হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী, তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে আসছে তুমিই সে বিষয়ে ফায়সালা করবে।

সুপারিশকারীদেরই সবকিছু মনে করে নিয়েছে এবং এদের সকল সবিনয় প্রার্থনা ও আকুতি তাদের জন্যই নিবেদিত।

৬৩. অর্থাৎ সুপারিশ গ্রহণ করানোর ক্ষমতা তো দূরের কথা নিজে নিজেই আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী হিসেবে যাবে সে শক্তিও কারো নেই। যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেয়া ও যাকে ইচ্ছা না দেয়া এবং যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করতে দেয়া আর যার জন্য ইচ্ছা করতে না দেয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইখতিয়ারে। (শাফ') আত সম্পর্কে ইসলামী আকীদা ও শিরুকমূলক আকীদার পার্থক্য বুঝার জন্য নিম্নোক্ত স্থানসমূহে দেখুন। তাকহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ২৮১; আল আন'আম, টীকা ৩৩; ইউনুস, টীকা ৫ ও ২৪; হূদ, টীকা ৮৪ ও ১০৬; আর রা'দ, টীকা ১৯; আন নাহল, টীকা ৬৪, ৬৫, ৭৯; ত্বা-হা, টীকা ৮৫ ও ৮৬; আল আবিয়া, টীকা ২৭; আল হাজ্জ, টীকা ১২৫; আস সাবা, টীকা ৪০)

৬৪. গোটা পৃথিবীর মশরেকী রুচি ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী প্রায় সব মানুষের মধ্যেই এটি বিদ্যমান। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও যে দুর্ভাগাদের এ রোগ পেয়ে বসেছে তারাও এ দোষ থেকে মুক্ত নয়। মুখে বলে আমরা আল্লাহকে মানি। কিন্তু অবস্থা এই যে, শুধু আল্লাহর কথা বলুন, দেখবেন তাদের চেহারা বিকৃত হতে শুরু হয়েছে। এরা বলে বসবে। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বুয়ুর্গ ও আগলিয়াদের মানে না। সে জন্য শুধু আল্লাহর কথাই আঙড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কথাও বলা হয় তাহলে আনন্দে ও প্রফুল্লতায় তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তাদের আগ্রহ ও ভালবাসা কার প্রতি তা এ কর্মপন্থার মাধ্যমেই পরিষ্কার প্রকাশ পায়। আল্লাহ আলুসী তাকসীরে রুহুল মা'আনীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর নিজের একটি অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদিন আমি দেখলাম, কোন বিপদে পড়ে এক ব্যক্তি সাহায্যের জন্য এক মৃত বুয়ুর্গকে ডাকছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে ডাকো। আল্লাহ বলেছেন :

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
 مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
 يَحْتَسِبُونَ ۝ ٦١ وَبَدَّ اللَّهُ مَسَائِدَ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ۝ ٦٢ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ
 نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٦٣

এসব জালেমদের কাছে যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদরাজি এবং তাছাড়া আরো অতটা সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামতের ভীষণ আযাব থেকে বাঁচার জন্য তারা মুক্তিপণ হিসেবে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আগ্নাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু তাদের সামনে আসবে যা তারা কোন দিন অনুমানও করেনি। সেখানে তাদের সামনে নিজেদের কৃতকর্মের সমস্ত মন্দ ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যে জিনিস সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদূষ করতো তা-ই তাদের ওপর চেষ্টে বসবে।

এ মানুষকেই^{৬৫} যখন সামান্য মসিবতে পেয়ে বসে তখন সে আমাকে ডাকে। কিন্তু আমি যখন নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করি তখন সে বলে ওঠে : এসব তো আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধির জোরে লাভ করেছি।^{৬৬} না, এটা বরং পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।^{৬৭}

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

—আমার একথা শুনে সে ভীষণ চটে গেল। পরে লোকজন আমাকে বলেছে, সে বলছিলো : এ ব্যক্তি আওলিয়াদের মানে না। তাছাড়া কিছু সংখ্যক লোক তাকে একথাও বলতে শুনেছে যে, অলীরা আগ্নাহর চাইতে দ্রুত শুনে থাকেন।

৬৫. অর্থাৎ যার আগ্নাহর নাম অপছন্দনীয় এবং একমাত্র আগ্নাহর নামে যার চেহারা বিকৃত হতে শুরু করে।

৬৬. এ আয়াতংশটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, আমি যে, এ নিয়ামতের উপযুক্ত তা আগ্নাহর জানেন। তাই তিনি আমাকে এসব দিয়েছেন। আমি যদি তার কাছে একজন দুট ভট্ট আকীদা এবং দুর্ভাগ্যবান মানুষ হতাম তাহলে আমাকে তিনি এসব,

قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾
 فَاصَابَهُمُ سَيِّئَاتٌ مَّا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ
 سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَّا كَسَبُوا وَمَأْتُهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٦٦﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٧﴾

তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও একথাই বলেছিলো। কিন্তু তারা নিজেদের কর্ম দ্বারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি।^{৬৫} অতপর নিজেদের উপার্জনের মন্দ ফলাফল তারা ভোগ করেছে। এদের মধ্যেও যারা জালেম তারা অচিরেই তাদের উপার্জনের মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। এরা আমাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না। তারা কি জানে না, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন?^{৬৬} এর মধ্যে সেসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান পোষণ করে।

নিয়ামত কেন দিতেন? এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, এসব তো আমি আমার যোগ্যতার ভিত্তিতে লাভ করেছি।

৬৭. কেউ যদি নিয়ামত লাভ করতে থাকে তখন মানুষ তার মুখতা ও অজ্ঞতার কারণে মনে করে, সে অনিবার্যরূপে তার যোগ্যতার ভিত্তিতেই তা লাভ করেছে আর তা লাভ করাটা আল্লাহর দরবারে তার প্রিয়পাত্র হওয়ার লক্ষণ বা প্রমাণ। অথচ এখানে যাকেই যা কিছু দেয়া হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবেই দেয়া হচ্ছে। এটা পরীক্ষার উপকরণ, যোগ্যতার পুরস্কার নয়। অন্যথায় কি কারণে বহু যোগ্য লোক দুর্দশাগ্রস্ত এবং বহু অযোগ্য লোক নিয়ামতের প্রাচুর্যে ডুবে আছে? অনুরূপভাবে এসব পার্থিব নিয়ামত আল্লাহর দরবারে প্রিয়পাত্র হওয়ারও লক্ষণ নয়। যে কোন ব্যক্তি দেখবেন, পৃথিবীতে বহু সংকর্মশীল ব্যক্তি বিপদাপদে ডুবে আছে, অথচ তাদের সংকর্মশীল হওয়া অস্বীকার করা যায় না। আবার বহু দুচরিত্র লোক আরাম আয়েশে জীবন কাটাচ্ছে যাদের কুণ্ণিত আচরণ ও তৎপরতা সম্পর্কে সবাই অবহিত। এখন কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি কি একজনের বিপদাপদ এবং আরেকজনের আরাম-আয়েশকে একবার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে যে, আল্লাহ সংকর্মশীল মানুষদের পছন্দ করেন না, দুচরিত্র ও দুকর্মশীল মানুষদের পছন্দ করেন?

৬৮. অর্থাৎ যখন দুর্ভাগ্যের দিন আসলো তখন তাদের যোগ্যতার দাবী কোন কাজে লাগলো না। তাছাড়া একথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলো

قُلْ يٰٓعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ
 اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝۱۰ وَاٰنِيْبُوْا
 اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا
 تُنصَرُوْنَ ۝۱۱ وَاَتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ
 اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝۱۲ اَنْ تَقُوْلَ
 نَفْسٌ يُّحْسِرُنِىْ عَلٰٓى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ
 السَّخِرِيْنَ ۝۱۳ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰٓنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمَتَقِيْنَ ۝۱۴

৬ রুকু'

(হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দারা^{১০} যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।^{১১} ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই। তখন কোন দিক থেকেই আর সাহায্য পাওয়া যাবে না। আর অনুসরণ করো তোমাদের রবের প্রেরিত কিতাবের সর্বোত্তম দিকগুলোর^{১২}—তোমাদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসার পূর্বেই—যে আযাব সম্পর্কে তোমরা অনবহিত থাকবে। এমন যেন না হয় যে, পরে কেউ বলবে : “আমি আল্লাহর ব্যাপারে যে অপরাধ করেছি সে জন্য আফসোস। বরং আমি তো বিদূষকারীদের মধ্যে शामिल ছিলাম।” অথবা বলবে : “কতই না ভাল হতো যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করতেন। তাহলে আমিও মুত্তাকীদের অন্তরভুক্ত থাকতাম।”

না। একথা স্পষ্ট যে তাদের এসব উপার্জন যদি যোগ্যতা ও প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণে হতো তাহলে দুর্দিন কি করে আসলো?

৬৯. অর্থাৎ রিযিকের স্বল্পতা ও প্রাচুর্য আল্লাহর আরেকটি বিধানের ওপর নির্ভরশীল। সেই বিধানের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন। রিযিকের বটন ব্যক্তির যোগ্যতা কিংবা তার প্রিয়পাত্র বা বিরাগতাজন হওয়ার ওপর আদৌ নির্ভর করে না। (এ বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাহফীমূল কুরআন, আত-তাওবা, টীকা ৫৪, ৭৫, ৮৯; ইউনুস,

টিকা ২৩; হুদ, টিকা ৩ ও ৩৩; আর রা'দ, টিকা ৪২; আল কাহাফ, টিকা ৩৭; মারয়াম, টিকা ৪৫; তা-হা, টিকা ১১৩ ও ১১৪; আল আযিয়া, টিকা ৯৯; আল মু'মিনুন, ভূমিকা এবং টিকা ১, ৪৯ ও ৫০; আশু শু'রারা, টিকা ৮১ ও ৮৪; আল কাসাস, টিকা ৯৭, ৯৮ ও ১০১; সাবা টিকা ৫৪ থেকে ৬০।

৭০. কেউ কেউ একথাটির অদ্ভুত এক ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "হে আমার বান্দারা", বলে মানুষকে সরোধন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সব মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বান্দা। প্রকৃতপক্ষে এটা এমন এক ব্যাখ্যা যাকে ব্যাখ্যা নয় বরং কুরআন মজীদে জঘন্যতম অর্থ বিকৃতি এবং আল্লাহর বাণীর সাথে তামাসা বলতে হবে। মূর্খ ভক্তদের কোন গোষ্ঠি এ বিষয়টি শুনে তো সমর্থনে মাথা নাড়তে থাকবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক হলে গোটা কুরআনই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কেননা, কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাছাড়া কুরআনের দাওয়াতই হচ্ছে, তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ছিলেন আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাকে প্রভু নয় রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তিনি নিজেও আল্লাহর দাসত্ব করবেন এবং মানুষকেও তাঁরই দাসত্বের শিক্ষা দেবেন। কোন বুদ্ধিমান মানুষের মগজে একথা কি করে আসতে পারে যে, মকায় কুরাইশ গোত্রের কাকেরদের মাঝে দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হয়তো ইঠাৎ একথা ঘোষণা করে দিয়ে থাকবেন যে, তোমরা উয্মা বা সূর্যের দাস নও, প্রকৃতপক্ষে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাস। اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ

৭১. এখানে সমস্ত মানুষকে সরোধন করা হয়েছে। শুধু ইমানদারদের সরোধন করা হয়েছে একথা বলার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই। তাছাড়া আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, গোটা মানব জাতিকে সরোধন করে একথা বলার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাওবা ও অনুশোচনা ছাড়াই সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। পরবর্তী আয়াতটিতে আল্লাহ নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, গোনাহ মাফের উপায় হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর নাখিলকৃত বাণীর অনুসরণ করা। এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে সেসব লোকের জন্য আশার বাণী বয়ে এনেছিলো যারা জাহেলী যুগে হত্যা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি এবং এ ধরনের বড় বড় গোনাহর কাজে লিপ্ত ছিল আর এসব অপরাধ যে কখনো মাফ হতে পারে সে ব্যাপারে নিরাশ ছিল। তাদের বলা হয়েছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তোমরা যা কিছুই করেছো এখনো যদি তোমাদের রবের আনুগত্যের দিকে ফিরে আস তাহলে সবকিছু মাফ হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা (রা), মুজাহিদ (র) ও ইবনে যায়দ (র) এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। (ইবনে জরীর, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী) আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা আল ফুরকান, টিকা ৮৪।

৭২. আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম দিকসমূহ অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ তা পালন করবে। তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে। এবং উপমা ও কিসসা-কাহিনীতে যা বলেছেন

أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾
 بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
 مِنَ الْكَاْفِرِينَ ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ
 وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿١٧﴾
 وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازٍ يَوْمَئِذٍ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿١٨﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٩﴾ لَهُ
 مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٠﴾



কিংবা আযাব দেখতে পেয়ে বলবে : “কতই না ভাল হতো যদি আরো একবার
 সুযোগ পেতাম তাহলে নেক আমলকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম।” (আর সে
 সময় যদি এ জওয়াব দেয়া হয়) কেন নয়, আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে
 এসেছিলো। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করেছিলে এবং গর্ব করেছিলে। আর তুমি তো
 কাকেরদের অন্তরভুক্ত ছিলে। আজ যেসব লোক আত্মাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ
 করেছে কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে তাদের মুখমণ্ডল হবে কাল। অহংকারীদের
 জন্য কি জাহান্নামে যথেষ্ট জায়গা নেই? অন্যদিকে যেসব লোক এখানে তাকওয়া
 অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আত্মাহ তাদের সাফল্যের পহা অবলম্বনের জন্যই
 নাজাত দেবেন। কোন অকল্যাণ তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখ
 ভারাক্রান্তও হবে না।

আত্মাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক।^{৭৩} যমীন ও
 আসমানের ভাঙারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। যারা আত্মাহর আয়াতসমূহের সাথে
 কুফরী করে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ
 ফিরিয়ে নেয়, নিষিদ্ধ কাজসমূহ করে এবং আত্মাহর উপদেশ বাণীর কানা কড়িও মূল্য
 দেয় না, সে আত্মাহর কিতাবের নিকৃষ্টতম দিক গ্রহণ করে। অর্থাৎ সে এমন দিক গ্রহণ
 করে যাকে আত্মাহর কিতাব নিকৃষ্টতম দিক বলে আখ্যায়িত করে।

قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ تَامُرُونِي عَبْدًا يَمَّا الْجُمُلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ
إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

৭ রুকু'

(হে নবী,) এদের বলে দাও, "হে মুখেরা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে?" (তোমার উচিত তাদের একথা স্পষ্ট বলে দেয়া। কারণ) তোমার কাছে এবং ইতিপূর্বকার সমস্ত নবীর কাছে এ অহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও তাহলে তোমার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে^{৭৪} এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। অতএব, [হে নবী, (সা)] তুমি শুধু আল্লাহরই বন্দেগী করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।

আল্লাহকে যে মর্যাদা ও মূল্য দেয়া দরকার এসব লোক তা দেয়নি।^{৭৫} (তঁার অসীম ক্ষমতার অবস্থা এই যে,) কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠির মধ্যে থাকবে আর আসমান তাঁর ডান হাতে পেঁচানো থাকবে।^{৭৬} এসব লোক যে শিরক করেছে তিনি তা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধে।^{৭৭}

৭৩. অর্থাৎ তিনি কেবল পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত কস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে, তাঁর প্রতিপালনের কারণেই বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কল্যাণেই তা কাজ করছে।

৭৪. অর্থাৎ শিরকের সাথে কৃত কোন কাজকে আমলে সালেহ বা ভাল কাজ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। আর মুশরিক থেকে যে ব্যক্তি নিজের ধারণা অনুসারে অনেক কাজকে সৎকাজ মনে করে করবে তার জন্য সে কোন পুরস্কার লাভের যোগ্য হবে না। তার গোটা জীবন পুরোপুরি লোকসানজনক কারবার হয়ে দাঁড়াবে।

৭৫. অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা কখনো একথা বুঝার চেষ্টাই করেনি যে, বিশ্ব-জাহানের প্রভুকে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَقَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ رِقِيًا يَنْظُرُونَ ۖ وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَوَقِمْتَ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। আর তৎক্ষণাত আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা সব মরে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের জীবিত রাখতে চান তারা ছাড়া। অতপর আরেকবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন ইঠাৎ সবাই জীবিত হয়ে দেখতে থাকবে^{১৬}—পৃথিবী তার রবের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা এনে হাজির করা হবে, নবী-রসূল ও সমস্ত সাক্ষীদেরও^{১৭} হাজির করা হবে। মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে ইনসাফ মত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তাদের ওপর কোন জুলুম হবে না এবং প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্ম অনুসারে পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। মানুষ যা করে আল্লাহ তা খুব ভাল করে জানেন।

আর এসব অঙ্ক লোকেরা যাদেরকে খোদায়ীর আসনের অংশীদার ও উপাস্য হওয়ার অধিকারী বানিয়ে বসে আছে তারা কত নিকৃষ্ট ও নগণ্য।

৭৬. যমীন ও আসমানে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চিত্র অংকনের জন্য যমীন হাতের মুঠিতে থাকা এবং আসমান ডান হাতে পেঁচানো থাকা রূপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন মানুষ ছোট একটি বলকে যেমন মুঠির মধ্যে পুরে নেয় এবং তার জন্য তা একটা মামুলি ব্যাপার ঠিক তেমনি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ (যারা আজ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের অনুমান করতেও অক্ষম) নিজ চোখে দেখতে পাবে যমীন ও আসমান আল্লাহর কুদরতের হাতে একটা নগণ্যতম বল ও ছোট একটি রুমালের মত। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে জারীর প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে উমর এবং হযরত আবু হুরাইরার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিশরে উঠে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা দানের সময় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন : আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে (অর্থাৎ গ্রহসমূহকে) তাঁর মুঠির মধ্যে নিয়ে এমনভাবে ঘুরাবেন—যেমন শিশুরা বল ঘুরিয়ে থাকে—এবং বলবেন : আমি একমাত্র আল্লাহ। আমি বাদশাহ। আমি সর্বশক্তিমান। আমি বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ? কোথায় শক্তিমানরা? কোথায় অহংকারীরা? এভাবে বলতে বলতে নবী (সা)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ فَمَتًى إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَحَثُوا
 أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا أَبْلَىٰ
 وَلَكِنْ حَقَّ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ
 جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝

৮ রুকু'

(এ ফায়সালার পরে) যারা কুফরী করেছিলো সেসব লোককে দলে দলে জাহান্নাম অভিযুখে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে তখন দোযখের দরজাসমূহ খোলা হবে^১ এবং তার ব্যবস্থাপক তাদেরকে বলবে : তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেন নি যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে? তারা বলবে : "হাঁ, এসেছিলো। কিন্তু আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছে।" বলা হবে, জাহান্নামের দরজার মধ্যে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য এটা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা।

এমনভাবে কীপতে থাকলেন যে, তিনি মিয়ারসহ পড়ে না যান আমাদের সে ভয় হতে লাগলো।

৭৭. অর্থাৎ কোথায় তাঁর এই বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আর কোথায় তাঁর খোদায়ীতে কারো শরীক হওয়া।

৭৮. শিংগার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাহফীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; আল কাহফ, টীকা ৭৩; ডা-হা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ, টীকা ১; আল মু'মিনুন, টীকা ৯৪; আন নামূল, টীকা ১০৬।

৭৯. এখানে শুধু দুইবার শিংগায় ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া সূরা আন নামূলে এ দু'টি ফুৎকারের অতিরিক্ত আরো একবার শিংগায় ফুৎকারের উল্লেখও আছে যা শুনে আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে (আয়াত ৮৭)। এ কারণে হাদীসসমূহে তিনবার শিংগায় ফুৎকারের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এক, "নাফখাতুল ফাযা" অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্তকারী শিংগা। দুই, "নাফখাতুস সা'ক" অর্থাৎ মৃত্যু ঘটানোর শিংগা।

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا
 وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
 خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
 نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝ ١٨ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ
 حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
 بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ١٩

আর যারা তাদের রবের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাত অভিযুখে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন দেখবে জান্নাতের দরজাসমূহ পূর্বেই খুলে দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপকরা তাদের বলবে: তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা অত্যন্ত ভাল ছিলে, চিরকালের জন্য এখানে প্রবেশ করো। আর তারা বলবে: সেই মহান আল্লাহ শুকরিয়া যিনি আমাদের সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করলেন এবং আমাদেরকে যমীনের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছেন।^{৮২} এখন জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা আমরা স্থান গ্রহণ করতে পারি।^{৮৩} সংকর্মশীলদের জন্য এটা সর্বোত্তম প্রতিদান।^{৮৪}

তুমি আরো দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারদিক বৃত্ত বানিয়ে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং ঘোষণা দেয়া হবে, সারা বিশ্ব-জাহানের রবের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।^{৮৫}

তিন, “নাফখাতুল কিয়াম লি রাবিল আলামীন” অর্থাৎ যে শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে এবং নিজের রবের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নিজ নিজ কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।

৮০. সাক্ষীসমূহ অর্থ সেসব সাক্ষীও যারা সাক্ষ দেবে যে, মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাছাড়া এর অর্থ সেসব সাক্ষীও যারা মানুষের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ দেবে। এসব সাক্ষী কেবল মানুষই হবে তা জরুরী নয়। ফেরশতা, জিন, জীব-জন্তু, মানুষের অংগ-প্রতাংগসমূহ, ঘরবাড়ী-দরজা, প্রাচীর, গাছপালা, পাথর সবকিছুই এসব সাক্ষীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮১. অর্থাৎ জাহান্নামের দরজাসমূহ পূর্বে থেকে খোলা থাকবে না। বরং তারা সেখানে পৌঁছার পরে খোলা হবে, যেমন অপরাধীদের পৌঁছার পরে জেলখানার দরজা খোলা হয় এবং তাদের প্রবেশের পরই বন্ধ করে দেয়া হয়।

৮২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাকহীমুল কুরআন, সূরা ড্বা-হা, টীকা ৮৩; আল আবিয়া, টীকা ৯৯।

৮৩. অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককে জাহান্নাত দান করা হয়েছে। এখন তা আমাদের মালিকানা এবং এখানে আমরা পুরা ক্ষমতা ও ইচ্ছাচার লাভ করেছি।

৮৪. হতে পারে, এটা জাহান্নাতবাসীদের উক্তি। আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাতবাসীদের উক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছে।

৮৫. অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-জাহান্নাত আল্লাহর প্রশংসা গেয়ে উঠবে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা হাশর

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আল হাশর

৫৯

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের **أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ** অংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'আল হাশর' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল তেমনি সূরা হাশর বনী নাজীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবাইরের দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বক্তব্য এরূপ **قُلْ سُوْرَةُ النَّصِيْرِ** অর্থাৎ এরূপ বলো যে, এটা সূরা নাজীর। মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যদের থেকেও একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার একমতাবিত্তিক বর্ণনা হলো, এ সূরাতে যেসব আহলে কিতাবের বহিষ্কারের উল্লেখ আছে তারা বনী নাজীর গোত্রেরই লোক। ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুজাহিদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরাটিই বনী নাজীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল? এ সম্পর্কে ইমাম যুহরী উরওয়া ইবনে যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম এবং বালাযুরী একে হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক মত। কারণ সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধ 'বি'রে মা'উনা'র দুঃখজনক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়টিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, 'বি'রে মা'উনা'র মর্যাদিক ঘটনা ওহদ যুদ্ধের পরে ঘটেছিল—আগে নয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝতে হলে মদীনা ও হিজায়ের ইহুদীদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। তা নাহলে নবী (সা) তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যে আচরণ করেছিলেন তার প্রকৃত কারণসমূহ কি ছিল কেউ তা সঠিকভাবে জানতে পারবে না।

আরবের ইহুদীদের নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস দুনিয়ায় নেই। তারা নিজেরাও পুস্তক বা শিলালিপি আকারে এমন কোন লিখিত বিষয় রেখে যায়নি যা তাদের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করতে পারে। তাছাড়া আরবের বাইরের ইহুদী ঐতিহাসিক কিংবা লেখকগণও তাদের কোন উল্লেখ করেননি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, আরব উপদ্বীপে এসে তারা তাদের স্বজাতির অন্য সব জাতি-গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই দুনিয়ার ইহুদীরা তাদেরকে স্বজাতীয় লোক বলে মনেই করতো না। কারণ তারা ইহুদী সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা, এমনকি নাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করে আরবী ভাষাধারা গ্রহণ করেছিল। হিজায়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির মধ্যে যেসব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তাতে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ইহুদীদের কোন নাম নিশানা বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতে শুধুমাত্র কয়েকজন ইহুদীর নাম পাওয়া যায়। এ কারণে আরব ইহুদীদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ আরবদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনার ওপরে নির্ভরশীল। এরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদীদের নিজেদেরই প্রচারিত।

হিজায়ের ইহুদীরা দাবী করতো যে, তারা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের জীবনকালের শেষদিকে সর্বপ্রথম এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এই কাহিনী বর্ণনা করে তারা বলতো, হযরত মুসা (আ) আমালেকাদের বহিকারের উদ্দেশ্যে তাঁর একটি সেনাদলকে ইয়াসরিব অঞ্চল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঐ জাতির কোন ব্যক্তিকেই যেন জীবিত রাখা না হয়। বনী ইসরাঈলদের এই সেনাদল নবীর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করল। তবে, আমালেকাদের বাদশার একটি সুদর্শন যুবক ছেলে ছিল। তারা তাকে হত্যা করল না। বরং সাথে নিয়ে ফিলিস্তিনে ফিরে গেল। এর পূর্বেই হযরত মুসা (আ) ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ এতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারা বললেন : একজন আমালেকীকেও জীবিত রাখা নবীর নির্দেশ এবং মুসার শরীয়াতের বিধি-বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই তারা উক্ত সেনাদলকে তাঁদের জামায়াত থেকে বহিকার করে। বাধ্য হয়ে দলটিকে ইয়াসরিবে ফিরে এসে এখানেই বসবাস করতে হয়। (কিতাবুল আগানী, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪) এভাবে ইহুদীরা যেন দাবী করছিল যে, খৃস্টপূর্ব ১২শ' বছর পূর্বে থেকেই তারা এখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবত এ কাহিনী তারা এ জন্য গড়ে নিয়েছিল যাতে আরবের অধিবাসীদের কাছে তারা নিজেদের সুপ্রাচীন ও অভিজাত হওয়া প্রমাণ করতে পারে।

ইহুদীদের নিজেদের বর্ণনা অনুসারে খৃস্টপূর্ব ৫৮৭ সনে বাবুভিটা ত্যাগ করে আরেকবার এদেশে তাদের আগমন ঘটেছিল। এই সময় বাবেলের বাদশাহ 'বখতে নাস্সার' বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে ইহুদীদেরকে সারা পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। আরবের ইহুদীরা বলতো, সেই সময় আমাদের কিছু সংখ্যক গোত্র এসে ওয়াদিউল কুরা, তায়মা এবং ইয়াসরিবে বসতি স্থাপন করেছিল। (ফুতুহুল বুলদান, আল বালায়ুরী) কিন্তু এর পেছনেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অসম্ভব নয় যে, এর মাধ্যমেও তারা তাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রমাণিত তা হলো, ৭০ খৃস্টাব্দে রোমানরা যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের ওপর গণহত্যা চালায় এবং ১৩২ খৃস্টাব্দে এই ভূখণ্ড থেকে তাদের

সম্পূর্ণরূপে বহিকার করে সেই সময় বহু সংখ্যক ইহুদী গোত্র পালিয়ে হিজায়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। কেননা, এই এলাকা ছিল ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল সংলগ্ন। এখানে এসে তারা যেখানেই ঝর্ণা ও শ্যামল উর্বর স্থান পেয়েছে সেখানেই বসতি গড়ে তুলেছে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্র ও সুদী কারবারের মাধ্যমে সেসব এলাকা কৃষ্ণিগত করে ফেলেছে। আয়লা, সাকনা, তাবুক, তায়মা, ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক এবং খায়বরের ওপরে এই সময়েই তাদের আধিপত্য কায়েম হয়েছিলো। বনী কুরাইযা, বনী নাযীর, বনী বাহদাল এবং বনী কায়নুকাও এ সময়ই আসে এবং ইয়াসরিবের ওপর আধিপত্য কায়েম করে।

ইয়াসরিবে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তারা ইহুদী পুরোহিত (Cohens বা Priests) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহুদীদের মধ্যে তাদের অভিজাত বলে মান্য করা হতো এবং স্বজাতির মধ্যে তারা ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। এরা যে সময় মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করে তখন কিছু সংখ্যক আরব গোত্রও এখানে বসবাস করতো। ইহুদীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কার্যত শস্য-শ্যামল উর্বর এই ভূখণ্ডের মানিক মোখতার হয়ে বসে। এর প্রায় তিন শ' বছর পরে ৪৫০ অথবা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ইয়ামানে সেই মহাপ্রাবন আসে সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকু'তে যার আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রাবনের কারণে সাবা কওমের বিভিন্ন গোত্র ইয়ামান ছেড়ে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এদের মধ্য থেকে গাসসানীরা সিরিয়ায়, লাখামীরা হীরায় (ইরাক), বনী খুযা'আ জিদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকায় এবং আওস ও খায়রাজ ইয়াসরিবে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ইহুদীরা যেহেতু আগে থেকেই ইয়াসরিবের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। তাই প্রথম প্রথম তারা আওস ও খায়রাজ গোত্রকে কর্তৃত্ব চালানোর কোন সুযোগ দেয়নি। তাই এ দু'টি আরব গোত্র অনূর্বর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয় যেখানে জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণও তারা খুব কষ্টে সংগ্রহ করতে পারতো। অবশেষে তাদের একজন নেতা তাদের স্বগোষ্ঠীয় গাসসানী ভাইদের সাহায্য প্রার্থনা করতে সিরিয়া গমন করে এবং সেখান থেকে একটি সেনাদল এনে ইহুদীদের শক্তি চূর্ণ করে দেয়। এভাবে আওস ও খায়রাজ ইয়াসরিবের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করে এবং ইহুদীদের দু'টি বড় গোত্র বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা শহরের বাইরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় আরেকটি ইহুদী গোত্র বনী কায়নুকার যেহেতু বনু কুরাইযা ও বনু নাজীর গোত্রের সাথে তিক্ত সম্পর্ক ছিল তাই তারা শহরের ভেতরেই থেকে যায়। তবে এখানে থাকার জন্য তাদেরকে খায়রাজ গোত্রের নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়া গ্রহণ করতে হয়। এর বিরুদ্ধে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা গোত্রকে আওস গোত্রের নিরাপত্তামূলক আশ্রয় নিতে হয় যাতে তারা নিরাপদে ইয়াসরিবের আশেপাশে বসবাস করতে পারে। নীচের মানচিত্র দেখলে স্পষ্ট বুঝা যাবে, এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে ইয়াসরিব এবং তার আশেপাশে কোথায় কোথায় ইহুদী বসতি ছিল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে হিজরাতের সূচনাকাল পর্যন্ত সাধারণভাবে গোটা হিজায়ের এবং বিশেষভাবে ইয়াসরিবে ইহুদীদের অবস্থা ও পরিচয় মোটামুটি এরূপ ছিল :

ভাষা, শোশাক-পরিচ্ছদ, তাহযীব, তামাদুন সবদিক দিয়ে তারা আরবী ভাবধারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। এমনকি তাদের অধিকাংশের নামও হয়ে গিয়েছিল আরবী। হিজায়ে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্র ছিল বারটি। তাদের মধ্যে একমাত্র বনী যা'মুয়া ছাড়া আর কোন গোত্রেরই হিব্রু নাম ছিল না। হাতেগোনা কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছাড়া তাদের কেউ-ই হিব্রু ভাষা জানত না। জাহেলী যুগের ইহুদী কবিদের যে কাব্যগাঁথা আমরা দেখতে পাই তার ভাষা, ধ্যান-ধারণা ও বিষয়বস্তুতে আরব কবিদের থেকে স্বতন্ত্র এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা তাদেরকে আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। তাদের ও আরবদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের ও সাধারণ আরবদের মধ্যে ধর্ম ছাড়া আর কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা আরবদের মধ্যে একেবারে বিলীনও হয়ে যায়নি। তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেদের ইহুদী জাত্যাভিমান ও পরিচয় টিকিয়ে রেখেছিল। তারা বাহ্যত আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল শুধু এ জন্য যে, তাছাড়া তাদের পক্ষে আরবে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। আরবী ভাবধারা গ্রহণ করার কারণে পাচাত্যের প্রাচ্যবিদরা তাদের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে নিয়েছে যে, তারা মূলত বনী ইসরাঈল নয়, বরং ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী আরব কিংবা তাদের অধিকাংশ অন্তত আরব ইহুদী। ইহুদীরা হিজায়ে কখনো ধর্ম প্রচারের কাজ করেছিল অথবা তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ খৃষ্টান পাদ্রী এবং মিশনারীদের মত আরববাসীদের ইহুদী ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতো এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে ইসরাঈলিয়াত বা ইহুদীবাদের চরম গোঁড়ামি এবং বংশীয় আভিজাত্যের গর্ব ও অহংকার ছিল। আরবের অধিবাসীদের তারা 'উম্মী' (Gentiles) বলে আখ্যায়িত করত যার অর্থ শুধু নিরক্ষরই নয়, বরং অসভ্য এবং মূর্থও। তারা বিশ্বাস করত, ইসরাঈলীরা যে মানবাধিকার ভোগ করে এরা সে অধিকার লাভেরও উপযুক্ত নয়। বৈধ ও অবৈধ সব রকম পন্থায় তাদের অর্থ-সম্পদ মেরে খাওয়া ইসরাঈলীদের জন্য হালাল ও পবিত্র। নেতৃ পর্ষদের লোক ছাড়া সাধারণ আরবদের তারা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে সমান মর্যাদা দেয়ার উপযুক্তই মনে করত না। কোন আরব গোত্র বা বড় কোন আরব পরিবার ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরব লোকগাথায় তার কোন ইদিসও মেলে না। এমনিতেও ইহুদীদের ধর্মপ্রচারের চেয়ে নিজেদের আর্থিক কায়-কারবারের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল অধিক। তাই একটি ধর্ম হিসেবে হিজায়ে ইহুদীবাদের বিস্তার ঘটেনি। বরং তা হয়েছিল কয়েকটি ইহুদী গোত্রের গর্ব ও অহংকারের পুঞ্জি। তবে ইহুদী ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাবীজ-কবচ, ভাল-মন্দ লক্ষণ নির্ণয় এবং যাদুবিদ্যার রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর এ কারণে আরব সমাজে তাদের 'ইলম' ও 'আমল'ের খ্যাতি ও প্রতাপ বিদ্যমান ছিল।

আরব গোত্রসমূহের তুলনায় তাদের আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান ছিল অধিক মজবুত। তারা যেহেতু ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার অধিক সুসভ্য অঞ্চল থেকে এসেছিল তাই এমন অনেক শিল্প ও কারিগরী তারা জানতো যা আরবের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া বাইরের জগতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। এসব কারণে ইয়াসরিব এবং হিজায়ের উত্তরাঞ্চলে খাদ্যশস্যের আমদানী আঃ এখান থেকে খেজুর রক্তানীর কারবার তাদের হাতে চলে এসেছিল। হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য শিকারেরও বেশীর ভাগ তাদেরই করায়ত্ত ছিল। বস্ত্র উৎপাদনের কাজও তারাই করত। তারাই আবার জায়গায়

জায়গায় পানশালা নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব জায়গা থেকে মদ এনে বিক্রি করা হতো। বনু কায়নুকা গোত্রের অধিকাংশ লোক স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র নির্মাণ পেশায় নিয়োজিত ছিল। এসব কায়কারবারে ইহুদীরা অস্বাভাবিক মুনাফা লুটতো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় কারবার ছিল সুদী কারবার। আশেপাশের সমস্ত আরবদের তারা এই সুদী কারবারের ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। বিশেষ করে আরব গোত্রসমূহের নেতা ও সরদাররা বেশী করে এই জালে জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ঋণগ্রহণ করে জীকজমকে চলা এবং গবিত ভক্তিতে জীবনযাপন করার রোগ সবসময়ই তাদের ছিল। এরা অত্যন্ত চড়া হারের সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতো এবং তা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকত। কেউ একবার এই জালে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। এভাবে তারা আর্থিক দিক দিয়ে আরবদেরকে অন্তসারশূন্য করে ফেলেছিল। তবে তার স্বাভাবিক ফলাফলও দাঁড়িয়েছিল এই যে, তাদের বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল।

—আরবদের মধ্যে কারো বন্ধু হয়ে অন্য কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি না করা এবং পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ না করাই ছিল তাদের ব্যবসায়িক ও আর্থিক স্বার্থের অনুকূলে। কিন্তু অন্যদিকে আবার আরবদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়া এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখাই ছিল তাদের স্বার্থের অনুকূলে। কারণ, তারা জানতো, আরব গোত্রসমূহ যখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে তখন আর তারা সেই সব সহায়-সম্পত্তি, বাগান এবং শস্য-শ্যামল ফসলের মাঠ তাদের অধিকারে থাকতে দেবে না, যা তারা সুদী কারবার ও মুনাফাখোরীর মাধ্যমে লাভ করেছে। তাছাড়া নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের প্রতিটি গোত্রকে কোন না কোন শক্তিশালী আরব গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হতো যাতে অন্য কোন শক্তিশালী গোত্র তাদের গায়ে হাত তুলতে না পারে। এ কারণে আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক ঋগড়া-বিবাদে তাদেরকে বারবার শুধু জড়িয়ে পড়তেই হতো না, বরং অনেক সময় একটি ইহুদী গোত্রকে তার মিত্র আরব গোত্রের সাথে মিলে অপর কোন ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হতো, বিরোধী আরব গোত্রের সাথে যাদের থাকতো মিত্রতার সম্পর্ক। ইয়াসরিবে বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর ছিল আওস গোত্রের এবং বনী কায়নুকা ছিল খায়রাজ গোত্রের মিত্র। হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে 'বু'আস' নামক স্থানে আওস ও খায়রাজ গোত্রের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল তাতে এই ইহুদী গোত্রগুলোও নিজ নিজ বন্ধু গোত্রের পক্ষ নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে মদীনায় ইসলাম পৌছে এবং শেষ পর্যন্ত রসুলুল্লাহর (সা) আগমনের পর সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার সাথে সাথে তিনি প্রথম যে কাজগুলো করলেন তার মধ্যে একটি হলো আওস, খায়রাজ এবং মুহাজিরদের মধ্যে একটি ভাতৃবন্ধন সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় কাজটি হলো, এই মুসলিম সমাজ এবং ইহুদীদের মধ্যে স্পষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করা। এ চুক্তিতে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, একে অপরের অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ করবে না এবং বাইরের শত্রুর মোকাবিলায় সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ইহুদী এবং মুসলমানরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মেনে চলবে এই চুক্তি থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। চুক্তির কতকগুলো বিষয় নিম্নরূপ :

ان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم - وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة - وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم - وانه لم يثم امرؤ يحليفه ، وان النصر للمظلوم ، وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساد فساد فان مرده الى الله عزوجل والى محمد رسول الله وانه لاتجار قريش ولا من نصرها ، وان بينهم والنصر على من دهم يثرب - على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم -

(ابن هشام - ج ٢ - ص ١٤٧ - ١٥٠)

ইয়াহুদীরা নিজেদের ব্যয় বহন করবে এবং মুসলমানরাও নিজেদের ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তির পক্ষসমূহের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে তারা একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক হবে কল্যাণ করা ও অধিকার পৌছিয়ে দেয়ার সম্পর্কে গোনাহ ও সীমাংঘনের সম্পর্ক নয়।

কেউ তার মিত্রশক্তির সাথে কোনপ্রকার খারাপ আচরণ করবে না।

মজলুম ও নির্যাতিতদের সাহায্য করা হবে।

যতদিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে মিলিতভাবে তার ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তরে কোনপ্রকার ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

এই চুক্তির শরীক পক্ষগুলোর মধ্যে যদি এমন কোন ঝগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় যার কারণে বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে তাহলে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বিধান অনুসারে তার মীমাংসা করবেন।

কুরাইশ এবং তাদের মিত্র ও সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেয়া হবে না।

কেউ ইয়াসরিবের ওপর আক্রমণ করলে চুক্তির শরীকগণ তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে। প্রত্যেকপক্ষ নিজ নিজ এলাকার প্রতিরক্ষার দায়-দায়িত্ব বহন করবে। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে ১৫০ পর্যন্ত)

এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় চূড়ান্ত চুক্তি। ইহুদীরা নিজেরাই এর শর্তাবলী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করতে শুরু করল। তাদের এই শত্রুতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। এর বড় বড় কারণ ছিল তিনটি :

এক : তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাতির একজন নেতা হিসেবে দেখতে আগ্রহী ছিল যিনি তাদের সাথে শুধু একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবেন এবং নিজের দলের পার্থিব স্বার্থের সাথে কেবল তার সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু তারা দেখলো, তিনি আল্লাহ, আখেরাত, রিসালাত এবং কিতাবের প্রতিও ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন (যার মধ্যে তাদের নিজেদের রসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও অন্তর্ভুক্ত) এবং গোনাহর কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং নৈতিক সীমা ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে আহ্বান জানাচ্ছেন, খোদ তাদের নবী-রসূলগণ দুনিয়ার মানুষকে যে আহ্বান জানাতেন। এসব ছিল তাদের কাছে অপছন্দনীয়। তারা আশংকাবোধ করলো, যদি এই বিশ্বজনীন আদর্শিক আন্দোলন চলতেই থাকে তাহলে তার সয়লাবের মুখে তাদের স্থূল ও অচল ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন এবং বংশ ও গোষ্ঠীগত জাতীয়তা ঝড়কুটোর মত ভেসে যাবে।

দুই : আওস, খায়রাজ এবং মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখে এবং আশেপাশের আরব গোত্রসমূহের যারাই ইসলামের এই আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে তারা ইমদীনার এই ইসলামী ভাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে তারা এই ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠলো যে, নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের খাতিরে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বার্থোদ্ধার করার যে নীতি তারা শত শত বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে নতুন এই ব্যবস্থাপনায় তা আর চলবে না, বরং এখন তাদেরকে আরবের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। যেখানে এই অপকৌশল আর সফল হবে না।

তিন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজ ও সভ্যতার যে সংস্কার করছিলেন তাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকম অবৈধ পথ ও পন্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাপার হলো, সুদভিত্তিক কারবারকেও তিনি নাপাক উপার্জন এবং হারাম খাওয়া" বলে ঘোষণা করছিলেন। এ কারণে তারা আশংকা করছিল যে, আরব জনগণের ওপর যদি তাঁর শাসন কর্তৃত্ব কায়ম হয় তাহলে তিনি আইনগতভাবে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন। একে তারা নিজেদের মৃত্যুর শামিল বলে মনে করছিল।

এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করা তারা নিজেদের জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছিল। তাঁকে আঘাত দেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন অপকৌশল, ষড়যন্ত্র ও উপায় অবলম্বন করতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হতো না। সাধারণ

মানুষ যাতে তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে সে জন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা প্রচারণা চালাতো। ইসলাম গ্রহণকারীদের মনে সব রকমের সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতো। যাতে তারা এ ধ্বনির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যত বেশী পারা যায় ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য নিজেরাও মিথ্যামিথি ইসলাম গ্রহণ করতো এবং তারপর আবার মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগী হয়ে যেতো। অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য মুনাফিকদের সাথে গাঁটছড়া বঁধতো। ইসলামের শত্রু প্রতিটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতো। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং তাদেরকে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত করানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতো। তাদের বিশেষ লক্ষ ছিল আওস ও খযরাজ গোত্রের লোকজন। দীর্ঘদিন যাবত এ দু'টি গোত্রের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল। অগ্রাসঙ্গিকভাবে বারবার 'বু'আস' যুদ্ধের আলোচনা তুলে তাদেরকে পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। যাতে আরেকবার তাদের মধ্যে তরবারির ঝনঝনানি শুরু হয়ে যায় এবং ইসলাম তাদেরকে যে ভাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলো তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানদের আর্থিক দিক থেকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করার জন্যও তারা নানারূপ জালিয়াতি করতো। যাদের সাথে আগে থেকেই তাদের লেনদেন ছিল তাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতো তারা তার ক্ষতিসাধন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতো। তার কাছে যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তাকে উত্যক্ত ও বিব্রত করে তুলতো। তবে তার যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তা আত্মসাৎ করতো। তারা প্রকাশ্যে বলতো : আমরা তোমার সাথে যখন লেনদেন ও কারবার করেছিলাম তখন তোমার ধর্ম ছিল অন্যাকিছু। এখন যেহেতু তুমি তোমার ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলেছো তাই আমাদের কাছে তোমার কোন অধিকারই আর অবশিষ্ট নেই। তাক্বীমীয়ে তাবারী, তাক্বীমীয়ে নায়শাবুরী, তাক্বীমীয়ে তাবরাসী এবং তাক্বীমীয়ে রুহুল মায়ানীতে সূরা আলে ইমরানের ৭৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এর বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

চুক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এই শত্রুতামূলক আচরণ তারা বদর যুদ্ধের আগে থেকেই করতে শুধু করেছিলো। কিন্তু বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ কুরাইশদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করলে তারা অস্থির হয়ে ওঠে এবং তাদের হিসো ও বিদ্রোহের আগুন আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত হয়। তারা আশা করেছিলো, এই যুদ্ধে কুরাইশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইতে গিয়ে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলামের এই বিজয়ের খবর পৌঁছার পূর্বেই তারা মদীনায় গুজব ছড়াতে শুরু করেছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গিয়েছেন, মুসলমানদের চরম পরাজয় ঘটেছে এবং আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী মদীনার দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু ফলাফল তাদের আশা আকাংক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত হলে তারা রাগে ও দুঃখে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। বনী নাজীর গোত্রের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ চিংকার করে বলতে শুরু করলোঃ খোদার শপথ, মুহাম্মাদ যদি আরবের এসব সম্মানিত নেতাদের হত্যা করে থাকে তাহলে পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগই আমাদের জন্য অধিক উত্তম। এরপর সে মক্কায় গিয়ে হাজির হলো এবং বদর যুদ্ধে যেসব কুরাইশ নেতা নিহত হয়েছিলো তাদের নামে অত্যন্ত উত্তেজনারকর শোকগীতা গুনিয়ে গুনিয়ে মক্কাবাসীদের

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করতে থাকলো। এরপর সে মদীনায ফিরে আসলো এবং নিজের মনের ঝাল মিটানোর জন্য এমন সব কবিতা ও গান গেয়ে শুনাতে শুরু করলো যাতে সম্মানিত মুসলমানদের স্ত্রী-কন্যাদের সাথে প্রেম নিবেদন করা এবং প্রেম সম্পর্কের কথা উল্লেখ থাকতো। তার এই ঠক্কতা ও বখাটেপনায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত নবী (সা) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আনসারীকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করাতে বাধ্য হলেন। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

বদর যুদ্ধের পর ইহুদীদের যে গোত্রটি সমষ্টিগতভাবে সর্বপ্রথম খোলাখুলি চুক্তিভংগ করেছিল সেটি ছিল বনু কায়নুকা গোত্র। এরা মদীনার শহরাত্তরে একটি মহল্লায় বাস করতো। যেহেতু তারা স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র প্রস্তুতকারী ছিল, তাই মদীনাবাসীদের তাদের বাজারে বেশী বেশী যাতায়াত করতে হতো। নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতা নিয়ে তারা গর্ববোধ করতো। কর্মকার হওয়ার কারণে তাদের প্রতিটি বাচ্চা পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যে ছিল সাত শত যুদ্ধোপযোগী পুরুষ। খায়রাজ গোত্রের সাথে তাদের পুরনো মিত্রতা সম্পর্ক ছিল। আর খায়রাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে 'উবাই ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক। এ কারণেও তাদের অহমিকা ছিল। বদর যুদ্ধের ঘটনায় তারা এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তারা তাদের বাজারে যাতায়াতকারী মুসলমানদের বিব্রত করা ও কষ্ট দেয়া এবং বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের উদ্ভক্ত করতে শুরু করেছিলো। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, তাদের বাজারে একদিন একজন মুসলমান মহিলাকে সবার সামনে উলঙ্গ করে ফেলা হলে তা নিয়ে মারাত্মক ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং হাংগামায় একজন মুসলমান এবং একজন ইহুদী নিহত হয়। পরিস্থিতি এতদূর গড়ালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মহল্লায় গেলেন এবং তাদের সবাইকে ডেকে একত্রিত করে ন্যায় ও সত্যতার পথ অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রত্যন্তরে তারা বললো : “মুহাম্মাদ, সম্ভবত তুমি আমাদেরকেও কুরাইশ মনে করেছো? যুদ্ধবিদ্যায় তারা ছিল অনভিজ্ঞ। তাই তুমি তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছো। কিন্তু আমাদের সাথে পালা পড়লে জানতে পারবে পুরুষলোক কাকে বলে।” এটা ছিল স্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। অবশেষে নবী (সা) দুই হিজরীর শাওয়াল (অপর এক বর্ণনা অনুসারে যিলকা'দা) মাসের শেষ দিকে তাদের মহল্লা অবরোধ করলেন। মাত্র পনের দিন অবরোধ চলার পরই তারা আত্মসমর্পণ করলো এবং তাদের যুদ্ধক্ষম সমস্ত ব্যক্তিকে বন্দী করা হলো। এই সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের সাহায্য সমর্থনে এগিয়ে আসলো। নবী (সা) যেন তাদের ক্ষমা করে দেন এ জন্য সে বারবার অনুরোধ উপরোধ করতে থাকলো। নবী (সা) তার আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, বনু কায়নুকা তাদের অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র এবং শিল্প-সরঞ্জাম রেখে মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

এ দু'টি চরম পদক্ষেপ (অর্থাৎ বন্দী কায়নুকাদের বহিকার এবং কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা) গ্রহণ করার ফলে কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদীরা এতটা ভীত সন্ত্রস্ত রইলো যে, আর কোন দুর্কর্ম করার সাহস তাদের হলো না। কিন্তু হিজরী ৩য় সনের শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রতুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসলে ইহুদীরা দেখলো, কুরাইশদের তিন হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় মাত্র এক হাজার

লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকেও তিন শত মুনাফিক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছে। তখন তারা প্রথমবারের মত স্পষ্টভাবে চুক্তিলঙ্ঘন করে বসলো। অর্থাৎ মদীনার প্রতিরক্ষায় তারা নবীর (সা) সাথে শরীক হলো না। অথচ চুক্তি অনুসারে তারা তা করতে বাধ্য ছিল। এরপর উহদ যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। এমন কি রসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করার জন্য বনী নাজীর গোত্র একটি সুপ্রিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে বসলো। কিন্তু ঠিক বাস্তবায়নের মুখে তা বানচাল হয়ে গেল। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো, বিরে মা'য়ুনা'র মর্যাদাসিক ঘটনার (৪র্থ হিজরীর সফর মাস) পর আমর ইবনে উমাইয়া দামরী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভুলক্রমে বনী আমের গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো চুক্তিবদ্ধ গোত্রের লোক। 'আমর তাদেরকে শত্রু গোত্রের লোক মনে করেছিল। এ ভুলের কারণে মুসলমানদের জন্য তাদের রক্তপণ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর বনী আমের গোত্রের সাথে চুক্তিতে যেহেতু বনী নাজীর গোত্রও শরীক ছিল, তাই রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদেরকে শরীক হওয়ার আহবান জানাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে নিজে তাদের এলাকায় গেলেন। সেখানে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু খোশগন্ধে ব্যস্ত রেখে ষড়যন্ত্র আঁটলো যে, তিনি যে ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসেছিলেন এক ব্যক্তি তার ছাদ থেকে তাঁর ওপর একখানা ভারী পাথর গড়িয়ে দেবে। কিন্তু তারা এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার আগেই আল্লাহ তা'আলা যথা সময়ে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদীনায় ফিরে গেলেন।

এরপর তাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিলম্বে তাদেরকে চরমপত্র দিলেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে তা আমি জানতে পেরেছি। অতএব দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাও। এ সময়ের পরেও যদি তোমরা এখানে অবস্থান করো তাহলে তোমাদের জনপদে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে খবর পাঠালো যে, আমি দুই হাজার লোক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। তাছাড়া বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তাই তোমরা রুখে দাঁড়াও, নিজেদের জায়গা পরিত্যাগ করো না। এ মিথ্যা আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমপত্রের জবাবে তারা জানিয়ে দিল যে, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন। এতে ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবরোধ করলেন। অবরোধের মাত্র ক'দিন পরই (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র ছয় দিন এবং কোন কোন বর্ণনা অনুসারে পনের দিন) তারা এই শর্তে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলো যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য সব জিনিস নিজেদের উটের পিঠে চাপিয়ে যতটা সম্ভব নিয়ে যাবে। এভাবে ইহুদীদের দ্বিতীয় এই পাপী গোত্র থেকে মদীনাকে মুক্ত করা হলো। তাদের মধ্য থেকে মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল এবং অন্যরা সবাই সিরিয়া ও খায়বার এলাকার দিকে চলে গেল।

এ ঘটনা সম্পর্কেই এ সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনী নায়ীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। এতে মোটামুটি চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

(১) প্রথম চারটি আয়াতে গোটা দুনিয়াবাসীকে সেই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বনী নায়ীর গোত্র সবেমাত্র যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। একটি বৃহত গোত্র যার জনসংখ্যা সে সময় মুসলমানদের জনসংখ্যার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। অর্থ-সম্পদে যারা মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর ছিল, যাদের কাছে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না এবং যাদের দুর্গসমূহও ছিল অত্যন্ত মজবুত, মাত্র কয়েকদিনের অবরোধের মুখে তারা টিকে থাকতে পারলো না এবং কোন একজন মানুষ নিহত হওয়ার মত পরিস্থিতিরও উদ্ভব হলো না। তারা শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা তাদের আপন জনপদ ছেড়ে দেশান্তরিত হতে রাজি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটা মুসলমানদের শক্তির দাপটে হয়নি। বরং তারা যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এটা ছিল তার প্রত্যক্ষ ফল। আর যারা আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায় তারা এ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়।

(২) ৫নং আয়াতে যুদ্ধের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। নীতিটি হলো, শত্রুদের এলাকার অভ্যন্তরে সামরিক প্রয়োজনে যে ধংসাত্মক কাজকর্ম করতে হয় তা ফাসাদ ফিল আরদ অর্থাৎ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির সমার্থক নয়।

(৩) যুদ্ধ বা সন্ধির ফলে যেসব ভূমি ও সম্পদ ইসলামী সরকারের হস্তগত হয় তার বন্দোবস্ত কিভাবে করতে হবে ৬ থেকে ১০নং আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ সময়ই প্রথমবারের মত একটি বিজিত অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে এসেছিলো, সে জন্য এখানে তার আইন-বিধান বলে দেয়া হয়েছে।

(৪) বনী নায়ীর যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে আচরণ ও নীতিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল ১১ থেকে ১৭ আয়াতে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের এই আচরণ ও নীতিভঙ্গির মূলে যেসব কারণ কার্যকর ছিল তাও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

(৫) শেষ রুকূ'র পুরোটাই উপদেশবাণী। ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে शामिल হলেও যাদের মধ্যে ঈমানের প্রাণসত্তা নেই তাদের লক্ষ করেই এই উপদেশবাণী। এতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, ঈমানের মূল দাবী কি, তাকওয়া ও পাপাচারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি, যে কুরআনকে মানার দাবী তারা করছে তার গুরুত্ব কতটুকু এবং যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার স্বীকৃতি তারা দিচ্ছে সেই আল্লাহ কি কি গুণাবলীর অধিকারী?

আয়াত ২৪

সূরা আল হাশর-মানী

রুক' ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①
 هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۖ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ
 حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي
 قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۖ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ②
 فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ③

আল্লাহরই তাসবীহ করেছে আসমান ও যমীনের প্রতিটি জিনিস। তিনিই বিজয়ী এবং মহাজ্ঞানী।^১

তিনিই আহলেকিতাব কাফেরদেরকে প্রথম আক্রমণেই তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন।^২ তোমরা কখনো ধারণাও কর নাই যে, তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করে বসেছিলো যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।^৩ কিন্তু আল্লাহ এমন এক দিক থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন, যে দিকের ধারণাও তারা করতে পারেনি।^৪ তিনি তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, তারা নিজ হাতেও নিজেদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করছিলো এবং মু'মিনদের হাত দিয়েও ধ্বংস করছিলো।^৫ অতএব, হে দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা,^৬ শিক্ষাগ্রহণ করো।

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাক্বীমুল কুরআন সূরা হাশীদের তাক্বীমের ১ ও ২নং টীকা। বনী নাজীরের বহিষ্কার সম্পর্কে বিশ্লেষণ শুরু করার আগে এই প্রারম্ভিক কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো মন-মগজকে এ সত্য উপলব্ধি করতে প্রস্তুত করা যে, এই শক্তিশালী

ইহুদী গোত্রের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা মুসলমানদের শক্তির কারণে নয়, বরং আল্লাহর অসীম শক্তির বিষয়ক কীর্তি মাত্র।

২. মূল শব্দ হলো **لَوْلَ الْحَشْر**। হাশর (حشر) শব্দের অর্থ বিক্ষিপ্ত জনতাকে একত্র করা অথবা ইতস্তত ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তিদের একত্রিত করে বের হওয়া। আর **لَوْلَ الْحَشْر** -এর অর্থ হলো, প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সাথে অথবা প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সময়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এখানে প্রথম হাশর বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদলের মতে এর অর্থ মদীনা থেকে বনী নাজীরের বহিষ্কার। একে প্রথম হাশর এই অর্থে বলা হয়েছে যে, তাদের দ্বিতীয় হাশর হয়েছিলো ইয়রত 'উমরের (রা) সময়ে। এই সময় ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আর তাদের শেষ হাশর হবে কিয়ামতের দিন। দ্বিতীয় দলের মতে এর অর্থ হলো মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশের ঘটনা যা বনী নাজীর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য করা হয়েছিল সূতরাং **لَوْلَ الْحَشْر** -এর অর্থ হলো, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলমানরা সবেমাত্র একত্রিত হয়েছিলো। লড়াই ও রক্তপাতের কোন অবকাশই সৃষ্টি হয়নি। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তা'আলার কুদরাতে তারা দেশান্তরিত হতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। অন্য কথায় এখানে এ বাক্যাংশটি আক্রমণের "প্রথম চোটে" বা "প্রথম আঘাতে" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাহ ওয়াসী উল্লাহ দেহলবী এর অনুবাদ করেছেন : **در اول جمع كردن لشكر**। শাহ আবদুল কাদের সাহেবের অনুবাদ হলো : **يها هي بهير موت**। আমাদের মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই এ আয়াতংশের সঠিক ও বোধগম্য অর্থ।

৩. এখানে প্রথমেই একটি বিষয় বুঝে নেয়া উচিত, যাতে বনী নাজীরের বহিষ্কারের ব্যাপারে কোন মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী নাজীর গোত্রের যথারীতি একটি লিখিত চুক্তি ছিল। এ চুক্তিকে তারা বাতিলও করেছিলো না যে, তার কোন অস্তিত্ব নেই মনে করা চলে। তবে যে কারণে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল তা হলো, এই চুক্তি লংঘনের অনেকগুলো ছোট বড় কাজ করার পর তারা এমন একটি কাজ করে বসেছিল যা সুস্পষ্টভাবে চুক্তিভংগেরই নামান্তর। অর্থাৎ তারা চুক্তির অপর পক্ষ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর তাও এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, সে জন্য তাদেরকে চুক্তিভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে তারা তা অস্বীকার করতে পারেনি। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশদিন সময় দিয়ে এই মর্মে চরমপত্র দিলেন যে, এই সময়ের মধ্যেই তোমরা মদীনা ছেড়ে চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। এই চরমপত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে কুরআন মজীদে নির্দেশ অনুসারে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে : "যদি তোমরা কোন কণ্ঠের পক্ষ থেকে বিশ্বাসভংগের (চুক্তিভংগের) আশংকা কর তাহলে সেই চুক্তি প্রকাশ্যে তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।" (সূরা আল আনফাল—৫৮) এ কারণে তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, তা ছিল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক। যেন তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ বহিষ্কার করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলা নিজে বহিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয় যে কারণটির জন্য তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই কাজ বলে ঘোষণা করেছেন তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

৪. একথাটি বুঝার জন্য মনে রাখা দরকার যে, বনী নায়ীর শত শত বছর ধরে এখানে প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে বসবাস করে আসছিল। মদীনার বাইরে তাদের গোটা জনবসতি একই সাথে ছিল। নিজের গোত্রের লোকজন ছাড়া আর কোন গোত্রের লোকজন তাদের মধ্যে ছিল না। গোটা বসতি এলাকাকে তারা একটি দুর্গে রূপান্তরিত করেছিল। সাধারণত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন উপজাতীয় এ এলাকায় ঘর-বাড়ী যেভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে তাদের ঘর-বাড়ীও ঠিক তেমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। এগুলো ছিল ছোট ছোট দুর্গের মত। তাছাড়া তাদের সংখ্যাও সেই সময়ের মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে কম ছিল না। এমনকি মদীনার অভ্যন্তরেও বহু সংখ্যক মুনাফিক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তাই মুসলমানরাও কখনো এ আশা করেনি যে, লড়াই ছাড়া শুধু অবরোধের কারণেই দিশেহারা হয়ে তারা নিজেদের বসতিটি ছেড়ে চলে যাবে। বনু নায়ীর গোত্রের লোকজন নিজেরাও একথা কল্পনা করেনি যে, কোন শক্তি মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই তাদের হাত থেকে এ জায়গা ছিনিয়ে নেবে। তাদের পূর্বে যদিও বনী কায়নুকা গোত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো এবং নিজেদের বীরত্বের অহংকার তাদের কোন কাজেই আসেনি। কিন্তু তারা ছিল মদীনার অভ্যন্তরে এক মহত্তর অধিবাসী। তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র কোন দুর্গ-প্রাকার বেষ্টিত জনপদ ছিল না। তাই বনী নায়ীর গোত্র মনে করতো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের টিকে থাকতে না পারা অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছু ছিল না। পক্ষান্তরে তারা নিজেদের সুরক্ষিত জনপদ এবং মজবুত দুর্গসমূহ দেখে ধারণাও করতে পারতো না যে, এখান থেকে কেউ তাদের বহিষ্কার করতে পারে। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার চরমপত্র দিলে তারা অত্যন্ত ধুঁটতার সাথে খোলাখুলি জবাব দিল, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি হলো, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে একথা বললেন যে, তারা মনে করে নিয়েছিলো তাদের ছোট ছোট দুর্গের মত বাড়ীঘর তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে? বনী নায়ীর কি সত্যি সত্যিই জানতো যে, তাদের মোকাবিলা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে নয়, বরং খোদা আল্লাহর সাথে? আর এটা জানার পরেও কি তারা একথা বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের দুর্গসমূহ আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে? যারা ইহুদী জাতির মানসিকতা এবং তাদের শত শত বছরের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত নয় এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এ প্রশ্ন দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি করবে। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে মোকাবিলা হচ্ছে সচেতনভাবে একথা জেনে শুনেও তারা এ ধরনের খোশ খেয়ালে মগ্ন থাকবে এবং তাববে যে, তাদের দুর্গ এবং অস্ত্রশস্ত্র তাদেরকে আল্লাহর থেকে রক্ষা করবে। এ কারণে একজন অনভিজ্ঞ লোক এখানে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ করবেন এই যে, বনী নায়ীর বাহ্যত নিজেদের সুদৃঢ় দুর্গসমূহ দেখে ভুল ধারণা করে বসেছিল যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তাদের মোকাবিলা ছিল আল্লাহর সাথে। এ আক্রমণ থেকে তাদের দুর্গসমূহ তাদের রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই পৃথিবীতে ইহুদীরা একটি অদ্ভুত জাতি যারা জেনে বুঝেও আল্লাহর মোকাবিলা করে আসছে। তারা আল্লাহর রসূলদেরকে আল্লাহর রসূল জেনেও হত্যা করেছে এবং

অহংকারে বুক ঠুকে বলেছে, আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি। এ জাতির লোকগোথায় রয়েছে যে, “তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়া’কুবের (আ) সাথে আল্লাহ তা’আলার সারা রাত ধরে কুস্তি হয়েছে এবং ভোর পর্যন্ত লড়াই করেও আল্লাহ তা’আলা তাকে পরাস্ত করতে পারেননি। অতপর ভোর হয়ে গেলে আল্লাহ তা’আলা তাকে বললেন : এখন আমাকে যেতে দাও। এতে ইয়া’কুব (আ) বললেন : যতক্ষণ না তুমি আমাকে বরকত দেবে ততক্ষণ আমি তোমাকে যেতে দেব না। আল্লাহ তা’আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম কি? তিনি বললেন : ইয়া’কুব। আল্লাহ তা’আলা বললেন : তবিস্যতে তোমার নাম ইয়া’কুব হবে না, বরং ‘ইসরাঈল’ হবে। কেননা, তুমি খোদা ও মানুষের সাথে শক্তি পরীক্ষা করে বিজয়ী হয়েছে।” দেখুন ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থের (The Holy Scriptures) আধুনিকতম অনুবাদ, প্রকাশক, জুয়িশ পাবলিকেশন সোসাইটি অব আমেরিকা, ১৯৫৪, আদিপুস্তক, অধ্যায় ৩২, শ্লোক ২৫ থেকে ২৯। খৃষ্টানদের অনুদিত বাইবেলেও এ বিষয়টি একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদীদের অনুবাদের ফুটনোটে ‘ইসরাঈল’ শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে : He who Striveth with God অর্থাৎ যিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেন। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিকাল লিটারেচারে খৃষ্টান পুরোহিতগণ ইসরাঈল শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : Wrestler with God “খোদার সাথে কুস্তি লড়েনওয়ানা।” হোশেয় পুস্তকে হযরত ইয়া’কুবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, “তিনি তাঁর যৌবনে খোদার সাথে কুস্তি লড়েছেন। তিনি ফেরেশতার সাথে কুস্তি করে বিজয়ী হয়েছেন।” (অধ্যায় ১২, শ্লোক ৪) অতএব একথা স্পষ্ট যে, বনী ইসরাঈলরা মহান সেই ইসরাঈলেরই বংশধর যার সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, তিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। তাই খোদার সাথে মোকাবিলা একথা জেনে বুঝেও খোদার বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হওয়া তাদের জন্য এমন কি আর কঠিন কাজ? এ কারণে তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে তারা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছে এবং একই কারণে তাদের নিজেদের ধারণা অনুসারে তারা হযরত ইসাকে শূলে চড়িয়েছে এবং বুক ঠুকে বলেছে : اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ (আমরা আল্লাহর রসূল মাসীহ ‘ঈসা ইবনে মরয়্যামকে হত্যা করেছি)। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল একথা জেনে বুঝেও তারা যদি তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে তাহলে তা তাদের ঐতিহ্য বিরোধী কোন কাজ নয়। তাদের জনসাধারণ না জানলেও পণ্ডিত-পুরোহিত ও আলেম সমাজ তাল করেই জানতো যে, তিনি আল্লাহর রসূল। এ বিষয়ের কয়েকটি প্রমাণ কুরআন মজীদেই বর্তমান। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাকহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ৭৯—৯৫ ; সাফফাত, টীকা ৭০—৭৩।

৫. আল্লাহ তা’আলার তাদের ওপর চড়াও হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি অন্য কোন স্থানে ছিলেন সেখান থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন। বরং এটি একটি রূপক বাক্য। এরূপ ধারণা দেয়াই মূলত উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে মোকাবিলার সময় তাদের ধারণা ছিল, শুধু একটি পন্থায় আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ আনতে পারেন। তাহলো সামান্যসামান্য কোন সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা। আর তারা মনে করতো যে, দুর্গাতান্ত্রে আশ্রয় নিয়ে তারা সে বিপদ ঠেকাতে পারবে। কিন্তু এমন একটি পথে তিনি তাদের ওপর হামলা করেছেন, যে দিক থেকে কোন বিপদ আসার আদৌ কোন আশংকা তারা করতো

না। সে পথটি ছিল এই যে, ভিতর থেকেই তিনি তাদের মনোবল ও মোকাবিলার ক্ষমতা নিঃশেষ ও অন্তসারশূন্য করে দিলেন। এরপর তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

৬. অর্থাৎ ধ্বংসসাধিত হয়েছে দু'ভাবে। যে দুর্গের মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছিল মুসলমানরা বাইরে থেকে অবরোধ করে তা ভেঙ্গে ফেলতে শুরু করলো। আর ভেতর থেকে তারা নিজেরা প্রথমত মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য স্থানে স্থানে কাঠ ও পাথরের প্রতিবন্ধক বসালো এবং সে জন্য নিজেদের ঘর দরজা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আবর্জনা জমা করলো। এরপর যখন তারা নিশ্চিত বুঝতে পারলো যে, এ জায়গা ছেড়ে তাদেরকে চলে যেতেই হবে তখন তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করতে শুরু করলো যাতে তা মুসলমানদের কোন কাজে না আসে। অথচ এক সময় বড় শখ করে তারা এসব বাড়ীঘর নির্মাণ করে সাজিয়ে গুছিয়েছিল। এরপর তারা যখন এই শর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করলো যে, তাদের প্রাণে বধ করা হবে না এবং অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যাই তারা নিয়ে যেতে সক্ষম হবে নিয়ে যেতে পারবে তখন যাওয়ার বেলায় তারা ঘরের দরজা, জানালা এবং খুঁটি পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। এমনকি অনেকে ঘরের কড়িকাঠ এবং কাঠের চাল পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে দিল।

৭. এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের কয়েকটি দিক আছে। সংক্ষিপ্ত ও স্তানগত এই আয়াতাত্মে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এই ইহুদীরা মূলত অতীত নবীদেরই উম্মাত ছিল। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, কিতাব বিশ্বাস করতো, পূর্ববর্তী নবীদের বিশ্বাস করতো এবং আখেরাতেও বিশ্বাস করতো। এ সব বিচারে তারা ছিল মূলত সাবেক মুসলমান। কিন্তু তারা যখন দীন ও আখলাককে উপেক্ষা করে শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির লালসা এবং পার্থিব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে ন্যায় ও সত্যের প্রতি শত্রুতা-পোষণের নীতি অবলম্বন করলো এবং নিজেদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কোন তোয়াক্কাই করলো না তখন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ-দৃষ্টিও আর তাদের প্রতি রইলো না। তা না হলে একথা সবারই জানা যে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। তাই এই পরিণাম দেখিয়ে সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যেন ইহুদীদের মত তারাও নিজেদেরকে খোদার প্রিয়পাত্র ও আদরের সন্তান মনে করে না বসে এবং এই খামখেয়ালীতে মগ্ন না হয় যে, আল্লাহর শেষ নবীর উম্মাত হওয়াটাই তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের গ্যারান্টি। এর বাইরে দীন ও আখলাকের কোন দাবী পূরণ তাদের জন্য জরুরী নয়। সাথে সাথে গোটা দুনিয়ার সেই সব লোককেও এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যারা জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতা করে এবং নিজেদের সম্পদ ও শক্তি এবং উপায়-উপকরণের ওপর এতটা নির্ভর করে যে, মনে করে তা তাদেরকে আল্লাহর শক্তি থেকে রক্ষা করবে। মদীনার ইহুদীদের একথা অজানা ছিল না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কণ্ডম বা গোত্রের মান মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন না। বরং তিনি একটি আদর্শিক দাওয়াত পেশ করছেন। এ দাওয়াতের লক্ষ গোটা দুনিয়ার সব মানুষ। এ দাওয়াত গ্রহণ করে যে কোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশের মানুষ কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই তাঁর উম্মাত হিসেবে গণ্য হতে পারে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْنَا فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِّ
 اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً
 عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۝

আল্লাহ যদি তাদের জন্য দেশান্তর হওয়া নির্দিষ্ট না করতেন তাহলে তিনি দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিতেন।^৮ আর আখেরাতে তো তাদের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছেই। এ হওয়ার কারণ হলো, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চরম বিরোধিতা করেছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহর বিরোধিতা করে, তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।

খৈজুরের যেসব গাছ তোমরা কেটেছো কিংবা যেসব গাছকে তার মূলের ওপর আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা সবই ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে।^৯ (আল্লাহ এ অনুমতি দিয়েছিলেন এ জন্য) যাতে তিনি ফাসেকদের লাহিত ও অপমানিত করেন।^{১০}

সাল্লামের নিজ খান্দানের লোকজনের মুসলিম সমাজে যে মর্যাদা ছিল হাবশার বেলাল (রা), রোমের সুহাইব (রা) এবং পারস্যের সালমানের (রা)ও সেই একই মর্যাদা ছিল, এটা তারা নিজ চোখে দেখছিল। তাই কুরাইশ, খায়রাজ ও আওস গোত্রের লোকেরা তাদের ওপর আধিপত্য কায়ম করবে এ আশংকা তাদের সামনে ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদর্শিক দাওয়াত পেশ করছিলেন তা যে অবিকল সেই দাওয়াত যা তাদের নবী-রসূলগণ পেশ করে এসেছেন, এ বিষয়টিও তাদের অজানা ছিল না। এ দাবীও তো তিনি করেননি যে, তিনি নতুন একটি দীন নিয়ে এসেছেন যা ইতিপূর্বে আর কেউ আনেনি। এখন তোমরা নিজেদের দীন বা জীবন ব্যবস্থা ছেড়ে আমার এই দীন বা আদর্শ গ্রহণ করো। বরং তাঁর দাবী ছিল, এটা সেই একই দীন, সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহর নবী-রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন। প্রকৃতই এটা যে সেই দীন তার সত্যতা তারা তাওরাত থেকে প্রমাণ করতে পারতো। এর মৌল নীতিমালার সাথে নবী-রসূলের দীনের মৌল নীতিমালার কোন পার্থক্য নেই। এ কারণেই কুরআন মজীদে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : **وَأَمِنُوا بِمَا آتَيْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا** (তোমরা ঈমান আনো আমার নাবিলকৃত সেই শিকার ওপরে যা তোমাদের কাছে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান শিকার সত্যায়নকারী। সবার আগে তোমরাই তার অস্বীকারকারী হয়ো না) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন চরিত্র ও আখলাকের লোক। তাঁর দাওয়াত কবুল করে মানুষের জীবনে কেমন সর্বাঙ্গিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তা তারা

চাক্ষুস দেখছিল। আনসারগণ দীর্ঘদিন থেকে তাদের নিকট প্রতিবেশী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের অবস্থা যা ছিল তাও তারা দেখেছে। আর এখন ইসলাম গ্রহণের পর তাদের যে অবস্থা হয়েছে তাও তাদের সামনে বর্তমান। এভাবে দাওয়াত, দাওয়াতদাতা ও দাওয়াত গ্রহণকারীদের পরিণাম ও ফলাফল সবই তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। এসব দেখে এবং জেনে বুঝেও তারা শুধু নিজেদের বংশগত গোড়ামি এবং পার্শ্বি বার্থের খাতিরে এমন একটি জিনিসের বিরোধিতায় সমস্ত শক্তি নিয়ে উঠে পড়ে লাগলো যার ন্যায় ও সত্য হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন অবকাশ অন্তত তাদের জন্য ছিল না। এই সজ্ঞান শত্রুতার পরেও তারা আশা করতো, তাদের দুর্গ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। অথচ গোটা মানব ইতিহাস একবার সাক্ষী যে, আল্লাহর শক্তি যার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় কোন অস্ত্রই তাকে রক্ষা করতে পারে না।

৮. দুনিয়ার আযাবের অর্থ তাদের নামনিশানা মুছে দেয়া। সন্ধি করে নিজেদের জীবন রক্ষা না করে যদি তারা লড়াই করতো তাহলে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। তাদের পুরুষরা নিহত হতো এবং নারী ও শিশুদের দাস-দাসী বানানো হতো। মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের উদ্ধার করারও কেউ থাকতো না।

৯. এখানে একটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মুসলমানরা অবরোধ শুরু করার পর তা সহজসাধ্য করার জন্য বনী নায়ীরের বসতির চারদিকে যে খেজুর বাগান ছিল তার অনেক গাছ কেটে ফেলে কিংবা জ্বালিয়ে দেয়। আর যেসব গাছ সামরিক বাহিনীর চলাচলে প্রতিবন্ধক ছিল না সেগুলোকে যথাস্থানে অক্ষত রাখে। এতে মদীনার মুনাফিকরা ও বনী কুরায়যা এমনকি বনী নায়ীর গোত্রের লোকও হৈ চৈ করতে শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “ফাসাদ ফিল আরদ” বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন; কিন্তু দেখো, তরুতাজা শ্যামল ফলবান গাছ কাটা হচ্ছে। এটা কি “ফাসাদ ফিল আরদ” নয়? এই সময় আল্লাহ তা’আলা এই নির্দেশ নাযিল করলেন : “তোমরা যেসব গাছ কেটেছো এবং যা না কেটে অক্ষত রেখেছো এর কোন একটি কাজও নাজায়েয নয়। বরং এ উভয় কাজেই আল্লাহর সম্মতি রয়েছে।” এ থেকে শরীয়াতের এ বিধানটি পাওয়া যায় যে, সামরিক প্রয়োজনে যেসব ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর তৎপরতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তা “ফাসাদ ফিল আরদ” বা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির সংজ্ঞায় পড়ে না। “ফাসাদ ফিল আরদ” হলো কোন সেনাবাহিনীর মাধ্যম যদি যুদ্ধের ভূত চেষ্টা বসে এবং তারা শত্রুর দেশে প্রবেশ করে শস্যক্ষেত, গবাদি পশু, বাগান, দালানকোঠা, প্রতিটি জিনিসই নির্বিচারে ধ্বংস ও বরবাদ করতে থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে সেটিই সাধারণ বিধান। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন : ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, ফসল ধ্বংস করবে না এবং জনবসতি বিরাণ করবে না। কুরআন মজীদে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মানুষদের নিন্দা ও সমালোচনা করতে গিয়ে এ কাজের জন্য তাদের তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে : “যখন তারা ক্ষমতাসীন হয় তখন শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করে চলে।” (বাকারাহ, ২০৫) হযরত আবু বকরের (রা) এ নীতি ছিল কুরআনের এ শিক্ষারই হুবহু অনুসরণ। তবে সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ নির্দেশ হলো, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কোন ধ্বংসাত্মক কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়লে তা করা যেতে পারে। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস’উদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছেন

যে, **قَطَعُوا مِنْهَا مَا كَانَ مَوْضِعًا لِلْقِتَالِ** “মুসলমানগণ বনী নাযীরের গাছপালায় মধ্যে কেবল সেই সব গাছপালাই কেটেছিলেন যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল।” (তাকহীমুলে নয়শা'পুরী) ফকীহদের কেউ কেউ ব্যাপারটির এ দিকটার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে মত পেশ করেছেন যে, বনী নাযীরের বৃক্ষ কাটার বৈধতা শুধু এ ঘটনার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এ থেকে এরূপ সাধারণ বৈধতা পাওয়া যায় না যে, সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলেই শত্রুর গাছপালা কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া যাবে। ইমাম আওয়ালী, লাইস ও আবু সাওর এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে এরূপ করা জায়েয। তবে শুধু ধ্বংসবজ্ঞা চালানোর জন্য এরূপ করা জায়েয নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কুরআন মজীদে এ আয়াত মুসলমানদের হয়তো সন্তুষ্ট করে থাকতে পারে কিন্তু যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করতো না নিজেদের শত্রুর এ জবাব শুনে তারা কি সান্ত্বনা লাভ করবে যে, এ দু'টি কাজই আল্লাহর অনুমতির ভিত্তিতে বৈধ? এর জবাব হলো শুধু মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাখিল হয়েছে। কাকেরদের সন্তুষ্ট করা এর আদৌ কোন উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু ইহুদী ও মুনাজিকদের প্রশ্ন সৃষ্টির কারণে কিংবা মুসলমানদের মনে স্বতচ্ছূর্তভাবে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল, আমরা “ফাসাদ ফিল আরদে” লিখ হয়ে পড়ি নাই তো? তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন যে, অবরোধের প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক গাছপালা কেটে ফেলা এবং অবরোধের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না এমন সব গাছপালা না কাটা এ দু'টি কাজই আল্লাহর বিধান অনুসারে বৈধ ছিল।

এ সব গাছ কেটে ফেলা বা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়েছিলেন না মুসলমানরা নিজেরাই এ কাজ করে পরে এর শরয়ী বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে বিষয়ে মুহাদিসদের বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য দেখা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বর্ণনা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মুসনায়ে আহমাদ ও ইবনে জারীর)। ইয়াযীদ ইবনে রুমানের বর্ণনাও তাই। (ইবনে জারীর) অন্যদিকে মুজাহিদ ও কাতাদার বর্ণনা হলো, এসব গাছপালা মুসলমানরা নিজেদের সিদ্ধান্তেই কেটেছিলেন। তারপর এ বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় যে, কাজটি করা তাদের উচিত হয়েছে কিনা? কেউ কেউ তা বৈধ বলে মত প্রকাশ করলেন। আবার কেউ কেউ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাখিল করে উভয় দলের কাজই সঠিক বলে ঘোষণা করলেন। (ইবনে জারীর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ রেওয়ায়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন : এ বিষয়ে মুসলমানদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, আমাদের মধ্যে থেকে অনেকে গাছপালা কেটেছে আবার অনেকে কাটেনি। অতএব এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা উচিত, আমাদের কার কাজ পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কার কাজ পাকড়াও হওয়ার যোগ্য? (নাসায়ী) ফকীহদের মধ্যে যারা প্রথম রেওয়ায়াতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ করেন যে, এটি ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজতিহাদ। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট অহী দ্বারা তা সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন। এটা এ বিষয়ের একটা প্রমাণ যে, যেসব ব্যাপারে

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①
 مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كُنِيَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ
 الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ
 فَأَنْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

আল্লাহ তা'আলা যেসব সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে তাঁর রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন^{১১} তা এমন সম্পদ নয়, যার জন্য তোমাদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা করতে হয়েছে। বরং আল্লাহ তা'আলা যার ওপরে চান তাঁর রসূলদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।^{১২} এসব জনপদের দখলমুক্ত করে যে জিনিসই আল্লাহ তাঁর রসূলকে ফিরিয়ে দেন তা আল্লাহ, রসূল, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য।^{১৩} যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত হতে না থাকে।^{১৪} রসূল যা কিছু তোমাদের দেন তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।^{১৫}

আল্লাহর কোন নির্দেশ বর্তমান থাকতো না সে সব ব্যাপারে নবী (সা) ইজতিহাদ করে কাজ করতেন। অপরপক্ষে যেসব ফকীহ দ্বিতীয় রেওয়াজাতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ থেকে প্রমাণ পেশ করেন যে, মুসলমানদের দু'টি দল ইজতিহাদের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি মত গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দু'টি মতই সমর্থন করেছেন। অতএব জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ যদি সর্ণনিয়েতে ইজতিহাদ করে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে তাদের মতসমূহ পরস্পর ভিন্ন হবে। কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতে তারা সবাই হকের অনুসারী বলে গণ্য হবেন।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল এসব গাছ কাটার দ্বারাও তারা অপমানিত ও লাহিত হোক এবং না কাটা দ্বারাও অপমানিত ও লাহিত হোক। কাটার মধ্যে তাদের অপমান ও লাহনার দিকটি ছিল এই যে, যে বাগান তারা নিজ হাতে তৈরী করেছিল এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা যে বাগানের মালিক ছিল সেই সব বাগানের গাছপালা তাদের চোখের

সামনেই কেটে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু তারা কোনভাবে কর্তনকারীদের বাধা দিতে পারছে না। একজন সাধারণ কৃষক বা মালিক তার ফসল বা বাগানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে পারে না। কেউ যদি তার সামনে তার ফসল বা বাগান ধ্বংস করতে থাকে তাহলে সে তার বিরুদ্ধে প্রাণপাত করবে। সে যদি নিজের সম্পদে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারে তবে তা হবে তার চরম অপমান ও দুর্বলতার প্রমাণ। কিন্তু এখানে পুরা একটি গোত্র যারা শত শত বছর ধরে এ স্থানে বসবাস করে আসছিলো অসহায় হয়ে দেখছিলো যে, তাদের প্রতিবেশী তাদের বাগানের ওপর চড়াও হয়ে এর গাছপালা ধ্বংস করছে। কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি। এ ঘটনার পর তারা মদীনায় থেকে গেলেও তাদের কোন মান-মর্যাদা অবশিষ্ট থাকতো না। এখন থাকলো গাছপালা না কাটার মধ্যে অপমান ও লাঞ্ছনার বিষয়টি। সেটি হলো, যখন তারা মদীনা ছেড়ে চলে চাচ্ছিলো তখন নিজ চোখে দেখছিল যে, শ্যামল-সবুজ যেসব বাগান কাল পর্যন্তও তাদের মালিকানায় ছিল আজ তা মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে। ক্ষমতায় কুলালে তারা ওগুলো পুরাপুরি ধ্বংস করে যেতো এবং অবিকৃত একটি গাছও মুসলমানদের দখলে যেতে দিতো না। কিন্তু তারা নিরুপায়ভাবে সবকিছু যেমন ছিল তেমন রেখে হতাশা ও দুঃখ ভরা মনে বেরিয়ে গেল।

১১. যেসব বিষয় সম্পত্তি বনী নাযীরের মালিকানায় ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর তা ইসলামী সরকারের হস্তগত হয়েছিলো এখানে সেই সব বিষয় সম্পত্তির কথা বলা হচ্ছে। এসব সম্পদের ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা যাবে এখান থেকে শুরু করে ১০নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সেই সব কথাই বলেছেন। কোন এলাকা বিজিত হয়ে ইসলামী সরকারের দখলভুক্ত হওয়ার ঘটনা যেহেতু এটাই প্রথম এবং পরে আরো এলাকা বিজিত হতে যাচ্ছিলো তাই এ জন্য বিজয়ের শুরুতেই বিজিত ভূমি সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভেবে দেখার মত বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা **مَا آفَاءَ لِلَّهِ عَلَى رَسُولٍ مِنْهُمْ** (যেসব সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন) বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এ বাক্য থেকে স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, এই পৃথিবী এবং যেসব জিনিস এখানে পাওয়া যায় তাতে সেই সব লোকদের মূলত কোন অধিকার নেই যারা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তারা যদি এর ওপরে দখলকারী ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেও থাকে তাহলেও তার অবস্থা হলো বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য কর্তৃক মনিবের বিষয়-সম্পদ কুক্ষিগত করার মত। প্রকৃতপক্ষে এসব সম্পদের হক হলো তা তার আসল মালিক আল্লাহ রবুল আলামীনের মজি অনুসারে তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা। আর এভাবে ব্যবহার কেবল নেককার ঈমানদার বান্দারাই করতে পারে। তাই বৈধ ও ন্যায়সংগত যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব সম্পদ কাকেরদের দখলমুক্ত হয়ে ঈমানদারদের করায়ত্ত হবে তার মর্যাদা হলো তার মালিক এ সম্পদ নিজের বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যদের দখল থেকে উদ্ধার করে তাঁর আনুগত্য ভৃত্যদের দখলে দিয়েছেন। তাই ইসলামী আইনের পরিভাষায় এসব বিষয় সম্পদকে 'ফাই' (প্রত্যাবর্তিত বা ফিরিয়ে আনা সম্পদ) বলা হয়েছে।

১২. অর্থাৎ এসব সম্পদের অবস্থা ও প্রকৃতি এমন নয় যে, সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করে তা অর্জন করেছে। তাই এতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ সম্পদ তাদের মধ্যেই বন্টন করে দিতে হবে। বরং তার প্রকৃত

অবস্থা হলো, আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাঁর রসূলদের এবং যে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব এ রসূল করছেন সেই আদর্শকে তাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। অন্য কথায়, এসব সম্পদ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হওয়া সরাসরি সেনাবাহিনীর শক্তি প্রয়োগের ফল নয়। বরং এটা সেই সামগ্রিক শক্তির ফল যা আল্লাহ তাঁর রসূল, রসূলের উম্মাত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে দান করেছেন। তাই এসব সম্পদ গনীমাতের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন। এতে যুদ্ধরত সৈনিকদের এমন কোন অধিকার বর্তায় না যে, তা তাদের মধ্যে গনীমাতের মত বন্টন করে দিতে হবে।

এভাবে শরীয়াতে 'গনীমাত' ও 'ফাই'-এর আলাদা আলাদা বিধান দেয়া হয়েছে। সূরা আনফালের ৪১নং আয়াতে গনীমাতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। বিধানটি হলো, গনীমাতের সম্পদ পাঁচটি অংশে ভাগ করা হবে। এর চারটি অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে এবং একটি অংশ বায়তুলমালা জমা দিয়ে উক্ত আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে খরচ করতে হবে। ফাইয়ের বিধান হলো, তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। বরং এর সবটাই পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। এই দুই ধরনের সম্পদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছে: **فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ** (তোমরা তার বিরুদ্ধে নিজেদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা কর নাই।) কথাটি দ্বারা ঘোড়া বা উট পরিচালনা করার অর্থ সামরিক তৎপরতা চালানো (Warlike Operations)। সুতরাং সরাসরি এ ধরনের তৎপরতার ফলে যেসব সম্পদ হস্তগত হয়ে থাকে তা গনীমাতের সম্পদ। আর যেসব সম্পদ লাভের পেছনে এ ধরনের তৎপরতা নেই তা সবই 'ফাই' হিসেবে গণ্য।

'গনীমাত' ও 'ফাই'-এর মোটামুটি যে অর্থ এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের ফকীহগণ তা আরো স্পষ্ট করে এভাবে বর্ণনা করেছেন : গনীমাত হলো সেই সব অস্থাবর সম্পদ যা সামরিক তৎপরতা চালানোর সময় শত্রু সেনাদের নিকট থেকে লাভ করা গিয়েছে। এসব ছাড়া শত্রু এলাকার ভূমি, ঘরবাড়ী এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ গনীমাতের সংজ্ঞায় পড়ে না। এ ব্যাখ্যার উৎস হলো হযরত উমরের (রা) সেই পত্র যা তিনি ইরাক বিজয়ের পর হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন :

فَانظُرْ مَا أَجَلَبُوا بِهِ عَلَيْكَ فِي الْعَسْكَرِ مِنْ كِرَاعٍ أَوْ مَالٍ فَأَقْسِمُ
بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاتْرَكَ الْأَرْضَيْنِ وَالْأَنْهَارَ لِعَمَالِهَا
لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أَعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ -

“সেনাবাহিনীর লোকজন যেসব ধন-সম্পদ তোমাদের কাছে কুড়িয়ে আনবে তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আর ভূমি ও সেচ খালে যেসব লোক কাজ করে ভূমি ও সেচ খাল তাদের জন্য রেখে দাও যাতে তার আয় মুসলমানদের বেতন ভাতা ও বৃত্তি দেয়ার কাজে লাগে।” (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৪; কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়দ, পৃষ্ঠা ৫৯; কিতাবুল খারাজ, ইয়াহইয়া ইবনে আদম, পৃষ্ঠা ২৭, ২৮, ৪৮)

এ কারণে হাসান বসরী বলেন : শত্রুর শিবির থেকে যা হস্তগত হবে তা সেই সব সৈনিকদের হক যারা তা দখল করেছে। কিন্তু ভূমি সব মুসলমানের জন্য। (ইয়াহইয়া ইবনে আদম ২৭) ইমাম আবু ইউসুফ বলেন : “শত্রুসেনাদের কাছ থেকে যেসব জিনিস মুসলমানদের হস্তগত হবে এবং যেসব দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র ও জীবজন্তু তারা কুড়িয়ে ক্যাম্পে আনবে তাহলো গনীমাত। এর মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখে অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে।” (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১৮) ইয়াহইয়া ইবনে আদমও এ মত পোষণ করেন এবং তা তিনি তাঁর গ্রন্থ কিতাবুল খারাজে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা ২৭) যে জিনিসটি ‘গনীমাত ও ফাই’-এর পার্থক্য আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরে তা হলো, নাহাওয়ানদের যুদ্ধ শেষে গনীমাতের সম্পদ বন্টন এবং বিজিত এলাকা যথারীতি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হওয়ার পর সায়েব ইবনে আকরা’ নামক এক ব্যক্তি দুর্গের অভ্যন্তরে দু’টি খলি ভর্তি মণি মুক্তা কুড়িয়ে পান। এতে তার মনে খটকা সৃষ্টি হয় যে, তা ‘গনীমাত’ না ‘ফাই’? গনীমাত হলে তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর ‘ফাই’ হলে তা বায়তুলমালে জমা হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনায় হাজির হলেন এবং বিষয়টি হযরত উমরের (রা) সামনে পেশ করলেন। হযরত উমর (রা) ফায়সালা করলেন যে, তা বিক্রি করে অর্থ বায়তুলমালে জমা দিতে হবে। এ থেকে জানা গেল যে, শুধু এমন সব অস্থাবর সম্পদ গনীমাত হিসেবে গণ্য হবে যা যুদ্ধের সময় সৈন্যদের হস্তগত হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পদ স্থাবর সম্পদের মতই ‘ফাই’ হিসেবে গণ্য হয়। এ ঘটনাটি উল্লেখ করে ইমাম আবু উবায়দে লিখছেন :

مَا نِيلَ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ عَنْوَةً قَسْرًا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهُوَ الْغَنِيمَةُ -
وَمَا نِيلَ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا وَتَصِيرُ الدَّارُ دَارًا لِلْإِسْلَامِ -
فَهُوَ فَيْءٌ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَامًّا وَلَا خُمْسَ فِيهِ -

“যুদ্ধ চলাকালে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেসব সম্পদ শত্রুর কাছ থেকে হস্তগত হবে তা গনীমাত। আর যুদ্ধ শেষে দেশ দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার পর যেসব সম্পদ হস্তগত হবে তা ‘ফাই’ হিসেবে পরিগণিত হবে। এ সম্পদ দারুল ইসলামের অধিবাসীদের কল্যাণে কাজে লাগা উচিত। তাতে এক-পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট হবে না।” (কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা ২৫৪)

গনীমাতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত ও নির্দিষ্ট করার পর কাফেরদের কাছ থেকে মুসলমানদের হস্তগত হওয়া যেসব সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি ও জায়গা-জমি অবশিষ্ট থাকে তা প্রধান দু’টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, লড়াই করে হস্তগত করা সম্পদ ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় যাকে শক্তি বলে দখলকৃত দেশ বা অঞ্চল বলা হয়। দুই, সন্ধির ফলে যা মুসলমানদের হস্তগত হবে। এ সন্ধি মুসলমানদের সামরিক শক্তির প্রভাব, দাপট কিংবা ভীতির কারণে হলেও। বাহুবলে হস্তগত না হয়ে অন্য কোনভাবে হস্তগত হওয়া সম্পদও এরই মধ্যে অন্তরভুক্ত। মুসলিম ফকীহদের মধ্যে যা কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা প্রথম প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে হয়েছে। অর্থাৎ তার সঠিক শরয়ী মর্যাদা কি? কেননা, তা فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رُكَابٍ - এর সংজ্ঞায় পড়ে না। এরপর

থাকে দ্বিতীয় প্রকার সম্পদ। এ প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে সর্বসম্মত মত হলো, তা 'ফাই' হিসেবে গণ্য। কারণ এর বিধান কুরআন মজীদে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। পরে আমরা প্রথম প্রকারের সম্পদের শরয়ী মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১৩. এসব সম্পদ আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে গণীমাতের মত বন্টন না করার কারণ কি এবং তার শরয়ী বিধান গণীমাত সম্পর্কিত বিধান থেকে ভিন্ন কেন পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু এতটুকু কথাই বলা হয়েছে। এখন এসব সম্পদের হকদার কারা এ আয়তটিতে তা বলা হয়েছে।

এসব সম্পদের মধ্যে সর্বপ্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। রসূলুল্লাহ (সা) এ নির্দেশ অনুসারে যেভাবে আমল করেছেন হযরত উমর (রা) থেকে মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান তা উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেন : এ অংশ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ও পরিবার-পরিজনদের খরচ নিয়ে নিতেন আর অবশিষ্ট অর্থ জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সওয়ারী জবু সংগ্রহ করতে ব্যয় করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি) নবীর (সা) ইতিকালের পর এ অংশটি মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো যাতে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কাজেই তা ব্যয়িত হয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যে অংশটি বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তা তাঁর ইতিকালের পর তাঁর খলীফাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ ইমামত বা নেতৃত্বের পদমর্যাদার জন্য তিনি এর হকদার ছিলেন, রিসালাতের পদমর্যাদার জন্য নয়। তবে শাফেয়ী ফিকাহবিদগণের অধিকাংশ এ ব্যাপারে অন্যান্য অধিকাংশ ফিকাহবিদগণের অনুরূপ মতামত পোষণ করেন। অর্থাৎ এ অংশটি এখন আর কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং তা মুসলমানদের দীনি ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয়িত হবে।

দ্বিতীয় অংশটি হলো আত্মীয়-স্বজনের জন্য। এর অর্থ রসূলের আত্মীয়-স্বজনের জন্য। অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব। এ অংশটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ জন্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনদের হক আদায় করার সাথে সাথে নিজের সেই সব আত্মীয়-স্বজনের হকও আদায় করতে পারেন যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী অথবা তিনি নিজে যাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকালের পর এ অংশেরও ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশিষ্ট নেই। বরং মুসলমানদের অন্য সব মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের মত বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের অভাবী লোকদের অধিকারসমূহ ও বায়তুলমালের জিমাাদারীতে চলে গিয়েছে। তবে যাকাতে তাদের অংশ না থাকার কারণে অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগে প্রথম দু'টি অংশ বাতিল করে শুধু অবশিষ্ট তিনটি অংশের (ইয়াতীম, মিসকীন ও ইবনুস সাবীল) হকদারদের জন্য 'ফাই' নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্জাহ তাঁর যুগে এ নীতি অনুসারে আমল করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইমাম মুহাম্মাদ বাকেরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, যদিও

হযরত আলীর (রা) আহলে বায়তের রায়ই [এ অংশ নবীর (সা) আত্মীয়-স্বজনদের পাওয়া উচিত] তাঁর ব্যক্তিগত রায় ছিল। তথাপি তিনি হযরত আবু বকর ও উমরের (রা) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করা পছন্দ করেননি। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানানিয়া বলেন : নবীর (সা) পরে ঐ দু'টি অংশ (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ ও যাবিল কুরবার অংশ) সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, প্রথম অংশটি হজুরের (সা) খলীফার প্রাপ্য। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, দ্বিতীয় অংশটি হজুরের (সা) আত্মীয়-স্বজনদের পাওয়া উচিত। অপর কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা ছিল, দ্বিতীয় অংশটি খলীফার আত্মীয়-স্বজনদের দেয়া উচিত। অবশেষে এমতে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো যে, এ দু'টি অংশই জিহাদের প্রয়োজনে খরচ করা হবে। আতা ইবনে সায়েব বলেন : হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর শাসনকালে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অংশ বনী হাশেমদের কাছে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ হানাফী ফকীহদের সিদ্ধান্ত হলো, এ ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অনুসৃত কর্মনীতিই সঠিক ও নির্ভুল (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২১)। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যারা হাশেম ও মুতালিব বংশের লোক বলে প্রমাণিত কিংবা সাধারণভাবে সবার কাছে পরিচিত তাদের সম্বল ও অভাবী উভয় শ্রেণীর লোককেই 'ফাই'-এর সম্পদ থেকে দেয়া যেতে পারে। (মুগনিউল মুহতাজ) হানাফীদের মতে, এ অর্থ থেকে কেবল তাদের অভাবীদের সাহায্য করা যেতে পারে। অবশ্য অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। (রুহুল মাযানী) ইমাম মালেকের মতে এ ব্যাপারে সরকারের ওপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। যে খাতে ইচ্ছা সরকার তা ব্যয় করতে পারেন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। (হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ্শারহিল কাবীর)

অবশিষ্ট তিনটি অংশ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই। তবে ইমাম শাফেয়ী এবং অন্য তিনজন ইমামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে 'ফাই'-এর সমস্ত অর্থ-সম্পদ সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ উপরোক্ত খাতসমূহে এমনভাবে খরচ করা উচিত যেন তার $\frac{1}{5}$ সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে, $\frac{1}{5}$ বনী হাশেম ও বনী মুতালিবের জন্য, $\frac{1}{5}$ ইয়াতীমদের জন্য, $\frac{1}{5}$ মিসকীনদের জন্য এবং $\frac{1}{5}$ মুসাফিরদের জন্য ব্যয়িত হয়। অপরদিকে ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ এভাবে বন্টনের পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে, 'ফাই'-এর সমস্ত অর্থ-সম্পদই সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। (মুগনিউল মুহতাজ)

১৪. এটি কুরআন মজীদে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক আয়াতসমূহের একটি। এতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির একটি মৌলিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গোটা সমাজে ব্যাপকভাবে সম্পদ আবর্তিত হতে থাকা উচিত। এমন যেন না হয় অর্থ-সম্পদ কেবল ধনবান ও বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে। কিংবা ধনী দিনে দিনে আরো ধনশালী হতে থাকবে আর গরীব দিনে দিনে আরো বেশী গরীব হতে থাকবে। কুরআন মজীদে এ নীতি শুধু বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং এ উদ্দেশ্যে সুদ হারাম করা হয়েছে, যাকাত ফরয করা হয়েছে, গনীমাতের

সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন আয়াতে নফল সাদকা ও দান-খয়রাতের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কাফ্ফারা আদায়ের এমন সব পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সম্পদের প্রবাহ সমাজের দরিদ্র মানুষদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে। উত্তরাধিকারের জন্য এমন আইন রচনা করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যেন ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে, কাপণ্য ও বখিলীকে নৈতিক বিচারে কঠোরভাবে নিন্দনীয় এবং দানশীলতাকে সর্বোত্তম গুণ বলে প্রশংসা করা হয়েছে আর সচ্ছল শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের সম্পদে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে যাকে খয়রাত মনে করে নয় বরং তাদের অধিকার মনে করে আদায় করা উচিত। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি বড় খাত অর্থাৎ 'ফাই' সম্পর্কে এমন একটি আইন রচনা করা হয়েছে যে, এর একটি অংশ যেন অনিবার্যরূপে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে সহায়তা দানের জন্য ব্যয়িত হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত দু'টি একটি যাকাত এবং অন্যটি 'ফাই'। মুসলমানদের নিসাবের অতিরিক্ত পুঁজি, গবাদি পশু, ব্যবসায় গণ্য এবং কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য থেকে আদায় করা হয়, আর এর বেশীর ভাগই গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট। আর 'ফাই'—এর মধ্যে জিয়িয়া ও ভূমি রাজস্ব সহ সেই সব আয়ও অন্তর্ভুক্ত যা অমুসলিমদের নিকট থেকে আসে। এরও বেশীর ভাগ গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা এ বিষয়েরই স্পষ্ট ইংগিত যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে তার আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের গোটা আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যেন ধন-সম্পদের উপায়-উপকরণের ওপর বিভবান এবং প্রভাবশালী লোকদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সম্পদের প্রবাহ গরীবদের দিক থেকে ধনীদের দিকে ঘুরে না যায় আর বিভাগশীলদের মধ্যেই যেন আবর্তিত হতে না থাকে।

১৫. বর্ণনার ধারাবাহিকতার দিক থেকে এ আয়াতের অর্থ হলো, বনী নাসীর গোত্র থেকে লব্ধ সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে লব্ধ 'ফাই'—এর সম্পদের বিলি-বন্টনের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা কোন প্রকার আপত্তি ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই মেনে নাও। তিনি যাকে যা দেবেন সে তা গ্রহণ করবে এবং যা কাউকে দেবেন না সে জন্য যেন নে আপত্তি বা দাবী উত্থাপন না করে। কিন্তু নির্দেশটির ভাষা যেহেতু ব্যাপকতাবোধক, তাই এ নির্দেশ শুধু 'ফাই' সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অভিপ্রায় হলো, মুসলমান সব ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে। এ অভিপ্রায়কে আরো স্পষ্ট করে দেয় এ বিষয়টি যে, "রসূল তোমাদের যা কিছু দেন" কথাটির বিপরীতে "যা কিছু না দেন" বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, "যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা থেকে বিরত থাকো।" এ নির্দেশের লক্ষ যদি শুধু 'ফাই'—এর সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে আনুগত্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হতো তা হলে 'যা দেন' কথাটির বিপরীতে 'যা না দেন' বলা হতো। এ ক্ষেত্রে নিষেধ করা বা বিরত রাখা কথাটির ব্যবহার দ্বারা আপনা থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নির্দেশের লক্ষ ও উদ্দেশ্য নবীর (সা) আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
 فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ
 الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ
 هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
 عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شِرْنَفِيسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ۝

(তাছাড়াও এ সম্পদ) সেই সব গরীব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে।^{১৬} এসব লোক চায় আল্লাহর মেহেরবানী এবং সন্তুষ্টি। আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ লোক। (আবার তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান এনে দারুল হিজরাতে বসবাস করছিলো।^{১৭} তারা ভালবাসে সেই সব লোকদের যারা হিজরাত করে তাদের কাছে এসেছে। যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন এরা নিজেদের মনে তার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না এবং যত অভাবশূন্যই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অধিকার দান করে।^{১৮} মূলত যেসব লোককে তাদের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।^{১৯}

নিজেও একথাটি বলেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ
 فَاجْتَنِبُوهُ - (بخاری - مسلم)

“আমি কোন বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দিলে তা যথাসাধ্য পালন করো। আর যে বিষয়ে বিরত থাকতে বলি তা থেকে দূরে থাকো।” (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি বক্তৃতাকালে বললেন : “আল্লাহ তা’আলা অমুক অমুক ফ্যাশনকারীণী মহিলাকে লা’নত করেছেন।” এই বক্তৃতা শুনে এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল : একথা আপনি কোথায়

পেয়েছেন? আল্লাহর কিতাবে তো এ বিষয়টি আমি কোথাও দেখি নাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন : তুমি আল্লাহর কিতাব পড়ে থাকলে একথা অবশ্যই পেতে। তুমি কি এ আয়াত **مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** পড়েছো? সে বললো : হ্যাঁ, এ আয়াত তো আমি পড়েছি। হযরত আবদুল্লাহ বললেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরূপ কাজে লিঙ নারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন। মহিলাটি বললো : এখন আমি বুঝতে পারলাম। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম।)

১৬. এ কথা দ্বারা সেই সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা ঐ সময় মক্কা মুয়াযযামা ও আরবের অন্যান্য এলাকা থেকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বনী নাসীর গোত্রের এলাকা বিজিত হওয়া পর্যন্ত এসব মুহাজিরের জীবন যাপনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেসব অর্থ-সম্পদ এখন হস্তগত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসব সম্পদ 'ফাই' হিসেবে হস্তগত হবে তাতে সাধারণ মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের সাথে সাথে এসব লোকেরও অধিকার আছে। উক্ত সম্পদ থেকে এমন সব লোকদের সহযোগিতা দেয়া উচিত যারা আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং তাঁর দীনের জন্য হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছে এবং দারুল ইসলামে চলে এসেছে। এই নির্দেশের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী নাসীরের সম্পদের একটি অংশ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং আনসারগণ যেসব খেজুর বাগান তাদের মুহাজির ভাইদের সাহায্যের জন্য দিয়ে রেখেছিলেন তা তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, 'ফাই'-এর সম্পদে মুহাজিরদের এ অংশ কেবল সেই যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কিয়ামত পর্যন্ত যত লোকই মুসলমান হওয়ার কারণে নির্বাসিত হয়ে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে তাদের পুনর্বাসিত করা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া উক্ত রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই তার উচিত যাকাত ছাড়া 'ফাই'-এর সম্পদও এ খাতে খরচ করা।

১৭. এখানে আনসারদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ফাই' অর্থ-সম্পদে শুধু মুহাজিরদের অধিকার নেই। বরং আগে থেকেই যেসব মুসলমান দারুল ইসলামে বসবাস করে আসছে তারাও এতে অংশ লাভের অধিকারী।

১৮. এটা মদীনা তাইয়্যোবার আনসারদের পরিচয় ও প্রশংসা। মুহাজিরগণ মক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে হিজরত করে তাদের শহরে আসলে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রস্তাব দিলেন, আমাদের বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগান দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ওগুলো আমাদের এবং এসব মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন। নবী (সা) বললেন : এসব লোক তো বাগানের কাজ জানে না। তারা এমন এলাকা থেকে এসেছে যেখানে বাগান নেই। এমন কি হতে পারে না, এসব বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগানে তোমরাই কাজ করো এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ এদের দাও। তারা বললো : **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** আমরা মেনে নিলাম। (বুখারী, ইবনে জারীর) এতে মুহাজিরগণ বলে উঠলেন : এ রকম আত্মত্যাগী মানুষ তারা আর কখনো দেখিনি। এরা নিজেরা কাজ

করবে অথচ আমাদেরকে অংশ দেবে। আমাদের তো মনে হচ্ছে, সমস্ত সওয়াব তারা ই লুটে নিয়েছে। নবী (সা) বললেন : তা নয়, যতক্ষণ তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে ততক্ষণ তোমরাও সওয়াব পেতে থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ) অতপর বনী নাযীরের এলাকা বিজিত হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এখন একটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমাদের বিষয়-সম্পদ এবং ইহুদীদের পরিত্যক্ত ফল-ফলাদি ও খেজুর বাগান মিলিয়ে একত্রিত করে সবটা তোমাদের ও মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক। আরেকটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমরা তোমাদের বিষয়-সম্পদ নিজেরাই ভোগ দখল করো আর পরিত্যক্ত এসব ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক। আনসারগণ বললেন : এসব বিষয়-সম্পদ আপনি তাদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিন। আর আপনি চাইলে আমাদের বিষয়-সম্পদেরও যতটা ইচ্ছা তাদের দিয়ে দিতে পারেন। এতে হযরত আবু বকর চিৎকার করে উঠলেন : **جَزَاكُمُ اللَّهُ يَا مَعْشَرَ الْانصَارِ خَيْرًا** “হে আনসারগণ, আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।” (ইয়াহইয়া ইবনে আদম, বালাযুরী) এভাবে আনসারদের সম্মতির ভিত্তিতেই ইহুদীদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো। আনসারদের মধ্যে থেকে শুধু হযরত আবু দুজানা, হযরত সাহল ইবনে সা’দ এবং কারো কারো বর্ণনা অনুসারে হযরত হারেস ইবনুস্ সিমাকে অংশ দেয়া হলো। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। (বালাযুরী, ইবনে হিশাম, রহুল মাযানী) বাহরাইন এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে সে সময়ও আনসারগণ এই ত্যাগের প্রমাণ দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অঞ্চলের বিজিত ভূমি শুধু আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। কিন্তু আনসারগণ বললেন : যতক্ষণ আমাদের সমপরিমাণ অংশ আমাদের তাই মুহাজিরদের দেয়া না হবে ততক্ষণ আমরা এ সম্পদের কোন অংশ গ্রহণ করবো না। (ইয়াহইয়া ইবনে আদম) আনসারদের এ সব ত্যাগের কারণে আল্লাহ তা’আলা তাদের প্রশংসা করেছেন।

১৯. ‘রক্ষা পেয়েছে’ না বলে বলা হয়েছে ‘রক্ষা করা হয়েছে’। কেননা আল্লাহ তা’আলার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া কেউ নিজ বাহ বলে মনের ঔদার্য ও ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে না। এটা আল্লাহর এমন এক নিয়ামত যা আল্লাহর দয়া ও করুণায়ই কেবল কারো ভাগ্যে জুটে থাকে। **شَح** শব্দটি আরবী ভাষায় অতি কৃপণতা ও বখিলী বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দটিকে যখন **نَفْس** শব্দের সাথে সংযুক্ত করে **شَح النَّفْس** বলা হয় তখন তা দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা, পরহীকাতরতা এবং মনের নীচতার সমার্থক হয়ে যায় যা বখিলী বা কৃপণতার চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বরং কৃপণতার মূল উৎস এটিই। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ অন্যের অধিকার স্বীকার করা এবং তা পূরণ করা তো দূরের কথা তার গুণাবলী স্বীকার করতে পর্যন্ত কুঠাবোধ করে। সে চায় দুনিয়ার সবকিছু সে-ই লাভ করুক। অন্য কেউ যেন কিছুই না পায়। নিজে অন্যদের কিছু দেয়া তো দূরের কথা, অপর কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু দেয় তাহলেও সে মনে কষ্ট পায়। তার লালসা শুধু নিজের অধিকার নিয়ে কখনো সন্তুষ্ট নয়, বরং অন্যদের অধিকারেও সে হস্তক্ষেপ করে, কিংবা অন্ততপক্ষে সে চায় তার চারদিকে ভাল বস্তু যা আছে তা সে নিজের জন্য দু’হাতে লুটে নেবে অন্য কারো জন্য কিছুই রাখবে না। এ কারণে এ জঘন্য স্বভাব থেকে রক্ষা পাওয়াকে কুরআন মজীদে সাফল্যের গ্যারান্টি বলে

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

رءوف رحيم

(তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে।^{২০} যারা বলে : হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।^{২১}

আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটিকে মানুষের নিকৃষ্টতম স্বভাব বলে গণ্য করেছেন যা বিপর্যয়ের উৎস। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী (সা) বলেছেন :

اتَّقُوا الشَّعَّ فَإِنَّ الشَّعَّ أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا

دِمَائِهِمْ وَأَسْتَحَلُّوا مُحَارِمَهُمْ (মসল - মসন্দ احمد - বিহকী -

(بخارى فى الادب)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ণনার ভাষা হলো :

أَمَرَهُمْ بِالظُّلَمِ فَظَلَمُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا - وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ
فَقَطَعُوا (মসন্দ احمد - আবু দাউদ - নসায়ী)

অর্থাৎ শেখ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ এটিই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে। এটিই তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত ঘটাতে এবং অপরের মর্যাদাহানি নিজের জন্য বৈধ মনে করে নিতে মানুষকে প্ররোচিত করেছে। এটিই তাদের জুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই তারা জুলুম করেছে। পাপের নির্দেশ দিয়েছে তাই পাপ করেছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলেছে তাই তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন : ঈমান ও মনের সংকীর্ণতা একই সাথে কারো মনে অবস্থান করতে পারে না। (ইবনে আবি শায়বা, নাসায়ী, বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান, হাকেম) হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন : দুইটি স্বভাব এমন যা কোন মুসলমানের মধ্যে থাকতে পারে না। অর্থাৎ কুপণতা ও দুচরিত্রতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, বুখারী ফিল আদাব) কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কথা বাদ

দিলে পৃথিবীতে জাতি হিসেবে মুসলমানরা আজও সবচেয়ে বেশী দানশীল ও উদারমনা। সংকীর্ণমন্যতা ও কুপণতার দিক দিয়ে যেসব জাতি পৃথিবীতে নজিরবিহীন সেই সব জাতির কোটি কোটি মুসলমান তাদের স্বগোষ্ঠীয় অমুসলিমদের পাশাপাশি বসবাস করছে। হৃদয়-মনের ঔদার্য ও সংকীর্ণতার দিক দিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তা ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অবদান। এ ছাড়া তার অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। এ শিক্ষাই মুসলমানদের হৃদয়-মনকে বড় করে দিয়েছে।

২০. এ পর্যন্ত যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তাতে চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'ফাই'-এর সম্পদে আল্লাহ, রসূল, রসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, মুহাজির, আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত জনালাভকারী সমস্ত মুসলমানের অধিকার আছে। এটি কুরআন মজীদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সিদ্ধান্ত যার আলোকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক, শাম ও মিসরের বিজিত এলাকাসমূহের ভূমি ও অর্থ-সম্পদ এবং ঐ সব দেশের পূর্বতন সরকার ও তার শাসকদের বিষয়-সম্পদের নতুনভাবে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব অঞ্চল বিজিত হলে হযরত যুযায়ের, হযরত বেলাল, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং হযরত সালমান ফারসী সহ বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক সাহাবী অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন যে, যেসব সৈন্য নড়াই করে এসব এলাকা জয় করেছে এসব তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। তাঁদের ধারণা ছিল এসব সম্পদ **فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ** এর সংজ্ঞায় পড়ে না। বরং মুসলমানরা তাদের ঘোড়া এবং উট পরিচালনা করে এসব করায়ত্ত করেছে। তাই যেসব শহর ও অঞ্চল যুদ্ধ ছাড়াই বশ্যতা স্বীকার করেছে সেইগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বিজিত অঞ্চল গনীমাতের সংজ্ঞায় পড়ে। আর তার শরয়ী বিধান হলো, ঐ সব অঞ্চলের ভূমি ও অধিবাসীদের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে এবং অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। কিন্তু এই মতটি সঠিক ছিল না। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে যুদ্ধ করে যেসব এলাকা দখল করা হয়েছিলো তিনি তার কোনটিরই ভূমি ও বাসিন্দাদের থেকে গনীমাতের মত এক-পঞ্চমাংশ বের করে রেখে অবশিষ্টাংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন না। তাঁর যুগের দু'টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, মক্কা ও খায়বার বিজয়। এর মধ্যে পবিত্র মক্কাকে তিনি অবিকল তার বাসিন্দাদের কাছে কিরিয়ে দিলেন। এরপর থাকলো খায়বারের বিষয়টি। এ সম্পর্কে হযরত বুশাইর ইয়াসার বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) খায়বারকে ৩৬টি অংশে ভাগ করলেন। তার মধ্য থেকে ১৮ অংশ সামগ্রিক ও সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখে অবশিষ্ট ১৮ অংশ সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (আবু দাউদ, বায়হাকী, কিতাবুল আমওয়াল-আবু উবায়দ; কিতাবুল খারাজ-ইয়াহইয়া ইবনে আদম; ফুতুহুল বুলদান-বাল্যুরী; ফাতহুল কাদীর-ইবনে হমাম) হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছিলো যে, যুদ্ধ করে জয় করা হলেও বিজিত ভূমির বিধান গনীমাতের বিধানের মত নয়। তা না হলে পবিত্র মক্কাকে পুরোপুরি তার অধিবাসীদের কাছে ফেরত দেয়া এবং খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পরিবর্তে তার পুরা অর্ধেকটা অংশ সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বায়তুলমালে নিয়ে নেয়া কি করে সম্ভব হলো? অতএব, সূরাত তথা রসূলের কাজকর্ম দ্বারা যা প্রমাণিত তাহলো, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলসমূহের

ব্যাপারে পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও এখতিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের আছে। তিনি তা বটনও করতে পারেন, আর পবিত্র মক্কার মত কোন অস্বাভাবিক প্রকৃতির এলাকা যদি হয় তাহলে তিনি সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি ইহসানও করতে পারেন, নবী (সা) যেমনটি মক্কাবাসীদের প্রতি করেছিলেন।

কিন্তু নবীর (সা) যুগে যেহেতু ব্যাপক এলাকা বিজিত হয়নি এবং বিভিন্ন প্রকারের বিজিত অঞ্চলের আলাদা আলাদা বিধান সুস্পষ্টভাবে লোকের সামনে আসেনি। তাই হযরত উমরের (রা) যুগে বড় বড় দেশ ও অঞ্চল বিজিত হলে সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ সমস্যা দেখা দিলো যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত এসব অঞ্চল গণীমাত হিসেবে গণ্য হবে না 'ফায়' হিসেবে গণ্য হবে? মিসর বিজয়ের পর হযরত যুবায়ের দাবী করলেন যে,

اقْسِمُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ-

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে খায়বর এলাকা বটন করে দিয়েছিলেন অনুরূপ এই গোটা অঞ্চল ভাগ করে দিন।” (আবু উবায়দ)

শাম ও ইরাকের বিজিত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে হযরত বেলাল (রা) জোর দিয়ে বললেন যে,

اقْسِمِ الْأَرْضَيْنِ بَيْنَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهُمَا كَمَا تَقْسِمُ غَنِيمَةَ الْعَسْكَرِ

“যেভাবে গণীমাতের সম্পদ ভাগ করা হয় ঠিক সেভাবে সমস্ত বিজিত ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে ভাগ করে দিন।” (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ)

অপর দিকে হযরত আলীর (রা) মত ছিল এই যে,

نَعْمُ يَكُونُوا مَادَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ

“এসব ভূমি এর চামাবাদকারীদের কাছে থাকতে দিন যেন তা মুসলমানদের আয়ের একটা উৎস হয়ে থাকে”। (আবু ইউসুফ, আবু উবায়দ)

অনুরূপ হযরত মু'য়ায ইবনে জাবালের মত ছিল এই যে, আপনি যদি এসব বটন করে দেন তাহলে তার পরিণাম খুবই খারাপ হবে। এ বটনের ফলে বড় বড় সম্পদ ও সম্পত্তি মুষ্টিমেয় কিছু লোকের করায়ত্ত হয়ে পড়বে যারা এসব অঞ্চল জয় করেছে। পরে এসব লোক দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে আর তাদের বিষয়—সম্পদ তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছেই থেকে যাবে। অনেক সময় হয়তো একজন মাত্র নারী বা পুরুষ হবে এই উত্তরাধিকারী। কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য কিছুই থাকবে না। তাই আপনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের সংরক্ষণ সমানভাবে হতে পারে (আবু উবায়দ, পৃষ্ঠা—৫৯; ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা—১৩৮)। গোটা ইরাক বটন করে দিলে মাথাপিছু কি পরিমাণ অংশ হয় হযরত উমর (রা) তা হিসেব করে দেখলেন। তিনি জানতে পারলেন, গড়ে মাথাপিছু দুই তিন ফাল্লাহ করে পড়ে, (আবু

ইউসুফ, আবু উবায়দ) অতপর তিনি দ্বিধাহীন চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ঐ সব এলাকা বন্টিত না হওয়া উচিত। সুতরাং বন্টনের দাবীদার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে তিনি যেসব জওয়াব দিয়েছিলেন তাহলো :

تَرِيْتُونَ اَنْ يَّاتِيْ اٰخِرُ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ (ابو عبید)

“আপনারা কি চান, পরবর্তী লোকদের জন্য কিছুই না থাক?”

فَكَيْفَ يَمُنُّ يَّاتِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَجِدُوْنَ الْاَرْضَ بِعِلْمٍ جِهَا قَدْ اُقْتَسِمَتْ وَوَرِثَتْ عَنِ الْاَبَاءِ وَحِيْرَتْ ؟ مَا هَذَا بِرَأْيِيْ (ابو يوسف)

“পরবর্তীকালের মুসলমানদের কি উপায় হবে? তারা এসে দেখবে ভূমি কৃষকসহ আগে থেকেই বন্টিত হয়ে আছে এবং মানুষ বাপ-দাদার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তা ভোগ দখল করছে? তা কখনো হতে পারে না।”

فَمَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَآخَافَ اِنْ قَسَمْتَهُ اِنْ تَفَاسَدُوْا بَيْنَكُمْ فِي الْمِيَاهِ (ابو عبید)

“তোমাদের পরে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য কি থাকবে? তাছাড়া আমার আশংকা হয় যদি আমি এসব বন্টন করে দেই তাহলে পানি নিয়ে তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে।”

لَوْ لَا اٰخِرُ النَّاسِ مَا فَتَحَتْ قَرْيَةً اِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ (بخارى ، مؤطا ، ابو عبید)

“পরবর্তী লোকদের চিন্তা যদি না হতো তাহলে যে জনপদই আমি জয় করতাম তা ঠিক সেভাবে বন্টন করতাম যেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার বন্টন করেছিলেন।”

لَا هَذَا عَيْنُ الْمَالِ وَلَكِنِّيْ اُحِبُّسَهُ فَيُؤْمَرُ بِجُرْيٍ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ (ابو عبید)

“না, এটাই তো মূল সম্পদ (Real estate) আমি তা ধরে রাখবো যাতে তা দিয়ে বিজয়ী সৈনিক ও সাধারণভাবে মুসলমানদের সবার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে।”

কিন্তু এসব জওয়াব শুনেও লোকজন সন্তুষ্ট হলো না। তারা বলতে শুরু করলো যে, আপনি জুলুম করছেন। অবশেষে হযরত উমর (রা) মজলিসে শুরার অধিবেশন ডাকলেন এবং তাদের সামনে এ বিষয়টি পেশ করলেন। এই সময় তিনি যে ভাষণ দান করেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

আমি আপনাদেরকে শুধু এ জন্য কষ্ট দিয়েছি যে, আপনাদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার যে দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে সেই আমানত রক্ষা করার ব্যবস্থাপনায় আমার সাথে আপনারাও শরীক হবেন। আমি আপনাদেরই একজন। আর আপনারা সেই সব ব্যক্তি যারা আজ সত্যকে মেনে চলছেন। আপনাদের মধ্য থেকে যার ইচ্ছা আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করবেন। আর যার ইচ্ছা আমার সাথে হিমত পোষণ করবেন। আমি চাই না, আপনারা আমার ইচ্ছার অনুসরণ করেন। আপনাদের কাছে ন্যায় ও সত্য বিধানদাতা আল্লাহর কিতাব রয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি যদি কোন কিছু করার জন্য কোন কথা বলে থাকি তাহলে সে ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আপনারা তাদের কথা শুনেছেন যাদের ধারণা হলো আমি তাদের প্রতি জুলুম করছি এবং তাদের হক নষ্ট করতে চাচ্ছি। অথচ কারো প্রতি জুলুম করা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি। যা তাদের জুলুম করে আমি যদি তা তাদের না দিয়ে অন্য কাউকে দেই তাহলে সত্যি সত্যিই আমি বড় হতভাগ্য। আমি দেখতে পাচ্ছি কিসরার দেশ ছাড়া বিজিত হওয়ার মত আর কোন অঞ্চল এখন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরানীদের ধন-সম্পদ, তাদের ভূমি এবং কৃষক সবই আমাদের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। আমাদের সৈনিকরা যেসব গনীমাত লাভ করেছিল তার এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে আমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি। আর গনীমাতের যেসব সম্পদ এখনো বন্টিত হয়নি আমি সেগুলোও বন্টন করার চিন্তা-ভাবনা করছি। তবে ভূমি সম্পর্কে আমার মত হলো, ভূমি ও এর চাষাবাদকারীদের বন্টন করবো না। বরং ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমি-রাজস্ব এবং কৃষকদের ওপর জিমিয়া আরোপ করবো। তারা সবসময় এগুলো দিতে থাকবে। এই অর্থ বর্তমানকালের সব মুসলমান, যুদ্ধরত সৈনিক, মুসলমানদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য 'ফাই' হিসেবে গণ্য হবে। আপনারা কি দেখছেন না আমাদের সীমান্তসমূহ রক্ষার জন্য লোকের অপরিহার্য প্রয়োজন? আপনারা কি দেখছেন না, এসব বড় বড় দেশ—সিরিয়া, আলজিরিয়া, কুফা, বসরা, মিসর এসব স্থানে সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকা দরকার এবং নিয়মিতভাবে তাদের বেতনও দেয়া দরকার? চাষাবাদকারী সহ এসব ভূমি যদি আমি বন্টন করে দেই তাহলে এসব খাতে ব্যয়ের অর্থ কোথা থেকে আসবে?

দুই তিন দিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা ও যুক্তি-তর্ক চলতে থাকলো। হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হযরত উমরের (রা) মত সমর্থন করলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌছা গেল না। অবশেষে হযরত উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : আমি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি দলীল পেয়ে গিয়েছি যা এ সমস্যার সমাধান দেবে। এরপর তিনি সূরা হাশরের এই আয়াত কয়টি অর্থাৎ **مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْهُمْ** থেকে **رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ** পর্যন্ত পড়লেন এবং তা থেকে এ দলীল পেশ করলেন যে, আল্লাহর দেয়া এসব সম্পদে শুধু এ যুগের লোকদেরই অংশ ও অধিকার বর্তায় না। বরং তাদের সাথে আল্লাহ পরবর্তীকালের লোকদেরও শরীক করেছেন। তাই 'ফাই'য়ের যে সম্পদ সবার জন্য; পরবর্তীকালের লোকদের জন্য তার কিছুই না রেখে সবই কেবল এসব বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে আমি বন্টন করে দেব, তা কি করে সঠিক হতে পারে? তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : **كَيْ لَا يَكُونَ نُوَالٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ** "যাতে এ সব

সম্পদ শুধু তোমাদের বিস্তারনের মধ্যে আবর্তিত হতে না থাকে।” কিন্তু আমি যদি কেবল বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যেই তা বন্টন করে দেই তাহলে তা তোমাদের বিস্তারনের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে, অন্যদের জন্য কিছুই থাকবে না। এই যুক্তি ও প্রমাণ সবাইকে সন্তুষ্ট করলো, আর এ বিষয়ে ‘ইজমা’ বা একমত্য হয়ে গেল যে, বিজিত গোটা এলাকা সকল মুসলমানের স্বার্থে ‘ফাই’ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। যেসব লোক এখানে কাজ করেছে তাদের হাতেই এসব ভূমি থাকতে দেয়া হবে এবং তার ওপর ভূমি রাজস্ব ও জিযিয়া আরোপ করতে হবে। (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৩ থেকে ২৭ ও ৩৫; আহকামুল কুরআন—জাসসাস)

এ’ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজিত ভূমির প্রকৃত যে মর্যাদা স্থিরকৃত হলো তা হচ্ছে, সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম মিল্লাত হবে এর মালিক, আগে থেকেই যারা এসব ভূমিতে কাজ করে আসছে মুসলিম মিল্লাত তার নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে চাষাবাদকারী হিসেবে বহাল রেখেছে, এসব ভূমি বাবদ তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট একটা হারে খাজনা বা ভূমি রাজস্ব দিতে থাকবে, চাষাবাদের এই অধিকার বংশানুক্রমিকভাবে তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হতে থাকবে এবং এ অধিকার তারা বিক্রি করতেও পারবে। কিন্তু তারা ভূমির প্রকৃত মালিক হবে না, এর প্রকৃত মালিক হবে মুসলিম মিল্লাত। ইমাম আবু উবায়দ, তাঁর আল আমওয়াল গ্রন্থে আইনগত এই মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

أَقْرَأَ أَهْلَ السَّوَادِ فِي أَرْضِيهِمْ وَضَرَبَ عَلَى رُؤُسِهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى
أَرْضِيهِمُ الطَّسُقَ (ص - ৫৭)

“হযরত উমর (রা) ইরাকবাসীদের তাদের কৃষি ভূমিতে বহাল রাখলেন, তাদের সবার ওপর মাথা পিছু জিযিয়া আরোপ করলেন এবং ভূমির ওপর ট্যাক্স ধার্য করলেন।”

فَإِذَا أَقْرَأَ الْأَمَامُ أَهْلَ الْعَنْوَةِ فِي أَرْضِهِمْ تَوَارَثُوهَا وَتَبَا يَعُوهَا (ص - ৪৫)

“ইমাম (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান) বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের যদি তাদের কৃষি ভূমিতে বহাল রাখেন তাহলে তারা ঐ সব ভূমি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর করতে এবং বিক্রি করতে পারবে।”

উমর ইবনে আবদুল আযীযের আমলে শা’বীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, ইরাকের অধিবাসীদের সাথে কোন চুক্তি আছে কি? তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে, চুক্তি নেই। তবে তাদের নিকট থেকে যখন ভূমি রাজস্ব গ্রহণ করা হয়েছে তখন তা চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে (আবু উবায়দ, পৃষ্ঠা ৪৯; আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৮)।

হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে উৎবা ইবনে ফারকাদ ফোরাতে নদীর তীরে একখণ্ড জমি কিনলেন। হযরত উমর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি এ জমি কার নিকট থেকে কিনেছো? তিনি বললেন : জমির মালিকের নিকট থেকে। হযরত উমর (রা) বললেন : তার মালিক তো এসব লোক (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার)।

رَأَى عَمْرَآنَ أَصَلَ الْأَرْضِ لِلْمُسْلِمِينَ হয়রত উমরের (রা) অভিমত ছিল এই যে, ঐ সব ভূমির প্রকৃত মালিক মুসলমানগণ— (আবু উবায়দ, পৃষ্ঠা ৭৪)

এ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজিত দেশসমূহের যেসব সম্পদ মুসলমানদের সমষ্টিগত মালিকানা বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো তা নীচে উল্লেখ করা হলো :

(১) কোন সন্ধিচুক্তির ফলে যেসব ভূমি ও অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তগত হবে।

(২) যুদ্ধ ছাড়াই কোন এলাকার লোক মুসলমানদের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে যে মুক্তিপণ (فدية), ভূমি রাজস্ব (خراج) এবং জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হবে।

(৩) যেসব জমি ও সম্পদের মালিক তা ফেলে পালিয়ে গিয়েছে।

(৪) যেসব সম্পদের মালিক মারা গেছে বা যেসব সম্পদের কোন মালিক নেই।

(৫) যেসব ভূমি পূর্বে কারো অধিকারে ছিল না।

(৬) যেসব ভূমি আগে থেকে মানুষের অধিকারে ছিল। কিন্তু তার সাবেক মালিকদেরকেই বহাল রেখে তাদের ওপর জিযিয়া ও ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করা হয়েছে।

(৭) পূর্ববর্তী শাসক পরিবারসমূহের জায়গীরসমূহ।

(৮) পূর্ববর্তী সরকারসমূহের মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তি। —বিস্তারিত জ্ঞানার জন্য দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৮; কিতাবুল খারাজ-ইয়াহইয়া ইবনে আদম, পৃষ্ঠা ২২-৬৪, মুগনিউল মুহতাজ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩; হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ শারহিল কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০; গায়াতুল মুনতাহা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৭-৪৭১।

এসব জিনিস যেহেতু সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 'ফাই' বলে ঘোষিত হয়েছিলো, তাই একে 'ফাই' বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে ও ইসলামের ফিকাহবিদদের মধ্যে নীতিগত ঐক্য বিদ্যমান। তবে কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য আছে। আমরা ঐগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নীচে বর্ণনা করলাম।

হানাফীগণ বলেন : বিজিত দেশ ও অঞ্চলসমূহের ভূমির ব্যাপারে ইসলামী সরকারের (ফিকাহবিদদের পরিভাষায় ইমাম) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার আছে। তিনি ইচ্ছা করলে এর মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখে অবশিষ্ট সবটা বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন। কিংবা পূর্ববর্তী মালিকদের অধিকারে রেখে দেবেন, আর তার মালিকদের ওপরে জিযিয়া এবং ভূমির ওপরে খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করবেন। এ অবস্থায় এসব সম্পদ মুসলমানদের জন্য স্থায়ী ওয়াকফ সম্পদ বলে গণ্য হবে। (বাদায়েউস সানায়ে, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস, শারহুল এনায়া আলাল হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম সুফিয়ান সাওরী থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক এ মতটিই উদ্ধৃত করেছেন। (ইয়াহইয়া ইবনে আদম; কিতাবুল আমওয়াল—আবু উবায়দ)

মালেকীগণ বলেন : মুসলমানদের শুধু দখল করে নেয়ার কারণেই এসব ভূমি আপনা-আপনি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হয়ে যায়। তা ওয়াকফ করার জন্য ইমামের

সিদ্ধান্ত বা মুজাহিদদের রাজি করার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া মালেকীগণের সর্বজন পরিজ্ঞাত মত হলো, বিজিত এলাকার শুধু ভূমিই নয়, বরং ঘরবাড়ী, দালানকোঠাও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ। তবে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার ঐগুলোর জন্য ভাড়া ধার্য করবে না। (হাশিয়াতুদ দূস্কী)

হাশলী মযহাবের অনুসারীগণ এতটুকু বিষয়ে হানাফীদের সাথে একমত যে, ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করা কিংবা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেয়া ইমামের ইখতিয়ারাধীন। তারা মালেকীদের সংগে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, বিজিত অঞ্চলসমূহের ঘরবাড়ী ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হলেও তার ওপর ভাড়া ধার্য করা হবে না। (গায়াতুল মুনতাহা—হাশলী মযহাবের যেসব মত ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে ফতোয়া দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থখানি তারই সমষ্টি। দশম শতাব্দী থেকে এ মযহাবের সমস্ত ফতোয়া এ গ্রন্থ অনুসারেই দেয়া হয়ে থাকে।)।

শাফেয়ী মযহাবের মত হলো : বিজিত অঞ্চলের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি গনীমাত এবং সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি ও ঘরবাড়ী) 'ফাই' হিসেবে গণ্য করা হবে। (মুগনিউল মুহতাজ)

কোন কোন ফিকাহবিদ বলেন : ইমাম যদি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত দেশের বা অঞ্চলের ভূমি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করতে চান তাহলে তাঁকে অবশ্যই বিজয়ী সৈনিকদের সম্মতি নিতে হবে। এর সপক্ষে তারা এ দলীল পেশ করেন, ইরাক জয়ের পূর্বে হযরত উমর (রা) জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাহালীকে এ মর্মে ওয়াদা করেছিলেন যে, বিজিত অঞ্চলের এক-চতুর্থাংশ তাঁকে দেয়া হবে। কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর এক-চতুর্থাংশ লোক ছিল জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাহালীর গোত্রের লোক। সুতরাং ২-৩ বছর পর্যন্ত এ অংশ তাঁর কাছেই ছিল। পরে হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন :

لَوْلَا اِنِّي قَاسِمٌ مَسْنُوْلٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا جَعَلَ لَكُمْ وَاَرَى النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا فَارِئُ اَنْ تَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ -

“বন্টনের ব্যাপারে আমি যদি দায়িত্বশীল না হতাম এবং আমাকে জবাবদিহি করতে না হতো তাহলে তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তোমাদের কাছেই থাকতে দেয়া হতো। কিন্তু এখন আমি দেখছি লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমার মত হলো তোমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে তা ফিরিয়ে দাও।”

হযরত জারীর (রা) তাঁর এ কথা মেনে নিলেন। এ কারণে হযরত উমর (রা) তাঁকে পুরস্কার হিসেবে ৮০ দিনার প্রদান করলেন। (কিতাবুল খ্যারাজ—আবু ইউসুফ; কিতাবুল আমওয়াল—আবু উবায়দ)। এ ঘটনা দ্বারা তারা প্রমাণ দেন যে, হযরত উমর বিজয়ী সৈন্যদের সম্মত করার পর বিজিত অঞ্চলসমূহ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ফিকাহবিদদের অধিকাংশই এ যুক্তি মেনে নেননি। কারণ সকল বিজিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে সমস্ত বিজয়ী সৈনিকদের নিকট থেকে এ ধরনের কোন সম্মতি নেয়া হয়নি। আর কেবল হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহর সাথে এ আচরণ করা হয়েছিল

শুধু এ কারণে যে, বিজয়ের পূর্বে বিজিত ভূমি সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বে হযরত উমর (রা) তাঁর সাথে এ মর্মে একটি অঙ্গীকার করে ফেলেছিলেন। সেই অঙ্গীকার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যই তাঁকে তাঁর সম্মতি নিতে হয়েছিল। তাই এটাকে কোন ব্যাপকভিত্তিক আইন হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

ফিকাহবিদদের আরেকটি গোষ্ঠী বলেন : ওয়াকফ ঘোষণা করার পরও বিজিত এ সব ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে যে কোন সময় বন্টন করে দেয়ার ইখতিয়ার সরকারের থেকে যায়। এর সপক্ষে তারা যে রেওয়াজাত থেকে দলীল পেশ করেন তাহলো, একবার হযরত আলী (রা) লোকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন :

لَوْلَا أَنِّي ضَرَبْتُ بَعْضَكُمْ وَجْهَهُ لَقَسَمْتُ السَّوَادَ بَيْنَكُمْ

“যদি আমি এ আশংকা না করতাম যে, তোমরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হবে তাহলে এসব প্রত্যস্ত অঞ্চল আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম।” (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ; কিতাবুল আমওয়াল— আবু উবায়দেদ)।

কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহবিদ এমতটিও গ্রহণ করেননি। বরং তাদের সর্বসম্মত মত হলো, জিয়িয়া ও খারাজ ধার্য করে বিজিত এলাকার ভূমি একবার যদি উক্ত এলাকার অধিবাসীদের অধিকারেই রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায় না। এরপর থাকে হযরত আলীর (রা) সাথে সম্পর্কিত কথাটি। এ সম্পর্কে আবু বকর জাসাসাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, ঐ রেওয়াজাত সঠিক নয়।

২১. ‘ফাই’—এর সম্পদ উপস্থিত ও বর্তমান কালের বিদ্যমান মুসলমানদেরই কেবল নয়, বরং অনাগত কালের মুসলমান এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অংশ আছে। এ আয়াতের মূল বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য এ বিষয়টি তুলে ধরা হলেও একই সাথে এর মধ্যে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। তাহলো, কোন মুসলমানের মনে অপর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না থাকা উচিত। আর মুসলমানদের জন্য সঠিক জীবনাচার হলো, তারা তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান ভাইদের লা’নত বা অভিশাপ দেবে না কিংবা তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলবে না। বরং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে থাকবে। যে বন্ধন মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্কিত করেছে তাহলো ঈমানের বন্ধন। কোন ব্যক্তির অন্তরে অন্য সব জিনিসের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব যদি অধিক হয় তাহলে যারা ঈমানের বন্ধনের তিষ্ঠিতে তার ভাই, সে অনিবার্যভাবেই তাদের কল্যাণকামী হবে। তাদের জন্য অকল্যাণ, হিংসা-বিদ্বেষ এবং ঘৃণা কেবল তখনই তার অন্তরে স্থান পেতে পারে যখন ঈমানের মূল্য ও মর্যাদা তার দৃষ্টিতে কমে যাবে এবং অন্য কোন জিনিসকে তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করবে। ভাই ঈমানের সরাসরি দাবী, একজন মু’মিনের অন্তরে অন্য কোন মু’মিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। নাসায়ী কর্তৃক হযরত আনাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এ ক্ষেত্রে উত্তম শিক্ষা লাভ করা যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন, এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে একাধারে তিন দিন একটি ঘটনা ঘটতে থাকলো। রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন : এখন তোমাদের সামনে এমন এক ব্যক্তির আগমন

হবে যে জালাত্তের অধিবাসী। আর প্রত্যেকবারই আনসারদের কোন একজন হতেন সেই আপদ্রুক। এতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিল যে, তিনি এমন কি কাজ করেন যার ভিত্তিতে নবী (সা) তাঁর সম্পর্কে বারবার এই সুসংবাদ দান করলেন। সুতরাং তার ইবাদাতের অবস্থা দেখার জন্য একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে তিনি পরপর তিন দিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে রাত কাটাতে থাকলেন। কিন্তু রাতের বেলা তিনি কোন প্রকার অস্বাভাবিক কাজ-কর্ম দেখতে পেলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : ভাই, আপনি এমন কি কাজ করেন, যে কারণে আমরা নবীর (সা) মুখে আপনার সম্পর্কে এই বিরাট সুসংবাদ শুনেছি। তিনি বললেন : আমার ইবাদাত-বন্দগীর অবস্থা তো আপনি দেখেছেন। তবে একটি বিষয় হয়তো এর কারণ হতে পারে। আর তা হলো,

لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي غَلًّا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَحْسَدُهُ عَلَى خَيْرٍ
أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى آيَةً -

“আমি আমার মনের মধ্যে কোন মুসলমানের জন্য বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং মহান আল্লাহ তাকে যে কল্যাণ দান করেছেন সে জন্য তাকে হিংসাও করি না।”

তবে এর মানে এ নয় যে, কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের কথা ও কাজে যদি কোন ত্রুটি দেখতে পান তাহলে তাকে তিনি ত্রুটি বলবেন না। কোন ইমানদার ভুল করলেও সেটাকে ভুল না বলে শুদ্ধ বলতে হবে কিংবা তার ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত বলা যাবে না, ইমানের দাবী কখনো তা নয়। কিন্তু কোন জিনিসকে প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল বলা এবং ভদ্রতা রক্ষা করে তা প্রকাশ করা এক কথা আর শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা করা এবং গালমন্দ করা আরেক কথা। সমসাময়িক জীবিত লোকদের বেলায়ও এরূপ আচরণ করা হলে তা একটি বড় অন্যায়া। কিন্তু পূর্বের মৃত লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করলে তা আরো বড় অন্যায়া। কারণ, এরূপ মন ও মানসিকতা এমনই নোংরা যে, তা মৃতদেরও ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। এর চেয়েও বড় অন্যায়া হলো, সেই সব মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কটুক্তি করা যারা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের হক আদায় করেছিলেন এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে পৃথিবীতে ইসলামের আলোর বিস্তার ঘটিয়েছিলেন যার বদৌলতে আজ আমরা ইমানের নিয়ামত লাভ করেছি। তাদের মাঝে যেসব মতানৈক্য হয়েছে সে ক্ষেত্রে কেউ যদি এক পক্ষকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে এবং অপর পক্ষের ভূমিকা তার মতে সঠিক না হয় তাহলে সে এরূপ মত পোষণ করতে পারে এবং যুক্তির সীমার মধ্যে থেকে তা প্রকাশ করতে বা বলতেও পারে। কিন্তু এক পক্ষের সমর্থনে এতটা বাড়াবাড়ি করা যে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং কথা ও লেখনীর মাধ্যমে গালি দিতে ও নিন্দাবাদ ছড়াতে থাকার এটা এমন একটা আচরণ যা কোন আল্লাহভীরু মানুষের দ্বারা হতে পারে না। কুরআনের স্পষ্ট শিক্ষার পরিপন্থী এ আচরণ যারা করে তারা তাদের এ আচরণের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে যে, কুরআন মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধ করে। কিন্তু আমরা যাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করি তারা মু'মিন

নয়, বরং মুনাফিক। কিন্তু যে গোনাহর সপক্ষে সাফাই ও গুণর হিসেবে এ অপবাদ পেশ করা হয়ে থাকে তা ঐ গোনাহর চেয়েও জঘন্য। কুরআন মজীদে এর আয়াতগুলোই তাদের এ অপবাদ খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যানের জন্য যথেষ্ট। কারণ এ আয়াতগুলোর বর্ণনাধারার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীকালের মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ববর্তী ইমানদারদের সাথে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না রাখতে এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এসব আয়াতে পর পর তিন শ্রেণীর লোককে 'ফাই'-এর সম্পদ লাভের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম মুহাজির, দ্বিতীয় আনসার এবং তৃতীয় তাদের পরবর্তীকালের মুসলমান। তাদের পরবর্তী কালের মুসলমানদের বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্বে যেসব লোক ইমান আনার ব্যাপারে অগ্রগামী তোমরা তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। একথা সবারই জানা যে, অগ্র-পশ্চাত বিবেচনায় ইমান গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রগামী বলতে এখানে মুহাজির ও আনসার ছাড়া আর কেউ-ই হতে পারে না। তাছাড়া মুনাফিক কারা সে সম্পর্কে এই সূরা হাশরেরই ১১ থেকে ১৭ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুনাফিক তারাই যারা বনী নায়ীর যুদ্ধের সময় ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে উৎসাহিত করেছিলো। আর মু'মিন তারা যারা এ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিল। যে মুসলমানের মনে এক বিন্দু আল্লাহভীতি আছে এরপরও কি সে ঐ সব ব্যক্তির ইমানকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারে, আল্লাহ নিজে যাদের ইমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন?

এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যারা সম্মানিত সাহাবীদের গালমন্দ ও নিন্দাবাদ করে 'ফাই' সম্পদে তাদের কোন অংশ নেই। (আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী, গায়াতুল মুনতাহা) কিন্তু হানাফী ও শাফেয়ীগণ এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোককে ফাই-এর সম্পদ লাভের অধিকারী ঘোষণা করেছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসব গুণের কোনটিকেই পূর্বশর্ত হিসেবে পেশ করেননি যে, সেই শ্রেণীর মধ্যে ঐ বিশেষ শর্তটি বর্তমান থাকলেই কেবল তাদেরকে অংশ দেয়া যাবে, অন্যথায় দেয়া যাবে না। মুহাজিরদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা আল্লাহর করুণা ও সবুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। তার অর্থ এ নয় যে, যে মুহাজিরের মধ্যে এই গুণটি নেই সে 'ফাই'-এর অংশ লাভের অধিকারী নয়। আনসারদের সম্পর্কে বলেছেন : "তারা মুহাজিরদের ভালবাসে। মুহাজিরদের যাই দেয়া হোক না কেন অভাবী হয়েও তারা সে জন্য মনের মধ্যে কোন চাহিদা অনুভব করে না।" এরও অর্থ এটা নয় যে, যেসব আনসার মুহাজিরদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে না এবং মুহাজিরদের যা কিছু দেয়া হয় তারা তা পেতে আগ্রহী 'ফাই'-এর সম্পদে এমন মুহাজিরদের কোন অংশ নেই। অতএব তৃতীয় শ্রেণীর এই গুণটি অর্থাৎ তাদের পূর্বে ইমান গ্রহণকারীদের মাগফিরাতের জন্য তারা দোয়া করে, আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, তাদের হৃদয়-মনে যেন কোন ইমানদারদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না থাকে এটাও 'ফাই'-এর হকদার হওয়ার কোন পূর্বশর্ত নয়। বরং এটা একটা ভাল গুণের বর্ণনা এবং অন্য সব ইমানদার ও পূর্ববর্তী ইমানদারদের সাথে তাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটি শিক্ষাদান।

الْمُرْتَدِّ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا
وَإِنْ قُوَّتُمْ لِتَمُرُّنَا نَكُرُّهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لَئِنْ أُخْرِجُوا
لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۝ وَلَئِنْ قُوَّتُمْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۝ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ
لَيَكُونَنَّ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۝

২ রুকু'

তোমরা^{২২} কি সেই সব লোকদের দেখনি যারা মুনাফিকীর আচরণ গ্রহণ করেছে? তারা তাদের কাকের আহলে কিতাব ভাইদের বলে : যদি তোমাদের বহিকার করা হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। তোমাদের ব্যাপারে কারো কথাই আমরা শুনবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা পাকা মিথ্যাবাদী। যদি তাদেরকে বহিকার করা হয় তাহলে এরা তাদের সাথে কখনো বেরিয়ে যাবে না। আর যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে তারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। আর যদি সাহায্য করেও তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতপর কোনখান থেকে কোন সাহায্য তারা পাবে না।

২২. পুরো এই রুকু'র আয়াতসমূহের বাচনভঙ্গি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় বনু নাযীরকে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দশদিন সময় দিয়ে নোটিশ দিয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ শুরু হতে এখনো কয়েকদিন দেরী ছিল সেই সময় এ রুকু'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো। আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাযীরকে এই নোটিশ দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং মদীনার অন্যান্য মুনাফিক নেতারা তাদের বলে পাঠালো যে, আমরা দুই হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করার জন্য আসবো। আর বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। অতএব তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও এবং কোন অবস্থায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো না। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আর তোমরা এখান থেকে বহিকৃত হলে আমরাও চলে যাব। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। তাই নাযিল হওয়ার পরস্পরার দিক দিয়ে এ রুকু'টা প্রথমে নাযিল হয়েছে। আর বনী নাযীরকে মদীনা থেকে বহিকার করার পর প্রথম রুকু'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তবে কুরআন মজীদে সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে প্রথম রুকু'

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوَّلًا لَا
يَفْقَهُونَ ۖ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مَحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَاءِ
جُدُرٍ بِأَسْمَرٍ بَيْنَهُمْ شِدَادٌ تَحَسُّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى
ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوَّلًا لَا يَعْقِلُونَ ۚ كَذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا
ذَاتُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তাদের মনে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশী।^{২৩} কারণ, তারা এমন লোক
যাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই।^{২৪} এরা একত্রিত হয়ে (খোলা ময়দানে) কখনো
তোমাদের মোকাবিলা করবে না। লড়াই করলেও দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত জনপদে বা
প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে করবে। তাদের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক কৌন্দল
অত্যন্ত কঠিন। তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে কর। কিন্তু তাদের মন পরস্পর থেকে
বিচ্ছিন্ন।^{২৫} তাদের এ অবস্থার কারণ হলো তারা জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন। এরা তাদের
কিছুকাল পূর্বের সেই সব লোকের মত যারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ
করেছে।^{২৬} তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

আগে এবং দ্বিতীয় রুকু' পরে রাখার কারণ হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথম
রুকু'তে বর্ণিত হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ তারা যে তোমাদের মোকাবেলায় প্রকাশ্যে ময়দানে নামছে না তার কারণ
এ নয় যে, তারা মুসলমান, তাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে এবং এরূপ কোন আশংকাও
তাদের মনে আছে যে, ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও তারা যদি ঈমানদারদের বিরুদ্ধে
কাফেরদের সাহায্য করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে
হবে। বরং তোমাদের প্রকাশ্য মোকাবেলা করা থেকে যে জিনিস তাদের বিরত রাখে তা
হলো, ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তোমাদের ভালবাসা,
প্রাণপণ সংকল্প এবং আত্মত্যাগের স্পৃহা আর তোমাদের পারস্পরিক দৃঢ় ঐক্য দেখে
তারা সাহস হারিয়ে ফেলে। তারা ভল করেই জানে যে, তোমরা নগণ্য সংখ্যক হলেও
শাহাদাতের যে অদম্য আকাংখা তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিকে জান কবুল মুজাহিদ বানিয়ে
রেখেছে এবং যে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কারণে তোমরা একটি ইস্পাত কঠিন দল ও
সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছে তার সাথে সংঘর্ষ বাধলে ইহুদীদের সাথে তারা ধ্বংস হয়ে
যাবে। এখানে এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, কারো অন্তরে আল্লাহর ভয়ের চেয়ে অন্য
কারো ভয় অধিক থাকলে তা মূলত আল্লাহর ভয় না থাকারই নামান্তর। একথা সবারই
জানা, যে ব্যক্তি দু'টি বিপদের একটিকে লম্বু এবং অপরটিকে গুরুতর মনে করে সে

প্রথমোক্ত বিপদটির পরোয়াই করে না। দ্বিতীয় বিপদটি থেকে রক্ষা পাওয়াই তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

২৪. ছোট এই আয়াতাতংশে একটি বড় সত্য তুলে ধরা হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি জানে, মানুষের শক্তি নয়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শক্তিই ভয় করার মত। এ কারণে যেসব কাজে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহির ভয় থাকবে এ ধরনের সকল কাজ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে। এ ক্ষেত্রে জবাব চাওয়ার মত কোন মানবীয় শক্তি থাক বা না থাক তা দেখার প্রয়োজন সে মনে করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর ন্যস্ত করেছেন তা সমাধা করার জন্য সে তৎপর হয়ে উঠবে। গোটা দুনিয়ার সমস্ত শক্তি এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও সে তার পরোয়া করবে না। কিন্তু একজন বুদ্ধি-বিবেকহীন মানুষের কাছে যেহেতু আল্লাহর শক্তি অনুভূত হয় না কিন্তু মানুষের শক্তিসমূহ অনুভূত হয় তাই সমস্ত ব্যাপারে সে তার কর্মনীতি নির্ধারণ করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের শক্তির প্রতি লক্ষ রেখে। কোন কিছু থেকে দূরে থাকলে এ জন্য থাকে না যে, সে জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে। বরং এ জন্য দূরে থাকে যে, সামনেই কোন মানবীয় শক্তি তার খবর নেয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। আর কোন কাজ যদি সে করে তবে তাও এ জন্য করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা সে জন্য সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশী। বরং এ জন্য করে যে, কোন মানবীয় শক্তি তা করতে নির্দেশ দিচ্ছে কিংবা পছন্দ করছে এবং সে-ই এ-জন্য পুরস্কৃত করবে। বুঝা ও না বুঝার এই পার্থক্যই প্রকৃতপক্ষে একজন ঈমানদার ও ঈমানদারের জীবন ও কর্মকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেয়।

২৫. এখানে মুনাফিকদের দ্বিতীয় দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রথম দুর্বলতা হলো, তারা ছিল ভীরু—আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে মানুষকে ভয় করতো। ঈমানদারদের মত তাদের সামনে এমন কোন উন্নত লক্ষ ও আদর্শ ছিল না যা অর্জনের জন্য তাদের মধ্যে প্রাণপণ সৎধামে ঝাপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হতো। তাদের দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো মুনাফিকীর আচরণ ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মজবুত ও সুসংবদ্ধ দলে পরিণত করতে পারতো। যে বিষয়টি তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাহলো, নিজেদের শহরে বহিরাগত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব ও শাসন চলতে দেখে তাদের কলিজা দগ্ধ হচ্ছিলো আর স্বদেশবাসী আনসার কর্তৃক মুহাজিরদের সসম্মানে গ্রহণ করতে দেখে তাদের মন দুখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিলো। এই হিংসার কারণে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং আশেপাশের ইসলাম বৈরীদের সাথে ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশ করে এই বহিরাগত প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খতম করে দিতে চাইতো। তাদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এই নেতিবাচক উদ্দেশ্য ছাড়া কোন গঠনমূলক জিনিস ছিল না। তাদের প্রত্যেক নেতার আলাদা আলাদা দল ও উপদল ছিল। প্রত্যেকেই নিজের মাতবরী ফলাতে চাইতো। তারা কেউ কারো অকৃত্রিম বন্ধু ছিল না। প্রত্যেকের মনে অন্যদের জন্য এতটা হিংসা-বিদ্বেষ ছিল যে, নিজেদের সাধারণ শত্রুর মোকাবেলায়ও তারা নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা ভুলতে কিংবা একে অপরের মূলোৎপাটন থেকে বিরত থাকতে পারতো না।

আল্লাহ তা'আলা এভাবে বনী নাসীর যুদ্ধের পূর্বেই মুনাফিকদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করে মুসলমানদের জানিয়ে দিলেন যে, তাদের দিক থেকে বাস্তব কোন

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ
مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا
فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝

এদের উদাহরণ হলো শয়তান। সে প্রথমে মানুষকে বলে কুফরী কর। যখন মানুষ কুফরী করে বসে তখন সে বলে, আমি তোমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি তো আল্লাহ রবুল আলামীনকে ভয় পাই।^{২৭} উভয়েরই পরিণাম হবে এই যে, তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হবে। জালেমদের প্রতিফল এটাই।

বিপদের আশংকা নেই। তাই বারবার এ খবর শুনে তোমাদের ঘাবড়ে যাওয়ার আদৌ কোন কারণ নেই যে, তোমরা বনী নাযীরকে অবরোধ করার জন্য যাত্রা করলেই এই মুনাফিক নেতা দুই হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে এবং একই সংগে বনী কুরাইশ ও বনী গাতফান গোত্র দুটিকেও তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে উস্কে দেবে। এসবই লক্ষ্য রাখ মাত্র। চরম পরীক্ষা শুরু হতেই এর অন্তসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

২৬. এখানে কুরাইশ গোত্রের কাফের এবং বনী কায়নুকার ইহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য এবং সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য সত্ত্বেও এ সব দুর্বলতার কারণে মুসলমানদের সাজ-সরঞ্জামহীন মুষ্টিমেয় লোকের একটি দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

২৭. অর্থাৎ এসব মুনাফিক বনী নাযীরের সাথে সেই একই আচরণ করছে, যে আচরণ শয়তান মানুষের সাথে করে থাকে। এখন এসব মুনাফিক তাদের বলছে, তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও প্রয়োজনে আমরাও তোমাদের সাথে থাকবো। কিন্তু তারা যখন সত্যি সত্যি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন এরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের পরিণতি কি হলো তা দেখার জন্য ফিরেও তাকাবে না। শয়তান প্রত্যেক কাফেরের সাথে এ ধরনের আচরণই করে থাকে। বদর যুদ্ধে কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সাথেও সে এরূপ আচরণ করেছিল। সূরা আনফালের ৪৮ আয়াতে এর উল্লেখ আছে। প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে তাদেরকে হিম্মত ও সাহস যুগিয়ে বদর প্রান্তরে এনে হাজির করেছে এবং বলেছে: لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ (আজ কেউই তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে না। আর আমি তো তোমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী হিসেবে আছি)। কিন্তু যখন দুটো সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়েছে তখন সে একথা বলতে বলতে পালিয়েছে :

إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

৩ রুকু'

হে^{২৮} ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।^{২৯} আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক। তোমরা তাদের মত হয়ে না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।^{৩০} তারাই ফাসেক। যারা দোষখে যাবে এবং যারা জান্নাতে যাবে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতে যাবে তারাই সফলকাম।

(আমি তোমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখতে পাও না। আমি তো আল্লাহকে ভয় পাই।)

২৮. কুরআন মজীদে নিয়ম হলো, যখনই মুনাফিক মুসলমানদের মুনাফিকসুলভ আচরণের সমালোচনা করা হয় তখনই তাদেরকে নসীহতও করা হয়। যাতে তাদের যার যার মধ্যে এখনো কিছুটা বিবেক অবশিষ্ট আছে সে যেন তার এই আচরণে নজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে ঈশ্বরের সেই গহবর থেকে উঠে আসার চিন্তা করে যার মধ্যে সে প্রকৃতির দাসত্বের কারণে নিকশিত হয়েছে। এ রুকু' পুরোটাই এ ধরনের নসীহতে পরিপূর্ণ।

২৯. আগামীকাল অর্থ আখেরাত। দুনিয়ার এই গোটা জীবনকাল হলো 'আজ' এবং কিয়ামতের দিন হলো আগামীকাল যার আগমন ঘটবে আজকের এই দিনটির পরে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি তার সবকিছু ব্যয় করে ফেলে এবং কাল তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য আর মাথা গুঁজবার ঠাই থাকবে কিনা সে কথা চিন্তা করে না সেই ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বড় নির্বোধ। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিও নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে যে তার পার্থিব জীবন নির্মাণের চিন্তায় এতই বিভোর যে আখেরাত সম্পর্কে একেবারেই গাফেল হয়ে গিয়েছে। অথচ আজকের দিনটির পরে কালকের দিনটি যেমন অবশ্যই আসবে তেমনি আখেরাতও আসবে। আর দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যদি সে সেখানকার জন্য অগ্রিম কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেখানে কিছুই

لَوَإِنزِلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ
 إِلَهِهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٢﴾

আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের ওপর নাখিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে পেতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।^{১১} আমি মানুষের সামনে এসব উদাহরণ এ জন্য পেশ করি যাতে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) ভেবে দেখে।

আল্লাহই সেই^{১২} মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।^{১৩} অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন।^{১৪} তিনিই রহমান ও রহীম।^{১৫}

পাবে না। এর সাথে দ্বিতীয় জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এ আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের হিসাব পরীক্ষক বানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে ভাল এবং মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ সে অনুভব করতে পারে না যে, সে যা কিছু করছে তা তার আখেরাতের জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করছে, না ধ্বংস করছে। তার মধ্যে এই অনুভূতি যখন সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে তখন তার নিজেকেই হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে, সে তার সময়, সম্পদ, শ্রম, যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টা যে পথে ব্যয় করছে তা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করা তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। অন্যথায় সে নিজের ভবিষ্যত নিজেকে ধ্বংস করবে।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য ফল হলো নিজেকে ভুলে যাওয়া, সে কার বান্দা সে কথা যখন কেউ ভুলে যায়, তখন অনিবার্যরূপে সে দুনিয়ায় তার একটা ভুল অবস্থান ঠিক করে নেয়। এই মৌলিক ভ্রান্তির কারণে তার গোটা জীবনই ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে সে যখন একথা ভুলে যায় যে, সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় তখন আর সে শুধু সেই এদের বন্দেগী করে না। এমতাবস্থায় সে প্রকৃতই যার বান্দা তাকে বাদ দিয়ে যাদের সে বান্দা নয় এমন অনেকের বন্দেগী করতে থাকে। এটা আর একটা মারাত্মক ও সর্বাত্মক ভুল যা তার গোটা জীবনকেই ভুলে পরিণত করে। পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান হলো সে বান্দা বা দাস, স্বাধীন বা মুক্ত নয়। সে কেবল এক আল্লাহর বান্দা, তার ছাড়া আর কোনো বান্দা সে নয়। একথাটি যে ব্যক্তি জানে না প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে নিজেকে জানে না। আর যে ব্যক্তি একথাটি জেনেও এক মুহূর্তের জন্যও তা ভুলে যায় সেই মুহূর্তে সে এমন কোন কাজ করে বসতে পারে যা কোন আল্লাহদ্রোহী বা মুশরিক অর্থাৎ আত্মবিশ্বস্ত মানুষই করতে পারে। সঠিক পথের ওপর মানুষের টিকে থাকা পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহকে স্বরণ করার ওপর। আল্লাহ

তা'আলা সম্পর্কে গাফেল হওয়া মাত্রই সে নিজের সম্পর্কেও গাফেল হয়ে যায় আর এই গাফিলতিই তাকে ফাসেক বানিয়ে দেয়।

৩১. এই উপমার তাৎপর্য হলো, কুরআন যেভাবে আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর কাছে বান্দার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে পাহাড়ের মত বিশাল সৃষ্টিও যদি তার উপলব্ধি লাভ করতে পারতো এবং কেমন পরাক্রমশালী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রভুর সামনে নিজের সব কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে তা যদি জানতো তাহলে সেও ভয়ে কেঁপে উঠতো। কিন্তু যে মানুষ কুরআনকে বুঝতে পারে এবং কুরআনের সাহায্যে সবকিছুর তাৎপর্য ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, কিন্তু এরপরও তার মনে কোন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় না কিংবা যে কঠিন দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে তার আল্লাহকে কি জবাব দেবে সে বিষয়ে আদৌ কোন চিন্তা তার মনে জাগে না। বরং কুরআন পড়ার বা শোনার পরও সে এমন নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকে যেন একটি নিশ্চাপ ও অনুভূতিহীন পাথর। শোনা, দেখা ও উপলব্ধি করা আদৌ তার কাজ নয়। মানুষের এই চেতনাহীনতা ও নিরুদ্বিগ্নতা বিশ্বয়কর বৈকি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ১২০)।

৩২. এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই কুরআন পাঠানো হয়েছে, যিনি তোমার ওপর এসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং যীর কাছে অবশেষে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে সেই আল্লাহ কেমন এবং তাঁর গুণাবলী কি? উপরোক্তোক্ত বিষয়টি বর্ণনার পর পরই আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা আপনা থেকেই মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, তার লেনদেন ও বুঝা পড়া কোন সাধারণ সত্তার সাথে নয়, বরং এমন এক জবরদস্ত সত্তার সাথে যিনি এসব গুণাবলীর অধিকারী। এখানে এ বিষয়টি জেনে নেয়া দরকার যে, যদিও কুরআন মক্কীতে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর গুণাবলী এমন অনুপম ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু দু'টি স্থান বিশেষভাবে এমন যেখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বর্ণনা পাওয়া যায়। এর একটি হলো, সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসী (২৫৫ আয়াত) অপরটি হলো সূরা হাশরের এই আয়াতগুলো।

৩৩. অর্থাৎ যিনি ছাড়া আর কারোই ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থান এমন নয় যে, তার বন্দেগী ও আরাধনা করা যেতে পারে। যিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিকই নয় যে, সে উপাস্য হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে।

৩৪. অর্থাৎ সৃষ্টির কাছে যা গোপন ও অজানা তিনি তাও জানেন আর যা তাদের কাছে প্রকাশ্য ও জ্ঞান তাও তিনি জানেন। এই বিশ্ব-জাহানের কোন বস্তুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। যা অতীত হয়ে গিয়েছে, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে তার সবকিছুই তিনি সরাসরি জানেন। এসব জ্ঞানার জন্য তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন।

৩৫. অর্থাৎ একমাত্র তিনিই এমন এক সত্তা যার রহমত অসীম ও অফুরন্ত। সমগ্র বিশ্ব চরাচরব্যাপী পরিব্যস্ত এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসই তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। গোটা বিশ্ব-জাহানে আর একজনও এই সর্বাঙ্গিক ও অফুরন্ত রহমতের অধিকারী নেই। আর যেসব সত্তার মধ্যে দয়ামায়ার এই গুণটি দেখা যায় তা আংশিক ও

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
 الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ
 الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ
 وَالْأَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

আল্লাহ-ই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি বাদশাহ,^{৩৬}
 অতীব পবিত্র,^{৩৭} পূর্ণাঙ্গ শান্তি,^{৩৮} নিরাপত্তাদানকারী,^{৩৯} হিফায়তকারী,^{৪০}
 সবার ওপর বিজয়ী,^{৪১} শক্তি বলে নিজের নির্দেশ কার্যকরী করতে সক্ষম।^{৪২} এবং
 সবার চেয়ে বড় হয়েই বিরাজমান থাকতে সক্ষম।^{৪৩} আল্লাহ সেই সব শিরক
 থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে।^{৪৪} সেই পরম সত্তা তো আল্লাহ-ই যিনি
 সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দানকারী এবং সেই
 অনুপাতে রূপদানকারী।^{৪৫} উত্তম নামসমূহ তাঁর-ই।^{৪৬} আসমান ও যমীনের
 সবকিছু তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করে চলেছে।^{৪৭} তিনি পরাক্রমশালী ও
 মহাজ্ঞানী।^{৪৮}

সীমিত। তাও আবার তার নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়। বরং সৃষ্টা কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন
 সামনে রেখে তা তাকে দান করেছেন তিনি কোন সৃষ্টির মধ্যে দয়ামায়ার আবেগ অনুভূতি
 সৃষ্টি করে থাকলে তা এ জন্য করেছেন যে, তিনি একটি সৃষ্টিকে দিয়ে আরেকটি সৃষ্টির
 প্রতিপালন ও সুখ-স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে চান। এটাও তাঁরই রহমতের প্রমাণ।

৩৬. মূল আয়াতে الملك শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ প্রকৃত বাদশাহ তিনিই।
 তাছাড়া শুধু الملك শব্দ ব্যবহার করায় তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি কোন বিশেষ এলাকা বা
 নির্দিষ্ট কোন রাজ্যের বাদশাহ নন, বরং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ। তাঁর ক্ষমতা ও
 শাসন কর্তৃত্ব সমস্ত সৃষ্টিজগত জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রতিটি বস্তুর তিনিই মালিক। প্রতিটি বস্তু
 তার ইখতিয়ার, ক্ষমতা এবং হুকুমের অধীন। তার কর্তৃত্ব তথা সার্বভৌম ক্ষমতাকে
 (Sovereignty) সীমিত করার মত কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে
 আল্লাহ তা'আলার বাদশাহীর এ দিকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ط كُلُّ لَّهُ قُنُوتٌ - (الروم : ২৬)

“আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। সবাই তাঁর নির্দেশের
 অনুগত।” (আর রাম-২৬)

يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ - (السجده : ৫)

“আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সব কাজের ব্যবস্থাপনা তিনিই পরিচালনা করে থাকেন।”

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَالِىُّ اللّٰهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ - (الحديد : ৫)

“আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই। সব বিষয় আল্লাহর দিকেই রুজু করা হবে।”

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ - (الفرقان : ২)

“বাদশাহী ও সার্বভৌমত্বে কেউ তাঁর অংশীদার নয়।”

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ - (يس : ৮২)

“সবকিছুর কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা তাঁরই হাতে।” (ইয়াসীন-৮২)

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ - (البروج : ১৬)

“যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম” (আল বুরজ-১৬)

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ - (الانبیاء : ২২)

“তিনি যা করেন তার জন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তবে অন্য সবাইকে জবাবদিহি করতে হয়।”

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ - (الرعد : ৬১)

“আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই।”

وَهُوَ جَبَّارٌ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ - (المؤمنون : ৮৮)

“তিনিই আশ্রয় দান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না।

(আল মু'মিনুন, ৮৮)

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ - (ال عمران : ২৬)

“বলো, হে আল্লাহ, বিশ্ব-জাহানের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করো আবার যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমার আয়ত্ত্বে। নিসন্দেহে তুমি সব বিষয়ে শক্তিমান।” (আলে ইমরান, ২৬)

এসব স্পষ্ট ঘোষণা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার বাদশাহী সার্বভৌমত্ব কোন সীমিত বা রূপক অর্থের বাদশাহী নয়, বরং সত্যিকার বাদশাহী যা

সার্বভৌমত্বের পূর্ণাঙ্গ অর্থ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণার মূর্তপ্রতীক। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বুঝায় তার অস্তিত্ব বাস্তবে কোথাও থাকলে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার বাদশাহীতেই আছে। তাঁকে ছাড়া আর যেখানেই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার দাবী করা হয় তা কোন বাদশাহ বা ডিক্টেটরের ব্যক্তি সত্তা, কিংবা কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী অথবা কোন বংশ বা জাতি যাই হোক না কেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। কেননা, যে ক্ষমতা অন্য কারো দান, যা এক সময় পাওয়া যায় এবং আবার এক সময় হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্য কোন শক্তির পক্ষ থেকে যা বিপদের আশংকা করে, যার প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকা সাময়িক এবং অন্য বহু প্রতিদ্বন্দী শক্তি যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গণ্ডি সীমিত করে দেয় এমন সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আদৌ সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয় না।

কিন্তু কুরআন মজীদ শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ। এর সাথে পরবর্তী আয়াতাংশগুলোতে স্পষ্ট করে বলেছে, তিনি এমন বাদশাহ যিনি 'কুদ্দুস', 'সালাম', 'মু'মিন', 'মুহাইমিন', 'আযীয', 'জাব্বার', 'মুতাকাব্বির', 'খালেক', 'বারী' এবং 'মুহাওবির'।

৩৭. মূল ইবারতে قدوس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল ধাতু قدس। قدس অর্থ সবরকম মন্দ বৈশিষ্ট্য মুক্ত ও পবিত্র হওয়া। قدوس অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা কোন পকার দোষ-ত্রুটি অথবা অপূর্ণতা কিংবা কোন মন্দ বৈশিষ্ট্যের অনেক উর্ধ্বে। বরং তা এক অতি পবিত্র সত্তা যার মন্দ হওয়ার ধারণাও করা যায় না। এখানে একথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, চরম পবিত্রতা প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের প্রাথমিক অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত যে সত্তা দৃষ্ট, দৃশ্চরিত্র এবং বদনিয়াত পোষণকারী, যার মধ্যে মানব চরিত্রের মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভে অধিনস্তরা কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে এমন সত্তা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে এটা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতি মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কারণে মানুষ যাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে স্বীকৃতি দেয় তার মধ্যে পবিত্রতা না থাকলেও তা আছে বলে ধরে নেয়। কারণ পবিত্রতা ছাড়া নিরংকুশ ক্ষমতা অকল্পনীয়। কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ ছাড়া কোন চূড়ান্ত ক্ষমতাস্বত্ব ব্যক্তি পবিত্র নয় এবং তা হতেও পারে না। ব্যক্তিগত বাদশাহী, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, অন্য কোন পদ্ধতির মানবীয় সরকার যাই হোক না কেন কোন অবস্থায়ই তার সম্পর্কে চরম পবিত্রতার ধারণা করা যেতে পারে না।

৩৮. মূল আয়াতে السلام শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ শান্তি। কাউকে 'সুস্থ' ও 'নিরাপদ' না বলে 'নিরাপত্তা' বললে আপনা থেকেই তার মধ্যে আধিক্য অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন কাউকে সুন্দর না বলে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হবে সে আপাদমস্তক সৌন্দর্যমণ্ডিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে السلام বলার অর্থ তার গোটা সত্তাই পুরাপুরি শান্তি। কোন বিপদ, কোন দুর্বলতা কিংবা অপূর্ণতা স্পর্শ করা অথবা তাঁর পূর্ণতায় কোন সময় ভাটা পড়া থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

৩৯. মূল আয়াতে **الْمُؤْمِن** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির মূল ধাতু হলো **أمن**। **أمن** অর্থ ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ হওয়া। তিনিই মু'মিন যিনি অন্যকে নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে নিরাপত্তা দান করেন তাই তাঁকে মু'মিন বলা হয়েছে। তিনি কোন সময় তাঁর সৃষ্টির ওপর জুলুম করবেন, কিংবা তার অধিকার নস্যাৎ করবেন কিংবা তার পুরস্কার নষ্ট করবেন অথবা তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন এ ভয় থেকে তার সৃষ্টি পুরোপুরি নিরাপদ। আর কর্তার কোন কর্ম অর্থাৎ তিনি কাকে নিরাপত্তা দেবেন তা যেহেতু উল্লেখিত হয়নি বরং শুধু **الْمُؤْمِن** বা নিরাপত্তা দানকারী বলা হয়েছে তাই আপনা থেকে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্ব-জাহান ও তার সমস্ত জিনিসের জন্য তাঁর নিরাপত্তা।

৪০. মূল আয়াতে **الْمُهَيِّم** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়। এক, তত্ত্বাবধান ও হিফাজতকারী। দুই, পর্যবেক্ষণকারী, কে কি করছে তা যিনি দেখছেন। তিন, সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক, যিনি মানুষের সমস্ত প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখানেও যেহেতু শুধু **الْمُهَيِّم** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই কর্তার কোন কর্ম নির্দেশ করা হয়নি। অর্থাৎ তিনি কার তত্ত্বাবধানকারী ও সংরক্ষক, কার পর্যবেক্ষক এবং কার দেখা শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা বলা হয়নি। তাই শব্দের এ ধরনের প্রয়োগ থেকে স্বতঃই যা অর্থ দাঁড়ায় তা হলো তিনি সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করেছেন, সবার কাজকর্ম দেখছেন এবং বিশ্ব-জাহানের সমস্ত সৃষ্টি দেখাশোনা, লালন-পালন এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৪১. মূল ইবারতে **العزيز** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন এক পরাক্রমশালী সত্তা যার মোকাবিলায় অন্য কেউ মাথা তুলতে পারে না, যার সিদ্ধান্তসমূহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সাধ্য কারো নেই এবং যার মোকাবিলায় সবাই অসহায় ও শক্তিহীন।

৪২. মূল আয়াতে **الجبار** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শব্দমূল বা ধাতু হলো **جبر**। **جبر** শব্দের অর্থ কোন বস্তুকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঠিক করা, কোন জিনিসকে শক্তি দ্বারা সংশোধন করা। যদিও আরবী ভাষায় **جبر** শব্দটির কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু সংশোধন অর্থে এবং কোন কোন সময় শুধু জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো, সংস্কার ও সংশোধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে **جبار** (জাব্বার) বলার অর্থ হলো বল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি সৃষ্ট বিশ্ব-জাহানের শৃংখলা রক্ষাকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, যদিও তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়াও **جبار** শব্দটির মধ্যে বড়ত্ব ও মহত্ববোধক অর্থও বিদ্যমান। খেজুরের যে গাছ অত্যন্ত উঁচু হওয়ার কারণে তার ফল সংগ্রহ করা কারো জন্য সহজসাধ্য নয় আরবী ভাষায় তাকে জাব্বার বলে। অনুরূপ যে কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও জাকজমকপূর্ণ তাকে জাব্বার বা অতি বড় কাজ বলা হয়।

৪৩. মূল আয়াতে **الْمُكَبِّر** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, যে প্রকৃতপক্ষে বড় নয়, কিন্তু খামাখা বড়ত্ব জাহির করে। দুই, যে প্রকৃতপক্ষেই বড় এবং বড় হয়েই থাকে। মানুষ হোক, শয়তান হোক বা অন্য কোন মাখলুক হোক, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে তার কোন বড়ত্ব মহত্ব নেই, তাই নিজেকে নিজে বড় মনে করা এবং

অন্যদের কাছে নিজের বড়ত্ব ও মহত্ব জাহির করা একটা মিথ্যা দাবী ও জঘন্য দোষ। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতই বড়, বড়ত্ব বাস্তবে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট এবং বিশ্ব-জাহানের সব বস্তু তাঁর সামনে ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তাই তাঁর বড় হওয়া এবং বড় হয়ে থাকা নিছক কোন দাবী বা ভান নয়। বরং একটি বাস্তবতা। এটি কোন খারাপ বা মন্দ বৈশিষ্ট্য নয়, বরং একটি গুণ ও সৌন্দর্য যা তাঁর ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই।

৪৪. অর্থাৎ যারাই তাঁর ক্ষমতা, ইচ্ছাভিয়ার ও গুণাবলীতে কিংবা তাঁর সন্তায় অন্য কোন সৃষ্টিকে অংশীদার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারা অতিবড় এক মিথ্যা বলছে। কোন অর্থেই কেউ আল্লাহ তা'আলার শরীক বা অংশীদার নয়। তিনি তা থেকে পবিত্র।

৪৫. অর্থাৎ সারা দুনিয়ার এবং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তার নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করা পর্যন্ত পুরাপুরি তাঁরই তৈরী ও লালিতপালিত। কোন কিছুই আপনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়নি অথবা তার নির্মাণ ও পরিপাটি করণে অন্য কারো সামান্যতম অবদানও নেই। এখানে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকর্মকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় বা স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়টি হলো সৃষ্টি অর্থাৎ পরিকল্পনা করা। এর উদাহরণ হলো, কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন ইমারত নির্মাণের পূর্বে যেমন মনে মনে স্থির করে যে, অমুক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে এরূপ ও এরূপ একটি ইমারত নির্মাণ করতে হবে। সে তখন মনে মনে তার নমুনা বা ডিজাইন (Design) চিন্তা করতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ইমারতের বিস্তারিত ও সামগ্রিক কাঠামো কি হবে এ পর্যায়ে সে তা ঠিক করে নেয়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো براء । এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো পৃথক করা, চিরে ফেলা, ফেড়ে আলাদা করা। স্রষ্টার জন্য 'বারী' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, তিনি তাঁর পরিকল্পিত কাঠামোকে বাস্তবে রূপ দেন। অর্থাৎ যে নকশা তিনি নিজে চিন্তা করে রেখেছেন তাকে কল্পনা বা অস্তিত্বহীনতার জগত থেকে এনে অস্তিত্ব দান করেন। এর উদাহরণ হলো, ইঞ্জিনিয়ার ইমারতের যে কাঠামো ও আকৃতি তাঁর চিন্তার জগতে অংকন করেছিলেন সে অনুযায়ী ঠিকমত মাপজোক করে মাটিতে দাগ টানেন, ভিত খনন করেন, প্রাচীর গৈথে তোলেন এবং নির্মাণের সকল বাস্তব স্তর অতিক্রম করেন। তৃতীয় পর্যায় হলো, 'তাসবীর'-এর অর্থ রূপদান করা। এখানে এর অর্থ হলো, কোন বস্তুকে চূড়ান্ত, পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ও রূপ দান করা। এই তিনটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার কাজ ও মানুষের কাজের মধ্যে আদৌ কোন মিল বা তুলনা হয় না। মানুষের কোন পরিকল্পনাই এমন নয় যা পূর্বের কোন নমুনা থেকে গৃহীত নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি পরিকল্পনা অনুপম এবং তাঁর নিজের আবিষ্কার। মানুষ যা তৈরী করে তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট উপাদানসমূহের একটিকে আরেকটির সাথে জুড়ে করে। অস্তিত্ব নেই এমন কোন জিনিসকে সে অস্তিত্ব দান করে না, বরং যা আছে তাকেই বিভিন্ন পন্থায় জোড়া দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যে উপাদান দিয়ে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে উপাদানও তাঁর নিজের সৃষ্টি। অনুরূপ আকার-আকৃতি দানের ব্যাপারেও মানুষ আবিষ্কর্তা নয়, বরং আল্লাহর তৈরী আকার-আকৃতি ও চিত্রসমূহের অনুকরণকারী ও অপরিপক্ক নকলকারী। প্রকৃত আকার-আকৃতি দানকারী ও চিত্র অংকনকারী মহান আল্লাহ। তিনি প্রতিটি জাতি,

প্রজাতি এবং প্রতিটি ব্যক্তির অনুপম ও নজীরহীন আকার-আকৃতি বানিয়েছেন এবং কোন সময় একই আকার-আকৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটাননি।

৪৬. নামসমূহ অর্থ গুণবাচক নাম। তাঁর উত্তম নাম থাকার অর্থ হলো, যেমন গুণবাচক নাম দ্বারা তার কোন প্রকার অপূর্ণতা প্রকাশ পায় যেসব গুণবাচক নাম তাঁর জন্য উপযুক্ত নয়। যেসব নাম তাঁর পূর্ণাংগ গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে সেই সব নামে তাঁকে শ্ররণ করা উচিত। কুরআন মজীদে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ আ'আলার এসব উত্তম নামের উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে তাঁর পবিত্র সত্তার ৯৯টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে তিরমিযী ও ইবনে মাজা এসব নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি কুরআন ও হাদীস থেকে এসব নাম গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে তাহলে সে অতিসহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় যদি আল্লাহ তা'আলাকে শ্ররণ করতে হয় তাহলে সে জন্য কি ধরনের শব্দ উপযুক্ত হবে।

৪৭. অর্থাৎ মুখের ভাষায় ও অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে, তার সৃষ্টা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র।

৪৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাক্‌হীমুল কুরআনের সূরা হাদীদে ২নং টীকা।

কুরআন অধ্যয়ন
প্রতিযোগিতা
২০২৩

সূরা মুনাফিকুন

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আল মুনাফিকুন

৬৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের **إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ** অংশ থেকে এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এটি এ সূরার নাম এবং এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এ সূরায় মুনাফিকদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার সময় পশ্চিমধ্যে অথবা মদীনায়ে পৌঁছার অব্যবহিত পরে এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ৬ হিজরীর শাবান মাসে বনী মুসতালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল একথা আমরা সূরা নূরের ভূমিকায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছি। এভাবে এর নাযিল হওয়ার সময় সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমরা পরে আরো আলোচনা করব।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিল তা আলোচনার পূর্বে মদীনার মুনাফিকদের ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কারণ ঐ সময় যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা আদৌ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না। বরং তার পেছনে ছিল একটি পুরো ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ যা পরিশেষে এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

পবিত্র মদীনা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে আওস ও খায়রাজ গোত্র দু'টি পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত শান্ত হয়ে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রায় একমত্রে পৌঁছেছিল। তারা যথারীতি তাকে বাদশাহ বানিয়ে তার অভ্যেসক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও শুরু করেছিল। এমন কি তার জন্য রাজ মুকুটও তৈরী করা হয়েছিল। এ ব্যক্তি ছিল খায়রাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, খায়রাজ গোত্রে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বসম্মত এবং আওস ও খায়রাজ ইতিপূর্বে আর কখনো একযোগে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪)

এই পরিস্থিতিতে ইসলামের বাণী মদীনায়ে পৌঁছে এবং এই দু'টি গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। হিজরাতের আগে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মদীনায়ে আগমনের জন্য আহ্বান

জানানো হচ্ছিল তখন হযরত আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা (রা) আনসারী এ আহবান জানাতে শুধু এ কারণে দেরী করতে চাচ্ছিলেন যাতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বইয়াত ও দাওয়াতে शामिल হয় এবং এভাবে মদীনা যেন সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু যে প্রতিনিধি দল বাইয়াতের জন্য হাজির হয়েছিল তারা এই যুক্তি ও কৌশলকে কোন গুরুত্বই দিলেন না এবং এতে অংশগ্রহণকারী দুই গোত্রের ৭৫ ব্যক্তি সব রকম বিপদ মাথা পেতে নিয়ে নবী (সা)-কে দাওয়াত দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। (ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৯) আমরা সূরা আনফালের ভূমিকায় এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি।

এরপর নবী (সা) যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন আনসারদের ঘরে ঘরে ইসলাম এতটা প্রসার লাভ করেছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিরুপায় হয়ে পড়েছিল। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য তার নিজের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাই সে তার বহু সংখ্যক সহযোগী ও সাক্ষপাঙ্ক নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ছিল উভয় গোত্রের প্রবীণ ও নেতৃ পর্যায়ে লোকেরা। অথচ তাদের সবার অন্তর জ্বলে পুড়ে হারখার হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অন্তরজ্বালা ও দুঃখ ছিল অত্যন্ত তীব্র। কারণ সে মনে করতো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাজত্ব ও বাদশাহী ছিনিয়ে নিয়েছেন। তার এই মুনাফেকীপূর্ণ ঈমান এবং নেতৃত্ব হারানোর দুঃখ কয়েক বছর ধরে বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ পেতে থাকল। একদিকে তার অবস্থা ছিল এই যে, প্রতি জুম'আর দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খোতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে উঠে বসতেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উঠে বলতো, "তাইসব, আল্লাহর রসূল আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁর কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তাই আপনারা সবাই তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করুন, তিনি যা বলেন গভীর মনযোগ সহকারে তা শুনুন এবং তাঁর আনুগত্য করুন।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১) অপরদিকে অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিদিনই তার মুনাফেকীর মুখোশ খুলে পড়ছিল এবং সৎ ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে, সে ও তার সাক্ষপাঙ্করা ইসলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা গোষণ করে।

একবার নবী (সা) কোন এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় পথে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁর সাথে অভদ্র আচরণ করে। তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদাকে বিষয়টি জানালে সা'দ বললেন, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি এ ব্যক্তির প্রতি একটু নম্রতা দেখান। আপনার আগমনের পূর্বে আমরা তার জন্য রাজমুকুট তৈরী করেছিলাম। এখন সে মনে করে, আপনি তার নিকট থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭, ২৩৮)

বদর যুদ্ধের পর বনী কাইনুকা গোত্রের ইহুদীরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অকারণে বিদ্রোহ করলে রসূলুল্লাহ (সা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তখন এই ব্যক্তি তাদের সমর্থনে কোমর বেঁধে কাজ শুরু করে। সে নবীর (সা) বর্ষ ধরে বলতে লাগলো, এই গোত্রটির সাতশত বীরপুরুষ যোদ্ধা শত্রুর মোকাবেলায় সবসময় আমাকে সাহায্য করেছে, আজ একদিনেই আপনি তাদের হত্যা করতে চাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ, আপনি যতক্ষণ

আমার এই মিত্রদের ক্ষমা না করবেন আমি ততক্ষণ আপনাকে ছাড়বো না। (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১—৫২)

উহদ যুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার তিনশত সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছে। কি সাংঘাতিক নাযক মুহূর্তে সে এই আচরণ করেছে তা এই একটি বিষয় থেকেই অনুমান করা যায় যে, কুরাইশরা তিন হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপরে চড়াও হয়েছিল আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র এক হাজার লোক নিয়ে তাদের মোকাবিলা ও প্রতিরোধের জন্য বেরিয়েছিলেন। এক হাজার লোকের মধ্যে থেকেও এই মুনাফিক তিনশত লোককে আলাদা করে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল এবং নবী (সা)-কে শুধু সাতশত লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তিন হাজার শত্রুর মোকাবিলা করতে হলো।

এ ঘটনার পর মদীনার সব মুসলমান নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলো যে, এ লোকটি কটর মুনাফিক। তার যেসব সংগীসাথী এই মুনাফিকীতে তার সাথে শরীক ছিল তাদেরকেও তারা চিনে নিল। এ কারণে উহদ যুদ্ধের পর প্রথম জুম'আর দিনে নবীর (সা) খোতবা দেয়ার পূর্বে এ ব্যক্তি যখন বক্তৃতা করতে দাঁড়ালো তখন লোকজন তার জামা টেনে ধরে বলল : “তুমি বসো, তুমি একথা বলার উপযুক্ত নও।” মদীনাতে এই প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে এ ব্যক্তিকে অপমানিত করা হলো। এতে সে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হলো এবং মানুষের ঘাড় ও মাথার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। মসজিদের দরজার কাছে কিছু সংখ্যক আনসার তাকে বললেন, “তুমি একি আচরণ করছো? ফিরে চলো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করো।” এতে সে ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং বললো, “তাকে দিয়ে আমি কোন প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে চাই না।” (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১)।

হিজরী ৪ সনে বনু নায়ীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই সময় এই ব্যক্তি ও তার সাক্ষপাঙ্গরা আরো খোলাখুলিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য সহযোগিতা দান করে। একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর জ্ঞান কবুল সাহাবীগণ এসব ইহুদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অপরদিকে এই মুনাফিকরা গোপনে গোপনে ইহুদীদের কাছে খবর পাঠাচ্ছিল যে, তোমরা রুখে দাঁড়াও। আমরা তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই গোপন গাঁটছড়া বাঁধার বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন। সূরা হাশরের দ্বিতীয় রুকু'তে এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু তার ও তার সাক্ষপাঙ্গদের মুখোশ খুলে পড়ার পরও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কার্যকলাপ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ মুনাফিকদের একটি বড় দল তার সহযোগী ছিল। আওস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের বহু সংখ্যক নেতা তার সাহায্যকারী ছিল। কম করে হলেও মদীনার গোটা জনবসতির এক তৃতীয়াংশ ছিল তার সাক্ষপাঙ্গ। উহদ যুদ্ধের সময় এ বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছিল। এই

পরিস্থিতিতে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ শত্রুর সাথেও যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া কোন অবস্থায়ই সমীচীন ছিল না। এ কারণে তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও নবী (সা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে ইমানের দাবী অনুসারেই তাদের সাথে আচরণ করেছেন। অপরদিকে এসব লোকেরও এতটা শক্তি ও সাহস ছিল না যে, তারা প্রকাশ্যে কাকের হয়ে ইমানদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করত অথবা খোলাখুলি কোন হামলাকারী শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতো। বাহ্যত তারা নিজেদের একটা মজবুত গোষ্ঠী তৈরী করে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বহু দুর্বলতা ছিল। সূরা হাশরের ১২ থেকে ১৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে সেইসব দুর্বলতার কথাই তুলে ধরেছেন। তাই তারা মনে করতো, মুসলমান সেজে থাকার মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত। তারা মসজিদে আসত, নামায পড়তো এবং যাকাতও দিতো। তাছাড়া মুখে ইমানের লম্বা চণ্ডা দাবী করতো, সত্যিকার মুসলমানের যা করার আদৌ কোন প্রয়োজন পড়তো না। নিজেদের প্রতিটি মুনাফিকী আচরণের পক্ষে হাজারটা মিথ্যা যুক্তি তাদের কাছে ছিল। এসব কাজ দ্বারা তারা নিজেদের স্বগোষ্ঠীয় আনসারদেরকে এই মর্মে মিথ্যা আশ্বাস দিত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাদের অনেক ক্ষতি হতো। এসব কৌশল অবলম্বন করে তারা সেসব ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করছিল। তাছাড়া তাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থেকে মুসলমানদের ভেতরে কলহ কোন্দল ও ফাসাদ সৃষ্টির এমন সব সুযোগও তারা কাজে লাগাচ্ছিল যা অন্য কোন জায়গায় থেকে লাভ করতে পারত না।

এসব কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাক্ষপাৎ মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযানে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল এবং এই সুযোগে একই সাথে এমন দু'টি মহাফিতনা সৃষ্টি করেছিল যা মুসলমানদের সংহতি ও ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারত। কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহচর্য থেকে ইমানদারগণ যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তার কল্যাণে যথা সময়ে এ ফিতনার মূল্যোৎপাটন হয়ে যায় এবং এসব মুনাফিক নিজেরাই অপমানিত ও লঙ্ঘিত হয়। এ দু'টি ফিতনার মধ্যে একটির উল্লেখ করা হয়েছে সূরা নূরে। আর অপর ফিতনাটির উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য এই সূরাটিতে।

বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবদুর রায্যাক, ইবনে জারীর, তাবারী, ইবনে সা'দ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বহু সংখ্যক সনদসূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যে অভিযানের সময় এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিছু সংখ্যক রেওয়াজাতে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। আবার কোন কোন রেওয়াজাতে তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মাগাযী (যুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস) ও সীরাতে (নবী জীবন) বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ঘটনা বনী মুসতালিক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়াজাত একত্রিত করলে ঘটনার যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে :

বনী মুসতালিক গোত্রকে পরাস্ত করার পর ইসলামী সেনাবাহিনী তখনও মুরাইসী নামক কূপের আশেপাশের জনবসতিতে অবস্থান করছিল। ইতিমধ্যে ইঠাৎ পানি নিয়ে দুই

ব্যক্তির মধ্যে বচসা হয়। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জাহ্‌জাহ্‌ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত উমরের (রা) কর্মচারী। তিনি তাঁর ঘোড়ার দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতেন। অন্যজন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়াবার আল জুহানী।^১ তাঁর গোত্র খায়রাজ গোত্রের মিত্র ছিল। মৌখিক বাদানুবাদ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং জাহ্‌জাহ্‌ সিনানকে একটি লাথি মারে। প্রাচীন ইয়ামনী ঐতিহ্য অনুসারে আনসারগণ এ ধরনের আচরণকে অত্যন্ত অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করতেন। এতে সিনান সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে আহবান জানায় এবং জাহ্‌জাহ্‌ও মুহাজিরদের আহবান জানায়। এই ঝগড়ার খবর শোনামাত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আওস ও খায়রাজ গোত্রের লোকদের উত্তেজিত করতে শুরু করে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে দ্রুত এসো, নিজের মিত্রদের সাহায্য করো। অপরদিক থেকে কিছু সংখ্যক মুজাহিরও এগিয়ে আসেন। বিষয়টি আরো অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারতো। ফলে আনসার ও মুহাজিরগণ সম্মিলিতভাবে সবেমাত্র যে স্থানটিতে এক দূশমন গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেছিলেন এবং তখনও তাদের এলাকাতেই অবস্থান করছিলেন সে স্থানটিতেই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু শোরগোল শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে গেলেন এবং বললেন :

ما بال دعوى الجاهلية؟ ما لكم ولدعوة الجاهلية؟ دعوها فانها

منتنة -

“কি ব্যাপার! জাহেলিয়াতের আহবান শুনতে পাচ্ছি কেন? জাহেলিয়াতের আহবানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এসব ছেড়ে দাও, এগুলো দুর্গন্ধময় নোত্রো জিনিস।^২ এতে উভয়পক্ষের সং ও নেকার লোকজন অগ্রসর হয়ে ব্যাপারটি মিটমিট করে দিলেন এবং সিনান জাহ্‌জাহ্‌কে মাফ করে আশ্বাস করে দিলেন।

১. বিভিন্ন রেওয়াজাতে উভয়ের বিভিন্ন নাম বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ইবনে হিশামের বর্ণনা থেকে এ নাম গ্রহণ করেছি।
২. এই সময় নবীর (সা) কলা একথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সঠিক মর্মবাণীকে বুঝতে হলে একথাটি যথাযথভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। ইসলামের নীতি হচ্ছে, দুই ব্যক্তি যদি তাদের বিবাদের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য মানুষকে আহবান জানাতে চায় তাহলে সে বলবে, মুসলমান ভাইয়েরা, এগিয়ে এসো, আমাদের সাহায্য করো। অথবা বলবে, হে লোকেরা, আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আস। কিন্তু তাদের প্রত্যেকে যদি নিজ গোত্র, স্বজন, বংশ ও বর্ণ অথবা অকলের নাম নিয়ে আহবান জানায় তাহলে তা জাহেলিয়াতের আহবান হয়ে দাঁড়ায়। এ আহবানে সাড়া দিয়ে আগমনকারী যদি কে অত্যাচারী আর কে অত্যাচারিত তা না দেখে এবং হক ও ইনসাফের ভিত্তিতে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার পরিবর্তে নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোককে সাহায্য করার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে তা একটি জাহেলিয়াতপূর্ণ কাজ। এ ধরনের কাজ দ্বারা দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে নোত্রো ও ঘৃণিত জিনিস বলে আখ্যায়িত করে মুসলমানদের বলেছেন যে, এক্ষণ জাহেলিয়াতের আহবানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? তোমরা ইসলামের ভিত্তিতে একটি জাতি হয়েছিলে। এখন আনসার ও মুজাহিরদের নাম দিয়ে তোমাদের কি করে আহবান জানানো হচ্ছে, আর সেই আহবান শুনে তোমরা কোথায় ছুটে যাচ্ছে? আল্লামা সুহাইলী

কিন্তু যাদের অন্তরে মুনাফিকী ছিল তারা সবাই এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে সমবেত হয়ে তাকে বললো : “এতদিন আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তুমি প্রতিরোধও করে আসছিলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এসব কাড়াল ও নিষেদের সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছো।” আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আগে থেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। একথা শুনে সে আরো ছুঁলে উঠল। সে বলতে শুরু করল : এসব তোমাদের নিজেদেরই কাজের ফল। তোমরা এসব লোককে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছো, নিজেদের অর্থ-সম্পদ তাদের বটন করে দিয়েছো। এখন তারা ফুলেফেঁপে উঠেছে এবং আমাদেরই প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং কুরাইশদের এই কাড়ালদের বা মুহাম্মাদের (সা) (সঙ্গীসাথীদের) অবস্থা বুঝতে একটি উপমা হুবহু প্রযোজ্য। উপমাটি হলো, তুমি নিজের কুকুরকে খাইয়েদাইয়ে মোটা তাজা করো, যাতে তা একদিন তোমাকেই ছিড়ে ফেড়ে খেতে পারে। তোমরা যদি তাদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নাও তাহলে তারা কোথায় নিচ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ, মদীনা ফিরে গিয়ে আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান লোক তারা হীন ও লাঞ্চিত লোকদের বের করে দেবে।”

এ বৈঠকে ঘটনাক্রমে হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকামও উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি একজন কম বয়স্ক বালক ছিলেন। এসব কথা শোনার পর তিনি তাঁর চাচার কাছে তা বলে দেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের একজন নেতা। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে সব বলে দেন। নবী (সা) য়ায়েদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি যা শুনেছিলেন তা আদ্যপাত্ত খুলে বললেন।^১ নবী (সা) বললেন : তুমি বোধ হয় ইবনে উবাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। সম্ভবত তোমার শুনতে ভুল হয়েছে। ইবনে উবাই একথা বলছে বলে হয়তো তোমার সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু য়ায়েদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, তা নয়। আল্লাহর শপথ আমি নিজে তাকে এসব কথা বলতে শুনেছি। অতপর নবী (সা) ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে সরাসরি অস্বীকার করলো। সে বারবারের

“রাওদুল উনূফ” গ্রন্থে লিখেছেন : কোন ঝগড়া-বিবাদ বা মতানৈক্যের ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতপূর্ণ আহবান জানানোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ রীতিমত ফৌজদারী অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছেন। একদল আইনবিদের মতে এর শাস্তি পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত এবং আরেক দলের মতে দশটি। তৃতীয় আরেক দলের মতে, তাকে অবস্থার আলোকে শাস্তি দেয়া দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু তিরস্কার ও শাসানিই যথেষ্ট। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের আহবান উত্থারণকারীকে বন্দী করা উচিত। সে যদি বেশী দুর্ভাগী হয় তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে।

১. যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসছিল মদীনার মুনাফিকরা তাদের সবাইকে ‘جلايل’ বলে আখ্যায়িত করতো। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কহল বা মোটা বস্ত্র পরিধানকারী। কিন্তু গরীব মুহাজিরদেরকে হেয় ও অবজ্ঞা করার জন্যই তারা এ শব্দটি ব্যবহার করতো। যে অর্থ বুঝতে তারা শব্দটি বলত ‘কাড়াল’ শব্দ দ্বারা তা অধিকতর বিতণ্ডিতাবে ব্যক্ত হয়।
২. এ ঘটনা থেকে ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ধর্মীয়, নৈতিক ও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কেউ যদি কারো ক্ষতিকর কথা অন্য কারো কাছে বলে তা হলে চোখলখুরী পর্যায়ে পড়ে না। ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে চোখলখুরী করা হয় সেই চোখলখুরীকে ইসলামী শরীয়াত হারাম ঘোষণা করেছে।

শপথ করে বলতে লাগলো, আমি একথা কখনো বলি নাই। আনসারদের লোকজনও বললেন : হে আল্লাহর নবী, এতো একজন ছেলে মানুষের কথা, হয়তো তার ভুল হয়েছে। তিনি আমাদের নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি। তার কথার চেয়ে একজন বালকের কথার প্রতি বেশী আস্থাশীল হবেন না। বিভিন্ন গোত্রের প্রবীণ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও যাদেরকে তিরস্কার করলো। বেচারা যায়েদ এতে দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকলেন। কিন্তু নবী (সা) যায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উভয়কেই জানতেন। তাই প্রকৃত ব্যাপার কি তা তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারলেন।

হযরত 'উমর এ বিষয়টি জানতে পেরে নবীর (সা) কাছে এসে বললেন : “আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। অথবা একরূপ অনুমতি দেয়া যদি সমীচীন মনে না করেন তাহলে আনসারদের নিজেদের মধ্যে থেকে মুআয ইবনে জাবাল অথবা আব্বাদ ইবনে বিশর, অথবা সা'দ ইবনে মু'আয, অথবা মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে নির্দেশ দিন^১ সে তাকে হত্যা করুক।” কিন্তু নবী (সা) বললেন : “এ কাজ করো না। লোকে বলবে, মুহাম্মাদ (সা) নিজের সংগী-সাথীদেরকেই হত্যা করছে।” এরপর নবী (সা) তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাভাবিক রীতি ও অভ্যাস অনুসারে তা যাত্রার সময় ছিল না। ক্রমাগত ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত থাকলো। এমন কি লোকজন ক্লান্তিতে নিশ্বেজ ও দুর্বল হয়ে পড়লো। তখন তিনি একস্থানে তাঁবু করে অবস্থান করলেন। ক্লান্ত শান্ত লোকজন মাটিতে পিঠ ঠেকানো মাত্র সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এ কাজ তিনি এ জন্য করলেন যাতে, মুরাইসী কূপের পাশে যে ঘটনা ঘটেছিল মানুষের মন-মগজ থেকে তা মুছে যায়। পশ্চিমধ্যে আনসারদের একজন নেতা হযরত উসাইদ ইবনে হদায়ের তাঁর কাছে গিয়ে বললেন : “হে আল্লাহর রসূল, আজ আপনি এমন সময় যাত্রার নির্দেশ দিয়েছেন যা সফরের জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি তো এ রকম সময়ে কখনো সফর শুরু করতেন না?” নবী (সা) বললেন : তোমাদের সেই লোকটি কি কথা প্রচার করেছে তাকি তুমি শোন নাই? তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোন লোকটি? তিনি বললেন : আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। উসাইদ জিজ্ঞেস করলেন : সে কি বলেছে? তিনি বললেন : “সে বলেছে, মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানী লোকেরা হীন ও নীচ লোকদের বহিষ্কার করবে। তিনি আরয় করলেন, হে আল্লাহর রসূল। সম্মানিত ও মর্যাদাবান তো আপনি। আর হীন ও নীচ তো সে নিজে। আপনি যখন ইচ্ছা তাকে বহিষ্কার করতে পারেন।”

কথাটা আস্তে আস্তে আনসারদের সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং ইবনে উবাইয়ের বিরুদ্ধে তাদের মনে ভীষণ ক্রোধের সৃষ্টি হলো। লোকজন ইবনে উবাইকে বললো, তুমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ক্ষমা চাও। কিন্তু সে ত্রুঙ্ক স্বরে জবাব দিল : তোমরা বললে তার প্রতি ঈমান আন। আমি ঈমান আনলাম। তোমরা বললে, অর্থ-সম্পদের যাকাত দাও। আমি যাকাতও দিয়ে দিলাম। এখন তো শুধু মুহাম্মাদকে

১ বিভিন্ন রেওয়াজমাতে আনসারদের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে। হযরত উমর (রা) নবীর (সা) কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন “আমি মুহাজির হওয়ার কারণে আমার হাতে সে নিহত হলে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে এসব লোকদের মধ্য থেকে কোন একজনকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে দিন।”

আমার সিজদা করা বাকী আছে। এসব কথা শুনে তার প্রতি ঈমানদার আনসারদের অসন্তুষ্টি আরো বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক থেকে তার প্রতি বিকার ও ভিরঙ্কার বর্ধিত হতে থাকলো। যে সময় এ কাফেলা মদীনায প্রবেশ করছিল তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র (তার নামও) আবদুল্লাহ খোলা তরবারি হাতে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন : “আপনিই তো বলেছেন, মদীনায ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তির হীন ও নীচ লোকদের সেখান থেকে বহিস্কার করবে। এখন আপনি জানতে পারবেন সম্মান আপনার, না আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের। আল্লাহর কসম। যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মদীনায প্রবেশ করতে পারবেন না।” এতে ইবনে উবাই চিৎকার করে বলে উঠল “হে খায়রাজ গোত্রের লোকজন, দেখো, আমার নিজের ছেলেই আমাকে মদীনায প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে।” লোকজন গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দিলে তিনি বললেন : “আবদুল্লাহকে গিয়ে বলো, তার পিতাকে যেন নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেয়।” তখন আবদুল্লাহ বললেন : “নবী (সা) অনুমতি দিয়েছেন তাই এখন আপনি প্রবেশ করতে পারেন।” এই সময় নবী (সা) হযরত উমরকে (রা) বললেন : “হে উমর, এখন তোমার মতামত কি? যে সময় তুমি বলেছিলে, আমাকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন, সে সময় তুমি যদি তাকে হত্যা করতে তাহলে অনেকেই নাক সিটকাতো এবং নানা রকম কথা বলতো। কিন্তু আজ যদি আমি তার হত্যার আদেশ দেই তাহলে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা যেতে পারে।” হযরত উমর বললেন : “আল্লাহর শপথ, এখন আমি বুঝতে পেরেছি আল্লাহর রসুলের কথা আমার কথার চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল।”^১ এই পরিস্থিতি ও পটভূমিতে অভিযান শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায পৌঁছার পর এ সূরাটি নাখিল হয়।

১. এ থেকে পরীয়াতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়লা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায়। এক, ইবনে উবাই যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল এবং যে ধরনের ভৎসনাতা চালিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম মিলাতের অন্তরতুচ্ছ থেকে কেউ যদি এ ধরনে আচরণ করে তাহলে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। দুই, শুধু আইনের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি হত্যার উপযুক্ত হলেই যে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে তা জরুরী নয়। এক্ষণে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দেখতে হবে, তাকে হত্যা করার ফলে কোন বড় ধরনের ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে কিনা। পরিবেশ-পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে অন্ধভাবে আইনের প্রয়োগ কোন কোন সময় আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ফলাফল নিয়ে আসে। যদি একজন মুনাফিক ও ফিতনাবাজের পেছনে কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দিয়ে আরো বেশী ফিতনাকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ দেয়ার চেয়ে উত্তম হচ্ছে, যে রাজনৈতিক শক্তির জোরে সে দুর্কর্ম করছে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তার মূল্যোৎপাটন করা। এই সুদূর প্রসারী লক্ষ্যেই নবী (সা) তখনো আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শাস্তি দেননি যখন তিনি তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম ছিলেন। বরং তার সাথে সবসময় নম্র আচরণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত দুই তিন বছরের মধ্যেই মদীনায মুনাফিকদের শক্তি চিরদিনের জন্য নির্মূল হয়ে গেল।

আয়াত ১১

সূরা আল মুনাফিকুন-মাদানী

সূর ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
 لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاِبُونَ ۖ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ
 جُنَّةً فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۖ

হে নবী, এ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন, তুমি অবশ্যই তাঁর রসূল। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।^১ তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে।^২ এভাবে তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকছে এবং অন্যদেরও বিরত রাখছে।^৩ এরা যা করছে তা কত মন্দ কাজ! এ সবেব কারণ এই যে, তারা ঈমান আনার পর আবার কুফরী করেছে। তাই তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। এখন তারা কিছুই বুঝে না।^৪

১. অর্থাৎ যে কথা তারা মুখে বলছে তা আসলে সত্য। কিন্তু তারা মুখে যা প্রকাশ করছে নিজেরা যেহেতু তা বিশ্বাস করে না, তাই তাঁর রসূল হওয়ার যে সাক্ষ্য তারা দেয় সে ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী। এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, দু'টি জিনিসের সমন্বয়ের নাম সাক্ষ্য। এক, যে মূল বিষয়টির সাক্ষ্য দেয়া হয় সেটি। দুই, সেই বিষয়টি সম্পর্কে সাক্ষদানকারীর বিশ্বাস। এখন বিষয়টি যদি আসলে সত্য হয় এবং সাক্ষ্য দানকারী মুখে যা বলছে তার বিশ্বাসও যদি তাই হয়, তাহলে সে সবদিক দিয়েই সত্যবাদী হবে। আর বিষয়টি যদি মিথ্যা হয়, কিন্তু সাক্ষদাতা সেটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তাহলে একদিক দিয়ে আমরা তাকে সত্যবাদী বলবো। কেননা, সে তার বিশ্বাসকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সত্যবাদী। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলব। কেননা, সে যে বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ভুল। অপরদিকে বিষয়টি যদি সত্য হয় কিন্তু সাক্ষদাতার বিশ্বাস তার পরিপন্থী হয় তাহলে সঠিক বিষয়টির সাক্ষ্য দেয়ার কারণে আমরা তাকে সত্যবাদী বলব। কিন্তু সে মুখে যা প্রকাশ করছে তার বিশ্বাস তা না হওয়ার কারণে

আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলব। যেমন কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি ইসলামকে সত্য বলে তাহলে সে সবদিক দিয়ে সত্যবাদী। কিন্তু একজন ইহুদী যদি ইহুদী ধর্মের ওপর বিশ্বাসী থেকে ইসলামকে সত্য বলে তাহলে তার কথা সত্য কিন্তু তার সাক্ষ মিথ্যা বলে গণ্য করা হবে। কেননা, সে তার বিশ্বাসের পরিপন্থী সাক্ষ দিচ্ছে। আর সে যদি ইসলামকে বাতিল বা মিথ্যা বলে তাহলে আমরা তার একথাকে মিথ্যা বলবো। কিন্তু সে যে সাক্ষ দিচ্ছে তা তার নিজের বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

২. অর্থাৎ নিজেরা মুসলমান ও ঈমানদার এ কথা বিশ্বাস করানোর জন্য তারা যেসব শপথ করে সেগুলোকে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যাতে মুসলমানদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পায় এবং প্রকাশ্য শত্রুর সাথে মুসলমানগণ যে আচরণ করে থাকে তাদের সাথে তা করতে না পারে।

এসব শপথ দ্বারা ঐ সব শপথও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যা সাধারণত তারা নিজেদের ঈমানের বিষয়টি বিশ্বাস করানোর জন্য করতো। তাদের মুনাফিকী আচরণ ধরা পড়ার পর যেসব শপথ করে তারা মুসলমানদের বুঝাতে চাইতো যে, তা তারা মুনাফিকীর কারণে করেনি সেসব শপথও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আবার যাবেদ ইবনে আরকামের দেয়া খবর মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে শপথ করেছিল তাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এসব সম্ভাবনার সাথে আরো একটি সম্ভাবনা আছে। তা হলো, “আমরা সাক্ষ দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রসূল” তাদের এ কথাটিকে আল্লাহ তা’আলা শপথ বলে স্বাখ্যায়িত করেছেন। এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে ফিকাহবিদদের মধ্যে একটি বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি “আমি সাক্ষ দিচ্ছি” বলে কোন কথা বর্ণনা করে তাহলে তা শপথ বা হলফ (Oath) বলে বিবেচিত হবে কিনা। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সঙ্গীগণ (ইমাম যুফার ছাড়া) এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আওয়ায়ী একে শপথ (শরীয়াতের পরিভাষা: ইয়ামীন) বলে মনে করেন। ইমাম যুফার বলেন : এটা শপথ নয়। ইমাম মালেক থেকে দু’টি মত বর্ণিত হয়েছে, একটি হচ্ছে, এটা নিছক শপথ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, “সাক্ষ দিচ্ছি” বলার সময় সে যদি এরূপ নিয়ত করে যে, “আল্লাহর শপথ আমি সাক্ষ দিচ্ছি” অথবা “আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি” তাহলে সে ক্ষেত্রে এটা শপথমূলক বর্ণনা হবে। অন্যথায় হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বক্তব্য পেশকারী ব্যক্তি যদি এ কথাও বলে যে, “আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সাক্ষ দিচ্ছি” তবুও তা তার শপথমূলক বক্তব্য বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সে যদি এরূপ কথা শপথের নিয়তেই বলে থাকে তাহলে তা শপথ বলে গণ্য হবে। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)।

৩. আরবী ভাষায় صد শব্দটি সক্রমক এবং অক্রমক এই উভয় প্রকার ক্রিয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণে صدًا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ আয়াতাংশের অর্থ “তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকে” যেমন হয়, তেমনি “তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে”ও হয়। তাই অনুবাদে আমরা দু’টি অর্থই উল্লেখ করেছি। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাংশের অর্থ হবে এসব শপথের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নেয়ার পর ঈমানের দাবী পূরণ না করার এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে পাশ কাটিয়ে চলার ব্যাপারে সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়।

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ
 كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدٌ يَعْسَبُونَ كُلٌّ صِغَرٌ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُو
 فَأَحْزَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ يَكُونُونَ ⑧

তুমি যখন এদের প্রতি তাকিয়ে দেখ, তখন তাদের দেহাবয়ব তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। আর যখন কথা বলে তখন তাদের কথা তোমার শুনতেই ইচ্ছা করে।^৭ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা কাঠের গুড়ির মত।^৮ যে কোন জোরদার আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।^৯ এরাই কটর দূশমন।^{১০} এদের ব্যাপারে সাবধান থাক।^{১১} এদের ওপর আল্লাহর গম্ব।^{১২} এদেরকে উল্টো কোনদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।^{১৩}

দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাত্ত্বের অর্থ হবে, এসব মিথ্যা শপথের আড়ালে তারা শিকারের সন্ধানে থাকে, মুসলমান সেজে থেকে ভিতর থেকেই মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। মুসলমানদের গোপনীয় বিষয়সমূহ জেনে নিয়ে তা শত্রুদের জানিয়ে দেয়, ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে এবং সহজ সরল মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় ও বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে তারা এমন সব কৌশল অবলম্বন করে যা কেবল মুসলমান সেজে থাকা একজন মুনাফিকের পক্ষেই সম্ভব। ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুরা ঐ সব কৌশল কাজে লাগাতে পারে না।

৪. এ আয়াতে ঈমান আনার অর্থ বুঝানো হয়েছে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে শামিল হওয়াকে আর কুফরের অর্থ বুঝানো হয়েছে আন্তরিকভাবে ঈমান না আনা এবং মৌখিকভাবে ঈমান আনার পূর্বে যে কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকে। কথাটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, তারা যখন খুব ভালভাবে বুঝে শুনে সোজাসুজি ঈমানের পথ অবলম্বন অথবা পরিকারভাবে কুফরের পথ গ্রহণের পরিবর্তে মুনাফিকীর এই নীতি ও পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হলো এবং একজন সত্যবাদী, নিকলুয, সৎ ও ভদ্র মানুষের মত নীতি ও পন্থা অবলম্বন করার সামর্থ্য ও শুভবুদ্ধিই আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিলেন। এখন তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির যোগ্যতাই হারিয়ে গিয়েছে এবং নৈতিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটেছে। রাতদিনের এই মিথ্যা, প্রতি মুহূর্তের এই প্রভারণা ও ধোঁকাবাজি এবং কথা ও কাজের এই স্থায়ী বৈপরীত্য—যার মধ্যে তারা নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে—তা যে কত হীন ও লাঞ্ছনাকর অবস্থা, সে উপলব্ধিটুকু পর্যন্ত এখন তাদের আসে না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে অত্যন্ত পরিকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি তার একটি। এসব মুনাফিকের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দেয়ার কারণে ঈমান তাদের অন্তরে

প্রবেশ করতে পারেনি এবং তারা বাধ্য হয়ে মুনাফিক রয়ে গিয়েছে—ব্যাপারটি তা নয়। বরং বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও যখন তারা কুফরির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর ঘেরে দিয়েছেন। এ সময়ই তাদের থেকে নির্ভেজাল ঈমান ও তা থেকে জন্মলাভকারী নৈতিক আচরণ করার সামর্থ্য ও শুভবুদ্ধি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের জন্য যে মুনাফিকী ও মুনাফিকী চরিত্র পছন্দ করেছিল তার সামর্থ্য ও বুদ্ধিই তাদের দান করা হয়েছে।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অত্যন্ত সুঠাম দেহী, সুস্থ, সুদর্শন ও বাকপটু ব্যক্তি ছিল। তার সাত্তাপত্রদের অনেকেও তাই ছিল। এরা সবাই ছিল মদীনার নেতৃস্থানীয় লোক। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে যখন আসতো তখন দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসতো এবং রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা বলতো। তাদের দেহাবয়ব ও চেহারা-আকৃতি দেখে আর কথাবার্তা শুনে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, সমাজের এসব সম্মানিত লোকেরা চরিত্রের দিক দিয়ে এত নীচ ও জঘন্য হতে পারে।

৬. অর্থাৎ এরা যারা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে তারা মানুষ নয়, বরং কাঠের গুড়ি। তাদেরকে কাঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, নৈতিক চরিত্র মানুষের মূল প্রাণসত্তা, সেই প্রাণসত্তাই তাদের মধ্যে নেই। তারপর তাদেরকে দেয়ালগাত্রে হেলান দিয়ে খাড়া করা কাঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তা একেবারেই অকেজো, অপদার্থ। কেননা, কাঠ কেবল তখনই উপকারে আসে যদি তা ছাদে অথবা দরজায় বা আসবাব তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। দেয়াল গাত্রে হেলান দিয়ে রাখা কাঠখণ্ড কোন উপকারেই আসে না।

৭. ছোট্ট এই আয়াতাতংশে তাদের অপরাধী বিবেকের চিত্র অংকন করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক পর্দার আড়ালে মুনাফিকীর যে খেলা তারা খেলছিল তা নিজেরা যেহেতু ভাল করেই জানতো, তাই সবসময় তারা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো যে কখন যেন তাদের অপরাধের গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যায়, অথবা তাদের আচরণের ব্যাপারে ঈমানদারদের ধৈর্যের বীধ ভেঙ্গে যায় এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়। জনপদের কোন স্থান থেকে কোন বড় আওয়াজ শোনা গেলে অথবা কোথাও কোন শোরগোল উঠিত হলে তারা ভয়ে জড়বড় হয়ে যেত এবং মনে করত, আমার দুর্ভাগ্য বোধ হয় এসেই পড়ল।

৮. অন্য কথায় প্রকাশ্যে দূশমনের তুলনায় 'ছদ্মবেশী' এসব দূশমন অনেক বেশী ভয়ংকর।

৯. অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক চালচলন ও আচার আচরণ দেখে প্রতারণিত হয়ো না। এ ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকো যে, এরা যে কোন সময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

১০. এটা বদদোয়া নয়, বরং তারা যে আল্লাহর গণ্যবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং সে গণ্য যে অবশ্যই নাখিল হবে—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই ঘোষণা। এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এ বাক্যাংশটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি বরং আরবী বাকরীতি অনুসারে, অভিপ্ৰাণ ও তিরস্কার অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমাদের নিজস্ব ভাষায় আমরা যেমন বলি : ওর সর্বনাশ হোক, কি জঘন্য মানুষ সে। এখানে “সর্বনাশ” শব্দটি দ্বারা তার জঘন্যতার তীব্রতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, বদদোয়া করা নয়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارٌ وَهُمْ يُرِيدُ
 يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ
 لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

যখন তাদের বলা হয়, এসো আল্লাহর রসূল যাতে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তখন তারা মাথা বাঁকুনি দেয় আর তুমি দেখবে যে, তারা অহমিকা ভরে আসতে বিরত থাকে।^{১২} হে নবী, তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর বা না কর, উভয় অবস্থাই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনো তাদের মাফ করবেন না।^{১৩} আল্লাহ ফাসিকদের কখনো হিদায়াত দান করেন না।^{১৪}

১১. তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে মুনাফিকীর পথে কে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা বলা হয়নি। একথাটি স্পষ্ট করে না বলার কারণে আপনা থেকেই যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হলো, তাদের এই এলোপাতাড়ি ও অস্বাভাবিক আচরণের চালিকাশক্তি একটি নয়, বরং বহু সংখ্যক চালিকাশক্তি এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। তাদের পেছনে এই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে শয়তান, অসৎ বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির আকাংখাসমূহ। কারো স্ত্রী, কারো সন্তান-সন্ততি, কারো নিজ গোত্র ও গোষ্ঠীর অসন্তোষজনন তাকে এ পথে চলতে বাধ্য করেছে। আবার কাউকে তার হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা এ পথে তড়িত করেছে।

১২. অর্থাৎ তারা ইসতিগফারের জন্য রসূলের কাছে আসে না শুধু তাই নয়, বরং এ কথা শুনে অহংকার ও গর্ব ভরে মাথা বাঁকুনি দেয়। রসূলের কাছে আসা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাকে নিজেদের জন্য অপমানজনক ও মর্যাদাহানিকর মনে করে আপন অবস্থানে অনড় থাকে। তারা যে ঈমানদার নয় এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ।

১৩. একথাটি সূরা তাওবাত্তে (যা সূরা মুনাফিকুনের তিন বছর পর নাযিল হয়) আরো অধিক জোর দিয়ে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন : “তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না করো, এমনকি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না। কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আল্লাহ ফাসিকদের হিদায়াত দান করেন না।” (আত তাওবা, আয়াত ৮০) পরে আরো বলা হয়েছে : তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসেক অবস্থায় মারা গেছে। (আত তাওবা, আয়াত ৮৪)

১৪. এ আয়াতটিতে দু'টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এক, মাগফিরাতের জন্য দোয়া শুধু হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের জন্যই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হতে পারে। যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ থেকে সরে গিয়েছে এবং যে ব্যক্তি আনুগত্যের পরিবর্তে গোনাহ ও

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ^١ يَقُولُونَ
لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ^٢

এরাই তো সেই সব লোক যারা বলে, আল্লাহর রসূলের সাথীদের জন্য খরচ করা বন্ধ করে দাও যাতে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ আসমান ও যমীনের সমস্ত ধন ভাণ্ডারের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু এই মুনাফিকরা তা বুঝে না। এরা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে যে সম্মানিত সে হীন ও নীচদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।^১ অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্য।^২ কিন্তু এসব মুনাফিক তা জানে না।

অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছে তার জন্য কোন সাধারণ মানুষের দোয়া তো দূরের কথা আল্লাহর রসূল নিজেও যদি তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তবুও তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে না। দুই, যারা আল্লাহর হিদায়াত পেতে আগ্রহী নয় তাদের হিদায়াত দান করা আল্লাহর নীতি নয়। কোন ব্যক্তি নিজেই যদি আল্লাহর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে বরং তাকে হিদায়াতের দিকে আহবান জানালে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে অহংকার তরে সে আহবান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আল্লাহর কি প্রয়োজন পড়েছে যে, তার পিছনে পিছনে নিজের হিদায়াতের ফেরি করে বেড়াবেন এবং তোষামোদ করে তাকে সত্যপথে নিয়ে আসবেন।

১৫. হযরত যয়েদ ইবনে আরকাম বলেন : আমি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এ কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম এবং সে এসে শপথ করে পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করলো তখন আনসারদের প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ লোকজন এবং আমার আপন চাচা আমাকে অনেক ভিরঙ্কার করলেন। এমনকি আমার মনে হলো নবীও (সো) আমাকে মিথ্যাবাদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করেছেন। এতে আমার এত দুঃখ ও মনঃকষ্ট হলো যা সারা জীবনে কখনো হয়নি। আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে নিজের জায়গায় বসে পড়লাম। পরে এ আয়াতগুলো নাখিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে হাসতে হাসতে আমার কান ধরে বললেনঃ ছোকরাটার কান ঠিকই শুনেছিল। আল্লাহ নিজে তা সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। (ইবনে জারীর। এ বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা তিরমিযীতেও আছে)

১৬. অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদা মূলত আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট আর রসূলের মর্যাদা রিসালাতের কারণে এবং ইমানদারদের মর্যাদা তাদের ইমানের কারণে। এরপর থাকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ
أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصْدَقَ وَكُنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا
إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

২ রুকু'

হে^{১৭} সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়।^{১৮} যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। সে সময় সে বলবে : হে আমার রব, তুমি আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের মধ্যে शामिल হয়ে যেতাম। অথচ যখন কারো কাজের অবকাশ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় এসে যায় তখন আল্লাহ তাকে আর কোন অবকাশ মোটেই দেন না। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

কাফের, ফাসেক ও মুনাফিকদের মর্যাদার ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদায় তাদের কোন অংশ নেই।

১৭. যেসব লোক ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারা সত্যিকার ঈমানদার হোক বা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিদানকারী হোক, তাদের সবাইকে সন্মোদন করে একটি উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এর আগে আমরা কয়েকবার এ কথাটি বলেছি যে, কুরআন মজীদে **الَّذِينَ آمَنُوا** (যারা ঈমান এনেছো) কথাটি বলে কোন সময় সাক্ষাৎ ঈমানদারকে সন্মোদন করা হয়েছে। আবার কখনো মুনাফিকদের সন্মোদন করা হয়েছে। কারণ, তারাও মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়। আবার কখনো সাধারণভাবে সব শ্রেণীর মুসলমানদের সন্মোদন করা বুঝানো হয়। কোথায় কোন শ্রেণীর লোককে একথা ঘরা সন্মোদন করা হয়েছে তা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও পূর্বাপর অবস্থাই নির্দেশ করে দেয়।

১৮. বিশেষভাবে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ এসব স্বার্থের কারণে ঈমানের দাবী পূরণ না করে মুনাফিকী অথবা ঈমানের দুর্বলতা অথবা পাপাচার ও ন্যায়মানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তবে মূলত

এখানে দুনিয়ার এমন প্রতিটি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষকে এমনভাবে নিমগ্ন করে রাখে যে, সে আল্লাহর স্বরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়। আর আল্লাহর স্বরণ থেকে গাফিল হয়ে যাওয়াটাই সমস্ত অকল্যাণের উৎস। মানুষ যদি একথা স্বরণ রাখে যে, সে স্বাধীন নয়, বরং এক আল্লাহর বান্দা। আর সে আল্লাহ তার সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত, একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজ-কর্মের জবাবদিহি তাকে করতে হবে, তাহলে সে কখনো কোন খারাপ কাজ বা গোমরাহীতে লিপ্ত হতে পারবে না। মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন সময় তার পদঞ্চলন যদি ঘটেও তাহলে সন্থিত ফিরে পাওয়ায়াত্র সে সংযত ও সংশোধিত হয়ে যাবে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা মূলক

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আয়াত ৩০

সূরা আল মুল্ক-মক্কী

রুকু' ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَبْرَكَ الَّذِي يَدْرِى الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝
 الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَأَرِجْ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ۝

অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ^১ তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কর্তৃত্ব।^২ তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।^৩ কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।^৪ আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমালীলও।^৫ তিনিই স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান তৈরী করেছেন।^৬ তুমি রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোন প্রকার অসংগতি দেখতে পাবে না।^৭ আবার চোখ ফিরিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি^৮ দেখতে পাচ্ছ কি?

১. تَبْرَكَ - بركة শব্দ থেকে আধিক্য অর্থে গৃহীত। بركت শব্দটি শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, বৃদ্ধি, আধিক্য, স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা এবং অধিক পরিমাণে কল্যাণ ও নেকী অর্থ প্রকাশক। এর থেকে আধিক্য অর্থ প্রকাশক শব্দ গঠন করে تَبْرَكَ করা হলে তার অর্থ হয় তিনি অত্যধিক সম্মানিত ও মহান, নিজের সত্তা, গুণাবলী ও কাজ-কর্মে অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সত্তা থেকে অশেষ ও অগণিত কল্যাণের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ণতা চিরস্থায়ী। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাকহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪৩; আল মু'মিনুন, টীকা ১৪; আল ফুরকান, টীকা ১ ও ১৯)।

২. الْمَلِكُ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে এর কোন সীমিত অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। সুতরাং নিশ্চিতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্ব-জাহানের ওপর রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকার অর্থ এটা নয় যে, দৈহিক অংগ হিসেবে তাঁর কোন হাত আছে। বরং বাকরীতি অনুসারে শব্দটি অধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষার মত আমাদের ভাষাতেও যখন বলি যে, সব ক্ষমতা

অমুকের হাতে তখন তার অর্থ হয় সে-ই সব ক্ষমতার মালিক, অন্য কারো সেখানে কোন কর্তৃত্ব নেই।

৩. অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি কোন কাজ করতে চাইবেন অথচ করতে পারবেন না কোন কিছুই তাকে এরূপ অক্ষম করে দেয়ার মত নেই।

৪. অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর এ ধারাবাহিকতা চালু করেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, কোন মানুষটির কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্য। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বেশ কিছু সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। প্রথম হলো, মৃত্যু এবং জীবন তাঁরই দেয়া। আর কেউ জীবনও দান করতে পারে না, মৃত্যুও না। দ্বিতীয় হলো, মানুষ একটি সৃষ্টি, তাকে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার শক্তি দেয়া হয়েছে। তার জীবন বা মৃত্যু কোনটিই উদ্দেশ্যহীন নয়, সৃষ্টা তাকে এখানে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। জীবন তার জন্য পরীক্ষার সময় বা অবকাশ মাত্র। মৃত্যুর অর্থ হলো, তার পরীক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে। তৃতীয় হলো, এ পরীক্ষার জন্য সৃষ্টা সবাইকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। সে ভাল মানুষ না খারাপ মানুষ, এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে সে যাতে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। চতুর্থ হলো, কার কাজ ভাল এবং কার কাজ খারাপ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাই তার ফায়সালা করবেন। কাজের ভাল-মন্দ বিচার করার মানদণ্ড নির্ধারণ করা পরীক্ষার্থীর কাজ নয়, বরং পরীক্ষা গ্রহণকারীর কাজ। তাই যারাই পরীক্ষায় সফল হতে চাইবে, তাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষা গ্রহণকারীর দৃষ্টিতে ভাল কাজ কি? প্রথম বিষয়টি পরীক্ষা কথটির মধ্যেই নিহিত। তা হলো, যার কাজ যেমন হবে তাকে সে অনুপাতেই প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ ফলাফলই যদি না থাকে তাহলে পরীক্ষা নেয়ার আদৌ কোন অর্থ হয় না।

৫. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি হলো, তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং সবার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি জ্বালাম ও কঠোর নন। দ্বিতীয়টি হলো, দুর্কর্মকারীদের শাস্তি দেয়ার পুরো ক্ষমতা তাঁর আছে। এতো শক্তি কারো নেই যে তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যারা লজ্জিত হয়ে দুর্কর্ম পরিত্যাগ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের সাথে তিনি ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন।

৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাকহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৩৪; আর রা'দ, টীকা ২; আল হিজর টীকা ৮; আল হাজ্জ, টীকা ১১৩; আল মু'মিনুন, টীকা ১৫; আস সাফফাত, টীকা ৫ এবং আল মুমিন, টীকা ৯০।

৭. মূল আয়াতে تَفَاوُت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো সামঞ্জস্যহীনতা। এক বস্তুর সাথে আরেকটি বস্তু মিল না হওয়া, অমিল হওয়া বা খাপ না খাওয়া। সূত্রাং এ কথটির অর্থ হলো, গোটা বিশ্ব-জাহানের কোথাও তোমরা বিশৃংখলা, অবিন্যস্ততা ও অসংগতি দেখতে পাবে না। আল্লাহর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে কোন জিনিসই সামঞ্জস্যহীন ও খাপছাড়া নয়। এর প্রত্যেকটি অংশ পরস্পর বীধা এবং সেগুলোর মধ্যে পুরো মাত্রায় সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ⑧
 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
 وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ⑨ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
 وَيُئْسُ الْمَصِيرُ ⑩

তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।

আমি তোমাদের কাছের আসমানকে^{১০} সুবিশাল প্রদীপমালায় সজ্জিত করেছি।^{১০}
 আর সেগুলোকে শয়তানদের মেয়ে তাড়ানোর উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি।^{১১} এসব
 শয়তানের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

যেসব লোক তাদের রবকে অস্বীকার করেছে^{১২} তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের
 শাস্তি। সেটি অত্যন্ত খারাব জায়গা।

৮. মূল ব্যবহৃত শব্দটি হলো فطور -এর অর্থ কাটল, ছিদ্র, চিড়, ছেঁড়া, ভাঙা
 চোরা। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বীধন এতো মজবুত এবং পৃথিবীর একটি অণু থেকে
 বিশালকায় নীহারিকা মণ্ডলী পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু এমন সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে,
 বিশ্ব-জাহানের কোথাও শৃংখলার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তোমরা যতই অনুসন্ধান
 চালাও না কেন এর কোথাও কোন বিশৃংখলা দেখা যাবে না। (বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন
 তাক্বীমুল কুরআন, সূরা ক্বাফ, টীকা ৮)।

৯. কাছের আসমান অর্থ সে আসমান যার তারকারাজি এবং গ্রহসমূহকে আমরা খালি
 চোখে দেখতে পাই। এর চেয়েও দূরে অবস্থিত যেসব বস্তুকে দেখতে যন্ত্রের সাহায্য নিতে
 হয় তা হলো দূরের আসমান। আর যন্ত্রপাতির সাহায্যে যা দেখা যায় না তা হলো অধিক
 দূরবর্তী আসমান।

১০. মূলত مَصَابِيح শব্দটি এখানে অনিদিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনিদিষ্ট
 অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এসব প্রদীপের সুবিশাল হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কথাটির
 অর্থ হলো, আমি এ বিশ্ব-জাহানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জনমানবহীন করে সৃষ্টি করিনি। বরং
 তারকারাজি দ্বারা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছি। রাতের অন্ধকারে মানুষ যার জাঁকজমক ও
 দীপ্তিময়তা দেখে বিম্বয়ে অভিভূত হয়ে যায়।

১১. এর অর্থ এটা নয় যে, এসব তারকাকেই শয়তানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। আবার
 এ অর্থও নয় যে, শুধু শয়তানদেরকে মারার জন্যই উদ্ধার পতন ঘটে। বরং এর অর্থ হলো
 তারকারাজি থেকে যে অসংখ্য উদ্ধাপিও নির্গত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্ব-জাহানের
 সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এবং এরা অগণিত সংখ্যায় প্রতি মুহূর্তে ভূপৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে,

إِذَا الْقَوَا فِيهَا سَعَوْا لَهَا شَمِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۖ تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا
 أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُوهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۚ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَ
 نَاذِرٌ يَوْمَ فَكَّنَ بَنَّا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
 كَبِيرٍ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

তাদেরকে যখন সেখানে নিষ্ক্ষেপ করা হবে তখন তারা তার ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনেতে পাবে^{১৩} এবং তা টগবগ করে ফুটে থাকবে। অত্যধিক রোষে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তার মধ্যে কোন দলকে নিষ্ক্ষেপ করা হবে তখনই তার ব্যবস্থাপকরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সাবধানকারী আসেনি?^{১৪} তারা জবাব দেবে, হাঁ আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাথিল করেননি। তোমরাই বরং বিরাট ভুলের মধ্যে পড়ে আছো।^{১৫} তারা আরো বলবে : আহা! আমরা যদি গুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম,^{১৬} তাহলে আজ এ জ্বলন্ত আগুনে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতাম না।

সেগুলো পৃথিবীর শয়তানদের ঊর্ধ্ব জগতে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। তারা ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেও এ উদ্ধা পিণ্ডগুলো তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়টি বলার প্রয়োজন এ জন্য যে, গণকদের সম্পর্কে আরবের লোকেরা এ ধারণা পোষণ করতো যে, শয়তানরা তাদের অনুগত বা শয়তানদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। এসব শয়তানের মাধ্যমে তারা গায়েবের খবর পেয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে মানুষের ভাগ্য গণনা করতে পারে। গণকরা নিজেরাও এ দাবী করতো। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, শয়তানদের ঊর্ধ্ব জগতে ওঠা এবং সেখান থেকে গায়েবের খবর অবহিত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন : তাহহীমুল কুরআন, আল হিজর, টীকা ৯ থেকে ১২; আস দাফাত, টীকা ৬-৭।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ উদ্ধাগুলো আসলে কি? এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ কোন সিদ্ধান্ত দিতে এখনো অক্ষম। তা সত্ত্বেও আধুনিককালে যেসব তত্ত্ব ও বাস্তব অবস্থা মানুষের জ্ঞানের আওতায় এসেছে এবং ভূপৃষ্ঠে পতিত উদ্ধাপিণ্ডসমূহের পর্যবেক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তত্ত্বটি হলো : এসব উদ্ধাপিণ্ড কোন গ্রহে বিস্ফোরণের কারণে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াতে থাকে এবং কোন এক পর্যায়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এসে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। (দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৬৭ইং সংস্করণ, ১৫ খণ্ড, শব্দ—Meteorites)

১২. অর্থাৎ মানুষ হোক কিংবা শয়তান যারাই তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, এটাই হয়েছে তাদের পরিণাম। (রবের সাথে কুফরী করা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তাকহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১৬১; আন নিসা, টীকা ১৭৮; আল কাহাফ, টীকা ৩৯; আল মু'মিন, টীকা ৩)।

১৩. মূল ইবারতে شريك শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহান্নামের শব্দ। আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে। সূরা হূদের ১০৬ আয়াত থেকে দ্বিতীয় অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ দোষখীরা দোষখের মধ্যে হাঁপাতে, গোছাতে এবং হাঁসফাস করতে থাকবে। আর সূরা ফুরকানের ১২ আয়াত থেকে প্রথমোক্ত অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, নোযখের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্রোধ ও প্রচণ্ড উদ্বেজনার শব্দ শুনতে পাবে। এসবের প্রেক্ষিতে সঠিক অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এটি খোদ জাহান্নামের ক্রোধের শব্দ ও জাহান্নামবাসীদের চিৎকার-ধ্বনিও।

১৪. এ প্রশ্নের ধরন আসলে প্রশ্নের মত হবে না এবং তাদের কাছে কোন সতর্ককারী এসেছিল কিনা জাহান্নামের কর্মচারীরা তাদের কাছে তা জানতেও চাইবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হবে তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি আদায় করা যে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি কোন বেইনসাক্ষী করা হচ্ছে না। তাই তারা তাদের মুখ থেকেই এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করতে চেষ্টা করবেন যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে বেখবর রাখেননি। তিনি তাদের কাছে নবী পাঠিয়েছিলেন, সত্য কি ও সঠিক পথ কোনটি তা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ সত্য ও সঠিক পথের বিপরীত পথে চলার পরিণাম স্বরূপ যে তাদের এ জাহান্নামের স্থানানি হতে হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আজ সে জাহান্নামেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু তারা নবীদের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে এখন যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তারা আসলে তার উপযুক্ত।

কুরআন মজীদে এ বিষয়টি বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একটি পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষাটি নেয়ার পদ্ধতি এমন নয় যে, মানুষকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত রেখে সঠিক পথে সে চলে কিনা তা দেখা হচ্ছে। বরং তাকে সঠিক পথ চিহ্নিয়ে দেয়ার জন্য যে সম্ভাব্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল মহান আল্লাহ তা পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করেছেন। সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নবী-রসূল পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবসমূহ নাখিল করা হয়েছে। মানুষ আশিয়া আলাইহিসুস সালামকে এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন সেগুলোকে মেনে নিয়ে সঠিক পথে চলবে, না তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি ও মনগড়া ধ্যান-ধারণার পেছনে ছুটবে, এখন তাদের সমস্ত পরীক্ষা এ একটিমাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবুওয়াত মহান আল্লাহর একটি প্রমাণ। এভাবে তিনি মানুষের সামনে তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা মানা বা না মানার ওপরে মানুষের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। নবী-রসূলের আগমনের পর কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা না জানানোর ওজর পেশ করতে পারে

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ وَأَجْمِرُوا بِهِ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ^{১৭} স্বীকার করবে। এ দোষখবাসীদের ওপর আল্লাহর নানত।

যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে,^{১৮} নিশ্চয়ই তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার।^{১৯} তোমরা নীচু স্বরে চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলো (আল্লাহর কাছে দু'টোই সমান) তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।^{২০} যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না?^{২১} অথচ তিনি সৃষ্টিদর্শী^{২২} ও সব বিষয় ভালভাবে অবগত।

না। তাকে না জানিয়ে অলক্ষেই এতো বড় পরীক্ষা নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এখন বিনা অপরাধেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে, এ ওজর তার ধোপে টিকবে না। এ বিষয়টি এতো অধিকবার বিভিন্নভাবে কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করাও কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত স্থানগুলোর উল্লেখ করা যায় : তাকহীমুল কুরআন, আল বাকারা, আয়াত ২১৩, টীকা ২৩; আন নিসা, আয়াত ৪১-৪২, টীকা ৬৪, আয়াত ১৬৫, টীকা ২০৮; আল আনআম, আয়াত ১৩০-১৩১, টীকা ৯৮ থেকে ১০০; বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৫, টীকা ১৭, ত্বাহা, আয়াত ১৩৪, আল কাসাস, আয়াত ৪৭, টীকা ৬৬, আয়াত ৫৯, টীকা ৮৩, আয়াত ৬৫; ফাতের, আয়াত ৩৭; আল মু'মিন, আয়াত ৫০, টীকা ৬৬।

১৫. অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত আবার যারা তোমাদের ওপর ঈমান এনেছে তারাও চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

১৬. অর্থাৎ আমরা যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে নবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করতাম। এখানে শোনার কাজকে বুঝার কাজের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ হলো, প্রথমে নবীর শিক্ষা অগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত। চিন্তা-ভাবনা করে তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর্যায় আসে এর পরে। নবীর দিকনির্দেশনা ছাড়া নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সরাসরি সঠিক পথ লাভ করা যায় না।

১৭. অপরাধ কথাটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে যে কারণে তারা জাহান্নামের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তা হলো রসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা এবং তাদেরকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করা। অন্যসব অপরাধ এরি ডাল-পালা মাত্র।

১৮. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এটিই হলো নৈতিকতার মূল। কেউ যদি খারাপ কাজ থেকে শুধু এ জন্য বিরত থাকে যে, তার নিজের বিবেক-বুদ্ধির বিচারে কাজটি খারাপ কিংবা সব মানুষ সেটিকে খারাপ মনে করে কিংবা তা করলে পার্থিব জীবনে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে কিংবা এ জন্য কোন পার্থিব শক্তির তাকে পাকড়াও করার ভয় আছে তা হলে সেটি হবে নৈতিকতার একটি অস্থায়ী ভিত্তি। মানুষের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ভুলও হতে পারে। বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতার কারণে সে একটি ভাল জিনিসকে মন্দ এবং একটি মন্দ জিনিসকে ভাল মনে করতে পারে। ভাল ও মন্দ যাচাই করার পার্থিব মানদণ্ড প্রথমত এক রকম নয়। এ ছাড়াও তা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। দুনিয়ার নৈতিক দর্শনে কোন বিশ্বজনীন ও স্থায়ী মানদণ্ড বর্তমানেও নেই অতীতেও ছিল না। পার্থিব ক্ষতির আশংকাও নৈতিকতার কোন স্বতন্ত্র মানদণ্ড নয়। দুনিয়ার জীবনে নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে শুধু এ ভয়ে যে ব্যক্তি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই, এমন অবস্থায় সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে না। একইভাবে কোন পার্থিব শক্তির কাছে জবাবদিহির আশংকাও এমন কিছু নয় যা একজন মানুষকে ভদ্র ও সং হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সবাই জানে, পার্থিব কোন শক্তিই দেখা ও না দেখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী নয়। তার দৃষ্টিতে বাইরে অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। যে কোন পার্থিব শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য কৌশল ও ফন্দি-ফিকির অবলম্বন সম্ভব। এ ছাড়াও পার্থিব শক্তির রচিত আইন ব্যবস্থা সব রকমের অপরাধকে তার আওতাধীন করতে পারে না। বেশীর ভাগ অপরাধই এমন পর্যায়ে, পার্থিব আইন-কানুন যার ওপর আদৌ কোন হস্তক্ষেপ করে না। অথচ পার্থিব আইন ব্যবস্থা যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সেগুলোর চেয়ে তা জঘন্য। তাই ইসলামী জীবন বিধান নৈতিকতার প্রাসাদ এমন একটি বুনিয়েদের ওপর নির্মাণ করেছে যার ভিত্তিতে অদৃশ্য আল্লাহর ভয়ে সব খারাপ কাজ বর্জন করতে হয়। যে আল্লাহ সর্বাবস্থায় মানুষকে দেখছেন, যার হস্তক্ষেপ ও পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করে মানুষ কোথাও যেতে সক্ষম নয়। যিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ যাচাইয়ের জন্য একটি সার্বিক, বিশ্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড দিয়েছেন, শুধু তাঁর ভয়ে মন্দ ও অকল্যাণকে বর্জন করা এবং ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করা এমন একটি কল্যাণকর নীতি যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। এ কারণটি ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে কোন মানুষ অন্যায় না করে কিংবা বাহ্যিকভাবে যেসব কাজ নেকীর কাজ বলে গণ্য হয় তা করে তাহলে তার এ নৈতিকতা আখেরাতে কোন মূল্য ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কারণ তা হবে বালির স্থূপের ওপর নির্মিত প্রাসাদের মতো।

১৯. অর্থাৎ না দেখে আল্লাহকে ভয় করার দু'টি অনিবার্য ফল আছে। এক, মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষের যে অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় তা মাফ করে দেয়া হবে। তবে তা এ শর্তে যে, তার গভীরে ও উৎসমূলে আল্লাহীতির অনুপস্থিতি যেন কার্যকর না থাকে। দুই, এ আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ যেসব নেক আমল করবে তার জন্য সে বিরাট পুরস্কার পাবে।

২০. একথাটি কাকের ও মু'মিন নির্বিশেষে গোটা মানব জাতিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। এতে মু'মিনের জন্য শিক্ষা হলো, দুনিয়ায় জীবন যাপনকালে তাকে তার মন-মগজে এ অনুভূতি কার্যকর রাখতে হবে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা ও কাজই

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٢٥﴾ ؕ أَمِنْتُمْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿٢٦﴾ ؕ أَمِنْتُمْ فِي السَّمَاءِ أَن يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿٢٧﴾

২ রুক'

তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। তোমরা এর বুকের ওপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও।^{২৩} আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।^{২৪} যিনি আসমানে আছেন^{২৫} তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, এ ব্যাপারে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী হাওয়া পাঠাবেন^{২৬} —এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সাবধানবাণী কেমন?^{২৭}

শুধু নয় তার নিয়ত ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত কোন কিছুই আল্লাহর অজানা নয়। আর কাকেরের জন্য এতে সাবধানবাণী হলো এই যে, আল্লাহকে ভয় না করে সে নিজ অবস্থানে থেকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু তার কোন একটি ব্যাপারও আল্লাহর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের আওতা বহির্ভূত নয়।

২১. এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে—তিনি কি তাঁর সৃষ্টিকেই জানবেন না? মূল ইবারতে مَنْ خَلَقَ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে “যিনি সৃষ্টি করেছেন”ও হতে পারে। আবার “যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন”ও হতে পারে। উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে। এটি ওপরের আয়াতাত্মক উল্লেখিত বক্তব্যের প্রমাণ। অর্থাৎ সৃষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকবেন তা কি করে সম্ভব? খোদ সৃষ্টি নিজের সম্পর্কে বেখবর বা অজ্ঞ থাকতে পারে। কিন্তু সৃষ্টা তার সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তোমাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীও তাঁর সৃষ্টি। তোমাদের প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাস তিনি চালু রেখেছেন বলেই তা চালু আছে। তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর ব্যবস্থাপনার অধীনে কাজ করছে। তাই তোমাদের কোন বিষয় তাঁর অগোচরে কি করে থাকতে পারে?

২২. আয়াতে طَیِّف শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হলো সূক্ষ্ম ও অনুভবযোগ্য নয় এমন পন্থায় কর্ম সম্পাদনকারী এবং আরেকটি অর্থ হলো গোপন তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী।

২৩. অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ নিজে থেকেই তোমাদের অনুগত হয়ে যায়নি। আর যে খাবার তোমরা লাভ করছো তাও আপনা থেকেই এখানে সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তাঁর হিকমত ও কুদরত দ্বারা এ পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে তোমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হচ্ছে এবং এ বিশাল গ্রহটি এমন শান্তিময় হয়ে উঠেছে যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এখানে চলাফেরা করছো। তোমাদের জন্য এটি এমন একটি নিয়ামতের তাওর হয়ে উঠেছে যে, তোমাদের জীবন যাপনের জন্য এখানে অসংখ্য উপকরণ বর্তমান আছে। যদি তোমরা গাফিল না হয়ে থাকো এবং কিছু বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে দেখো তাহলে জানতে পারবে, তু পৃষ্ঠকে তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী বানাতে এবং সেখানে রিযিকের অফুরন্ত তাওর সৃষ্টি করতে কি পরিমাণ বুদ্ধি ও কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে। (দেখুন, তাক্বীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৩, ৭৪ ও ৮১; ইয়াসীন, টীকা ২৯, ৩২; আল মুমিন, টীকা ৯০, ৯১; আয যুখরুফ, টীকা ৭; আল জাসিয়া, টীকা ৭; ক্বাফ, টীকা ১৮)

২৪. অর্থাৎ এ পৃথিবীর বৃকে বিচরণ করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও। কিন্তু একথা ভুলে যেও না যে, একদিন তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

২৫. এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, আল্লাহ আসমানে থাকেন। বরং কথাটি এভাবে বলার কারণ হলো, মানুষ যখনই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তখনই সে আসমানের দিকে তাকায়, দোয়া করার সময় আসমানের দিকে হাত উঠায়, কোন বিপদের সময় সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা ও অবলম্বন থেকে নিরাশ হয়ে গেলে আসমানের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে। আকস্মিকভাবে কোন বিপদ আপতিত হলে বলে, এটি ওপর থেকে নাযিল হয়েছে। অব্যতাবিকভাবে পাওয়া কোন জিনিস সম্পর্কে বলে এটি উর্ধ জগত থেকে এসেছে। আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি একটি কাল দাসীকে সাথে করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললোঃ একজন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আমি কি এই দাসীটিকে মুক্ত করতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীটিকে জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহ কোথায়? সে আংগুল দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করে দেখালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন : আমি কে? সে প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এবং পরে আসমানের দিকে ইশারা করলো। এভাবে তার উদ্দেশ্য বুঝা যাচ্ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : একে মুক্ত করে দাও, এ ঈমানদার। (মুয়াত্তা, মুসলিম ও নাসায়ী হাদীসগ্রন্থেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে)। হযরত উমর (রা) হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা সম্পর্কে একবার বলেন যে, তিনি এমন এক মহিলা যার আবেদন সাত আসমানের ওপর থেকে কবুল করা হয়েছে। (সূরা মুজাদালায় তাক্বীমুল কুরআন ২নং টীকায় আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি।) এসব কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষ যখন আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে তখন স্বভাবতই তার মন নিচে মাটির দিকে যায় না। বরং ওপরে আসমানের দিকে যায়। এদিকে লক্ষ রেখেই এখানে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে مَنْ فِي السَّمَاءِ (যিনি আসমানে

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝
 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ
 فَوْقَهُمْ صَفًى وَيُقْبَضْنَ بِمَا يَسْكُمْنَ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۝
 أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جَنَدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ
 إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝
 أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ جَوَابِي
 عِتْوٍ وَنِفَورٍ ۝
 أَمَّنْ يَمْشِي مَكْبًا ۚ عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا
 عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ফলে দেখো, আমার পাকড়াও কত কঠিন হয়েছিল।^{২৮} তারা কি মাথার ওপর উড়ন্ত পাখীগুলোকে ডানা মেলতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না? রহমান ছাড়া আর কেউ নেই যিনি তাদেরকে ধরে রাখেন।^{২৯} তিনিই সবকিছুর রক্ষক।^{৩০} বলো তো, তোমাদের কাছে কি এমন কোন বাহিনী আছে যা রহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে?^{৩১} বাস্তব অবস্থা হলো, এসব কাফেররা ধোঁকায় পড়ে আছে মাত্র। অথবা বলো, রহমান যদি তোমাদের রিযিক বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কেউ আছে, যে তোমাদের রিযিক দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্য বিমুখতায় বদ্ধপরিকর। ভেবে দেখো, যে ব্যক্তি মুখ নিচু করে পথ চলছে^{৩২} সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত, না যে ব্যক্তি মাথা উচু করে সোজা হয়ে সমতল পথে হাঁটছে সে-ই সঠিক পথ প্রাপ্ত?

আছেন। কথাটি বলা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলাকে আসমানে অবস্থানকারী বলে ঘোষণা করছে। কি করে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে? এ সূরা মূলকেরই শুরুতে বলা হয়েছে, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ ۝
 الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ ۝
 (তিনি, স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন) সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে, فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فُتُومَ وَجْهِ اللَّهِ তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেটিই আল্লাহর দিক।

২৬. এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এ পৃথিবীতে তোমাদের টিকে থাকা এবং নিরাপত্তা লাভ করা সবসময় মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার ওপর নির্ভর করে। তোমরা আপন শক্তির জোরে এ পৃথিবীতে সুখের জীবন যাপন করছো না। তোমাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত, যা এখানে অতিবাহিত হচ্ছে, তার সবই আল্লাহর হিফাযত ও তত্ত্বাবধানের

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ۝

এদেরকে বলো, আল্লাহই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের শবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। ৩৩

এদেরকে বলো, আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে। ৩৪ এরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো এ ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে? ৩৫ বলো, এ বিষয়ে জ্ঞান আছে শুধু আল্লাহর নিকট। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। ৩৬ তারপর এরা যখন ঐ জিনিসকে কাছেই দেখতে পাবে তখন যারা অস্বীকার করেছে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে। ৩৭ আর তাদেরকে বলা হবে, এতো সেই জিনিস যা তোমরা চাচ্ছিলে।

ফল। অন্যথায় তাঁর ইংগিতে যে কোন সময় এ পৃথিবীতে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে এবং এ পৃথিবী তোমাদের জন্য মায়ের স্নেহময় কোল না হয়ে কবরে পরিণত হতো। অথবা যে কোন সময় এমন ঝড় ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের জনপদকে ধ্বংস করে ফেলবে।

২৭. সাবধানবাণী মানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছিল, যদি তোমরা কুফরী ও শিরক থেকে বিরত না হও এবং তাওহীদের যে আহ্বান তোমাদের জানানো হচ্ছে তাতে সাড়া না দাও তাহলে আল্লাহর আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

২৮. ইতিপূর্বে যেসব কওম তাদের কাছে আসা নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে নিপতিত হয়েছিলো তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

২৯. অর্থাৎ শূন্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখি করুণাময় আল্লাহর হিকায়তে থেকে উড়ে থাকে। তিনি প্রতিটি পাখিকে এমন দৈহিক কাঠামো দান করেছেন যার সাহায্যে তারা উড়ে

বেড়াবার যোগ্যতা লাভ করেছে। তিনিই প্রতিটি পাখিকে উড়তে শিখিয়েছেন। তিনিই বাতাসকে এমন সব নিয়ম-কানূনের অধীন করে দিয়েছেন যে কারণে বাতাসের চেয়ে ভারী দেহের অধিকারী বস্তুসমূহের পক্ষেও বাতাসে ভর দিয়ে উড়া সম্ভব। আর উড়তে সক্ষম প্রতিটি বস্তুকে তিনিই শূন্য ধরে রাখেন। তা না হলে আল্লাহ তাঁর হিফায়ত উঠিয়ে নেয়া মাত্রই তা মাটিতে পড়ে যেতো।

৩০. অর্থাৎ গুটিকয়েক পাখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর হিফায়ত করার কারণে টিকে আছে। প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন তা তিনিই যোগান দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী ঠিকমত পৌঁছানোর ব্যবস্থা তিনিই করেন।

৩১. আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, “রহমান ছাড়া এমন আর কে আছে যে তোমার সৈন্যবাহিনী হয়ে তোমাকে সাহায্য করবে?” আমি যে অনুবাদ করেছি তা পরের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদটি পূর্বের বক্তব্যগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

৩২. অর্থাৎ জব্ব-জানোয়ারের মতো মুখ নিচু করে ঐ একই পথে চলছে যে পথে কেউ তাদেরকে একবার চালিয়ে দিয়েছে।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, জব্ব-জানোয়ার করে পাঠাননি। তোমাদের কাজ তো এ ছিল না যে, দুনিয়ায় যে গোমরাহী বিস্তারলাভ করে আছে তোমরা চোখ বন্ধ করে তাই মেনে চলবে, ভেবেও দেখবে না, যে পথে তোমরা চলছো তা সঠিক কিনা। কেউ যদি তোমাদের সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা করে, তার কথা তোমরা কানেই তুলবে না এবং তোমাদের মন-মস্তিষ্কে আগে থেকে জ্বেকে বসা অসত্য ও অন্যায়কে আঁকড়ে থাকবে এ উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এ কান দেয়া হয়নি। এ চোখ তো এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা অন্ধের মতো অন্যের অনুসরণ করবে। যর্গীন থেকে আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনসমূহ আল্লাহর রসূলের পেশকৃত তাওহীদের সাক্ষ দিচ্ছে কি না এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা খোদাহীন বা বহুখোদার পরিচালনাধীন হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তোমরা তা দেখবে না এ জন্য এ চোখ তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। এ মন-মস্তিষ্কও তোমাদের এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার কাজ অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াতে এমন সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চলবে যা অন্য কেউ চালু করেছে। তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে এতোটুকুও ভেবে দেখবে না যে, তা সঠিক না ভ্রান্ত। জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি এবং শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির এ নিয়ামত আল্লাহ তোমাদের দিয়েছিলেন ন্যায় ও সত্যকে চেনার জন্য। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো। এসব উপকরণের মাধ্যমে তোমরা সব কাজই করছো। কিন্তু যে জন্য তা তোমাদের দেয়া হয়েছিলো সে একটি কাজই মাত্র করছো না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন; তাহসীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ৭২-৭৩; আল মু'মিনুন, টীকা ৭৫-৭৬; আস সাজদা, টীকা ১৭-১৮; আল আহকাফ, টীকা ৩১)

৩৪. অর্থাৎ মৃত্যুভয়ের পরে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে পরিবেষ্টিত করে আনা হবে এবং আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكْنِي اللهُ وَمِنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمِنْ يَجْزِي
 الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ ۝ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ اَمْنَابِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ
 غَوْرًا فَمِنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ۝

তুমি এদেরকে বলো, তোমরা কখনো এ বিষয়টি ভেবে দেখেছো কি যে, আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের ওপর রহম করেন তাতে কান্দিদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? ৩৮ এদেরকে বলো, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, আমরা তাঁর ওপর ইমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করেছি। ৩৯ তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিজ্ঞানের মধ্যে ডুবে আছে? এদেরকে বলো, তোমরা কি এ বিষয়ে কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো যে, যদি তোমাদের কুয়াগুলোর পানি মাটির গভীরে নেমে যায় তাহলে পানির এ বহমান স্রোত কে তোমাদের ফিরিয়ে এনে দেবে? ৪০

৩৫. এভাবে প্রশ্ন করে তারা কিয়ামতের সময় ও তার দিন তারিখ জানতে চাইতো না। তারা এ উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতো না যে, তাদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সন, মাস, দিন ও সময় বলে দিলে তারা তা স্বীকার করে নেবে। বরং তারা মনে করতো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আর তা মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটা বাহানা হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্ন তারা করতো। তাদের মূল বক্তব্য হলো, তুমি আমাদেরকে কিয়ামতের যে অদ্ভুত কাহিনী শুনাচ্ছে, তা কখন আত্মপ্রকাশ করবে? কোন সময়ের জন্য তা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে? আমাদের চোখের সামনে এনে তা দেখিয়ে দিচ্ছে না কেন? দেখিয়ে দিলেই তো আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যেতো। এ বিষয়ে একটি কথা ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, কেউ কিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করলে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাই করতে পারে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। এখন থেকে যায় কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখ সম্পর্কিত বিষয়টি। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলোচনায় কোন অকাটা মুখই কেবল এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। কারণ, দিন তারিখ বলে দিলেও তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হবে না। স্বীকারকারী তখন বলবে, যখন তা তোমাদের দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে সংঘটিত হবে, তখন মেনে নেবো। আজ আমি কি করে একথা বিশ্বাস করবো যে, তোমার দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, লোকমান, টীকা ৬৩; আল আহযাব, টীকা ১১৬; সাবা, টীকা ৫-৪৮; ইয়াসীন, টীকা ৪৫)

৩৬. অর্থাৎ একথা তো আমার জানা যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আর তার আসার আগে মানুষকে সাবধান করে দেয়ার জন্য এতোটুকু জানাই যথেষ্ট। তবে কখন আসবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমি সে সম্পর্কে কিছু জানি না। আর সাবধান করে দেয়ার জন্য সে বিষয়ে জ্ঞান থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভালভাবে বুঝা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি কখন মারা যাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তবে আমরা এতোটুকু জানি যে, প্রত্যেককেই এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এখন আমাদের এ জ্ঞানটুকু আমাদের কোন অসতর্ক প্রিয়জনকে মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট। যাতে সে যথাযথভাবে তার স্বার্থের হিফায়ত করতে পারে। এতোটুকু সাবধান করে দেয়ার জন্য সে কোনদিন মারা যাবে তা জানা জরুরী নয়।

৩৭. অর্থাৎ কোন অপরাধীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে যে অবস্থা হয় তাদের অবস্থাও ঠিক তাই হবে।

৩৮. মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের সূচনা হলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এতে মক্কার প্রতিটি পরিবার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে অভিলাপ দেয়া শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে যাদুটোনা বা তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হলো, যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান। এমনকি হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকলো। তাই এখানে বলা হয়েছে, এদের বলো, আমরা ধ্বংস হয়ে যাই বা আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কি লাভ? আল্লাহর আযাব এলে তোমরা নিজেরা কিভাবে নিকৃতি পাবে সে চিন্তা করতে থাকো।

৩৯. অর্থাৎ আমরা আল্লাহর ওপরে ঈমান এনেছি আর তোমরা তাঁকে অস্বীকার করে চলেছো। আমরা ভরসা করি একমাত্র আল্লাহর ওপর আর তোমরা ভরসা করো তোমাদের দল, পার্থিব উপায়-উপকরণ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সব উপাস্য দেব-দেবীদের ওপর। তাই আমরাই আল্লাহর রহমত লাভের উপযুক্ত, তোমরা নও।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এমন শক্তির অধিকারী আছে কি; যে এসব ঋণাধারা আবার প্রবাহিত করে দেবে? যদি না থাকে আর তোমরা ভাল করেই জানো যে, নেই। তাহলে ইবাদত লাভের যোগ্য আল্লাহ না তোমাদের উপাস্যরা যাদের ঐ ঋণাধারাগুলো প্রবাহিত করার কোন সামর্থ নেই। এখন তোমরা নিজের বিবেককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে দেখো যে, যারা এক আল্লাহকে মানে তারাই গোমরাহ না যারা শিরকে লিপ্ত আছে তারাই গোমরাহ?

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা বালাদ থেকে সূরা আলাক

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আল বালাদ

৯০

নামকরণ

প্রথম আয়াত **لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ** এর আল বালাদ শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাখিলের সময়-কাল

এই সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী মক্কা মুআযযমার প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতোই। তবে এর মধ্যে একটি ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এই সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নাখিল হয়েছিল যখন মক্কার কাকেররা নবী সাদ্ভান্নাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালানো নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

একটি অনেক বড় বিষয়বস্তুকে এই সূরায় মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্ণ জীবন দর্শন, যা বর্ণনার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থের কলবরও যথেষ্ট বিবেচিত হতো না তাকে এই ছোট সূরাটিতে মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা ও প্রকাশ পদ্ধতির পূর্ণতার প্রমাণ। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা বুঝিয়ে দেয়া। মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এখন মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।

প্রথমে মক্কা শহরকে, এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাদ্ভান্নাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে এবং সমগ্র মানব জাতির অবস্থাকে এই সত্যটির সপক্ষে এই মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এই দুনিয়াটা মানুষের জন্য কোন আরাম আয়েশের জায়গা নয়। এখানে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আনন্দ উদ্ভাস করার জন্য তাকে পয়দা করা হয়নি। বরং এখানে কষ্টের মধ্যেই তার জন্য হয়েছে। এই বিষয়বস্তুটিকে সূরা আন নাম্বরের **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا فَسَادٌ** (মানুষ যতটুকু প্রচেষ্টা চালাবে ততটুকুর ফলেরই সে অধিকারী হবে) আয়াতটির সাথে মিলিয়ে দেখলে একথা একেবারে

সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার এই কর্মচাঞ্চল্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার কর্মতৎপরতা, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার ওপর।

এরপর মানুষই যে এখানে সবকিছু এবং তার ওপর এমন কোন উচ্চতর ক্ষমতা নেই যে তার কাজের তত্ত্বাবধান করবে এবং তার কাজের যথাযথ হিসেব নেবে, তার এই ভুল ধারণা দূর করে দেয়া হয়েছে।

তারপর মানুষের বহুতর জাহেলী নৈতিক চিন্তাধারার মধ্য থেকে একটিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়ায় সে অহংকার ও প্রেষ্ঠত্বের যেসব ভুল মানদণ্ডের প্রচলন করে রেখেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়াই করার জন্য বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেও নিজের এই বিপুল ব্যয় বহরের জন্য গর্ব করে এবং লোকেরা তাকে বাহবা দেয়। অথচ যে সর্বশক্তিমান সত্তা তার কাজের তত্ত্বাবধান করছেন তিনি দেখতে চান, সে এই ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ মনোভাব সহকারে এসব ব্যয় করেছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন, আমি মানুষকে জ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণ এবং চিন্তা ও উপলব্ধির যোগ্যতা দিয়ে তার সামনে ভালো ও মন্দ দু'টো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছি। একটি পথ মানুষকে নৈতিক অধপাতে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। বরং তার প্রবৃত্তি সাধ মিটিয়ে দুনিয়ার সম্পদ উপভোগ করতে থাকে। দ্বিতীয় পথটি মানুষকে নৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি দুর্গম গিরিপথের মতো। এ পথে চলতে গেলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটাতে হয়। কিন্তু নিজের দুর্বলতার কারণে মানুষ এই গিরিপথে ওঠার পরিবর্তে গভীর খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়াই বেশী পছন্দ করে।

তারপর যে গিরিপথ অতিক্রম করে মানুষ ওপরের দিকে যেতে পারে সেটি কি তা আল্লাহ বলেছেন। তা হচ্ছে : গর্ব ও অহংকার মূলক এবং লোক দেখানো ও প্রদর্শনী মূলক ব্যয়ের পথ পরিত্যাগ করে নিজের ধন-সম্পদ এতিম ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দীনের প্রতি ইমান আনতে হবে আর ইমানদারদের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এমন একটি সমাজ গঠনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, যা ধৈর্য সহকারে সত্যপ্রীতির দাবী পূরণ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে। এই পথে যারা চলে তারা পশ্চিমে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়। বিপরীত পক্ষে অন্যপথ অবলম্বনকারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। সেখান থেকে তাদের বের হবার সমস্ত পথই থাকবে বন্ধ।

আয়াত ২০

সূরা আল বালাদ-মকী

কক্ব' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لَا أَقْسِرُ بِمَظْهَرِ الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِمَظْهَرِ الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٌ وَمَا
وَلَدٌ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ
عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝

না,^১ আমি কসম খাচ্ছি এই নগরের।^২ আর অবস্থা হচ্ছে এই যে (হে নবী!) তোমাকে এই নগরে হালাল করে নেয়া হয়েছে।^৩ কসম খাচ্ছি বাপের এবং তার ঔরসে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার।^৪ আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।^৫ সে কি মনে করে রেখেছে, তার ওপর কেউ জোর খাটাতে পারবে না?^৬

১. ইতিপূর্বে সূরা কিয়ামাহর ১ টীকায় “না” বলে বক্তব্য শুরু করে তারপর কসম খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছি। সেখানে আমি বলেছি, এভাবে বক্তব্য শুরু করার মানে হয়, লোকেরা কোন ভুল কথা বলছিল, তার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, আসল কথা তা নয় যা তোমরা মনে করছো বরং আমি অমুক অমুক জিনিসের কসম খেয়ে বলছি আসল ব্যাপার হচ্ছে এই। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, যে কথার প্রতিবাদে এই ভাষণটি ন্যায্য হয়েছে সেটি কি ছিল? এর জবাবে বলা যায়, পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টি একথা প্রকাশ করছে। মক্কার কাকেররা বলছিল, আমরা যে ধরনের জীবনধারা অবলম্বন করেছি তাতে কোন দোষ নেই, কোন গলদ নেই। খাও-দাও ফুটি করো, তারপর একদিন সময় এলে টুন করে মরে যাও, ব্যাস, এই তো দুনিয়ার জীবন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খামখা আমাদের এই জীবনধারাকে ক্রটিপূর্ণ গণ্য করছেন এবং আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন, এসব ব্যাপারে আবার নাকি আমাদের একদিন জবাবদিহি করতে হবে এবং নিজেদের কাজের জন্য আমাদের শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করতে হবে।

২. অর্থাৎ মক্কা নগরের। এখানে এই নগরের কসম কেন খাওয়া হচ্ছে সে কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। মক্কাবাসীরা নিজেরাই তাদের নগরের পটভূমি জানতো। তারা জানতো, কিভাবে পানি ও বৃষ্ণলতাহীন একটি ধূসর উপত্যকায় নির্জন পাহাড়ের

মাঝখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের এক স্ত্রী ও একটি দুধের বাচ্চাকে এখানে এনে নিঃসংগভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিতাবে এখানে একটি ঘর তৈরি করে হজ্জের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ বহু দূর-দূরান্তে এই ঘোষণা শোনারও কেউ ছিল না। তারপর কিতাবে একদিন এই নগরটি সমগ্র আরবের কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং এমন একটি 'হারম'-সম্মানিত স্থান হিসেবে গণ্য হলো, যা শত শত বছর পর্যন্ত আরবের সরঞ্জামিনে, যেখানে আইন শৃংখলার কোন অস্তিত্বই ছিল না সেখানে এই নগরটি ছাড়া আর কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না।

৩. মূলে বলা হয়েছে اِنَّتَ حَلَّ بِهٰذَا الْبَلَدِ । মুফাস্সিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, তুমি এই শহরে 'মুকীম' অর্থাৎ মুসাফির নও। তোমার 'মুকীম' হবার কারণে এই শহরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে গেছে। দুই, যদিও এই শহরটি 'হারম' তবুও এমন এক সময় আসবে যখন কিছুক্ষণের জন্য এখানে যুদ্ধ করা তোমার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তিন, এই শহরের বনের পশুদের পর্যন্ত মেরে ফেলা এবং গাছপালা পর্যন্ত কেটে ফেলা আরববাসীদের নিকট হারাম এবং সবাই এখানে নিরাপত্তা লাভ করে। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে হে নবী, তোমার জন্য এখানে কোন নিরাপত্তা নেই। তোমাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়া এবং তোমাকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন করা হালাল করে নেয়া হয়েছে। যদিও এখানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে তিনটি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে তবুও পরবর্তী বিষয়কস্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, প্রথম অর্থ দু'টি এর সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না এবং তৃতীয় অর্থটির সাথে এর মিল দেখা যায়।

৪. যেহেতু বাপ ও তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানদের ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের দিকে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই বাপ মানে আদম আলাইহিস সালামই হতে পারেন। আর তাঁর ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান বলতে দুনিয়ায় বর্তমানে যত মানুষ পাওয়া যায়, যত মানুষ অতীতে পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

৫. ওপরে যে কথাটির জন্য কসম খাওয়া হয়েছে এটিই সেই কথা। মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার মানে হচ্ছে এই যে, এই দুনিয়ায় আনন্দ উপভোগ করার ও আরামে শুয়ে শুয়ে সুখের বাঁশী বাজাবার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তার জন্য এ দুনিয়া পরিশ্রম, মেহনত ও কষ্ট করার এবং কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার জায়গা। এই অবস্থা অতিক্রম না করে কোন মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। এই মক্কা শহর সাক্ষী, আল্লাহর কোন এক বান্দা এক সময় কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বলেই আজ এই শহরটি আবাদ হয়েছে এবং আরবের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই শহরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সাক্ষ দিচ্ছে, একটি আদর্শের খাতিরে তিনি নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন।

বন্য পশুদের পর্যন্ত এখানে নিরাপত্তা আছে কিন্তু তাঁর প্রাণের কোন নিরাপত্তা নেই। আর মায়ের গর্ভে এক বিন্দু শুক্র হিসেবে অবস্থান লাভের পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করা পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জীবন এই মর্মে সাক্ষ দিচ্ছে যে, তাকে প্রতি পদে পদে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত, বিপদ ও কঠিন অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। যাকে তোমরা দুনিয়ায় সবচেয়ে লোভনীয় অবস্থায় দেখছো সেও যখন

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدًا ۚ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۚ
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ
 النَّجْدَيْنِ ۚ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ
 فَكَّ رَقَبَةٍ ۚ أَوْ أَطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ
 أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ

সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।^১ সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখেনি? আমি কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহবা ও দু'টি ঠোঁট দেইনি? আমি কি তাকে দু'টি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি? কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।^২ তুমি কী জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কি? কোন গলাকে দাসত্বমুক্ত করা অথবা অনাহারের দিন কোন নিকটবর্তী এতিম বা ধুনি মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।^৩

মায়ের পেটে অবস্থান করছিল তখন সর্বক্ষণ তার মরে যাওয়ার ভয় ছিল। সে মায়ের পেটেই মরে যেতে পারতো। অথবা গর্ভপাত হয়ে তার দফারফা হয়ে যেতে পারতো। প্রসবকালে তার মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে মাত্র এক চুলের বেশী দূরত্ব ছিল না। জন্মলাভ করার পর সে এত বেশী অসহায় ছিল যে, দেখাশুনা করার কেউ না থাকলে সে একাকী পড়ে মরে যেতো। একটু হীটা চলার ক্ষমতা লাভ করার পর প্রতি পদে পদে আছাড় খেয়ে পড়তো। শৈশব থেকে যৌবন এবং তারপর বার্ধক্য পর্যন্ত তাকে এমন সব শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে যে, এর মধ্য থেকে কোন একটি পরিবর্তনও যদি ভুল পথে হতো তাহলে তার জীবন বিপর্যয় হতো। সে যদি বাদশাহ বা একনায়ক হয় তাহলে কোন্ সময় কোথাও তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র না হয় এই ভয়ে সে এক মুহূর্ত নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারে না। সে বিশ্ববিজয়ী হলেও তার সেনাপতিদের মধ্য থেকে কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বসে এই ভয়ে সে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে। সে নিজের যুগে কারুনের মতো ধনী হলেও কিভাবে নিজের ধন-সম্পদ আরো বাড়াবে এবং কিভাবে তা রক্ষা করবে, এই চিন্তায় সবসময় পেরেশান থাকে। মোটকথা কোন ব্যক্তিও নির্বিবাদে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার নিয়ামত লাভ করেনি। কারণ মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত ও কঠিন অবস্থার মধ্যে।

৬. অর্থাৎ এসব অবস্থার মধ্যে যে মানুষ ঘেরাও হয়ে আছে সে কি এই অহংকারে মত্ত হয়েছে যে, দুনিয়ায় সে যা ইচ্ছা করে যাবে, তাকে পাকড়াও করার ও তার মাথা নীচু করার মতো কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই? অথচ আখেরাত আসার আগে এই

দুনিয়াতেই সে প্রতি মুহূর্তে দেখছে, তার তকদীরের ওপর অন্য একজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে তার নিজের সমস্ত জারিজুরি, কলা-কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভূমিকম্পের একটি ধাক্কা, ঘূর্ণিঝড়ের একটি আঘাত এবং নদী ও সাগরের একটি জলোচ্ছ্বাস তাকে একথা বলে দেবার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় সে কতটুকু ক্ষমতা রাখে। একটি আকস্মিক দূর্ঘটনা একজন সুস্থ সবল সক্ষম মানুষকে পশু করে দিয়ে যায়। ভাগ্যের একটি পরিবর্তন একটি প্রবল পরাক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে আকাশ থেকে পাতালে নিক্ষেপ করে। উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থানকারী জাতিদের ভাগ্য যখন পরিবর্তিত হয় তখন এই দুনিয়ায় যেখানে তাদের চোখে চোখ মেলাবার হিম্মত কারোর ছিল না সেখানে তারা লালিত ও পদদলিত হয়। এহেন মানুষের মাথায় কেমন করে একথা স্থান পেলো যে, তার ওপর কারোর জোর খাটবে না?

৭. **اَنْفَقْتُ مَالًا لَّيْبًا** “আমি প্রচুর ধন-সম্পদ খরচ করেছি বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে **اَفْلَكْتُ مَالًا لَّيْبًا** “আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। এই শব্দগুলোই প্রকাশ করে, বক্তা তার ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে কী পরিমাণ গর্বিত। যে বিপুল পরিমাণ ধন সে খরচ করেছে নিজের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় তার কাছে তার পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, তা উড়িয়ে বা ফুকিয়ে দেবার কোন পরোয়াই সে করেনি। আর এই সম্পদ সে কোন্ কাজে উড়িয়েছে? কোন প্রকৃত নেকীর কাজে নয়, যেমন সামনের আয়াতগুলো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বরং এই সম্পদ সে উড়িয়েছে নিজের ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য। তোশামোদকারী কবিদেরকে সে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেছে। বিবাহ ও শোকের মজলিসে হাজার হাজার লোককে দাওয়াত দিয়ে আহ্বান করিয়েছে। জুয়া খেলায় গো-হারা হেরে বিপুল পরিমাণ অর্থ খুইয়েছে। জুয়ায় জিতে শত শত উট জবাই করে ইয়ার বন্ধুদের ভূরি ভোজন করিয়াছে। মেলায় ধুমধাম করে গিয়েছে এবং অন্যান্য সরদারদের চাইতে অনেক বেশী জীকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়েছে। উৎসবে অটেল খাবার তৈরি করেছে এবং যে চায় সে এসে খেয়ে যেতে পারে বলে সব মানুষকে খাবার জন্য সাধারণ আহ্বান জানিয়েছে অথবা নিজের বাড়িতে প্রকাশ্য লংঘরখানা খুলে দিয়েছে, যাতে দূর-দূরান্তে একথা ছড়িয়ে পড়ে যে, অমুক ধনীর দানশীলতার তুলনা নেই। এসব এবং এই ধরনের আরো অনেক প্রদর্শনীমূলক ব্যয় বহর ছিল যেগুলোকে জাহেলী যুগে মানুষের দানশীলতা ও ঔদার্যের নিদর্শন এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের নিশানী মনে করা হতো। এসবের জন্য তাদের প্রশংসার ডঙ্কা বাজতো, তাদের প্রশংসায় কবিতা রচিত ও পঠিত হতো এবং তারা নিজেরাও এজন্য অন্যের মোকাবেলায় নিজেদের গৌরব করে বেড়াতো।

৮. অর্থাৎ এই গৌরবকারী কি দেখে না, ওপরে আল্লাহও একজন আছেন? তিনি দেখছেন সবকিছু। কোন্ পথে সে এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে, কোন্ কাজে ব্যয় করেছে এবং কি উদ্দেশ্যে, কোন্ নিয়তে ও স্বার্থে সে এসব কাজ করেছে তা তিনি দেখছেন। সে কি মনে করে, আল্লাহর ওখানে এই অমিতব্যয়িতা, খ্যাতিলাভের আকাংক্ষা ও অহংকারের কোন দাম হবে? সে কি মনে করে, দুনিয়ায় মানুষ যেমন তার কাজেকর্মে প্রভাবিত হয়েছে তেমনি আল্লাহও প্রভাবিত হবেন?

৯. এর অর্থ হচ্ছে, আমি কি তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপকরণগুলো দেইনি? দু'টি চোখ মানে গল্প ছাগলের চোখ নয়, মানুষের চোখ। যে চোখ মেলে তাকালে চারদিকে এমনসব নিশানী নজরে পড়বে, যা মানুষকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেবে এবং তাকে ভুল ও নির্ভুল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। জিহবা ও ঠোঁট মানে নিছক কথা বলার যন্ত্র নয় বরং যে ব্যক্তি কথা বলে এবং ঐ যন্ত্রগুলোর পেছনে বসে যে ব্যক্তি চিন্তা যোগায় তারপর মনের কথা প্রকাশ করার জন্যে তার সাহায্য গ্রহণ করে।

১০. অর্থাৎ শুধুমাত্র বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার জন্য ছেড়ে দেইনি। বরং তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। তার সামনে ভালো ও মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দু'টি পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। সূরা দাহরেও এই একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : “আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত বীর্ষ থেকে পয়দা করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।” (২-৩ আয়াত) আরো ব্যাখ্যার জন্যে দেখুন তাকহীমুল কুরআন, আদুদাহর ৩-৫ টীকা।

১১. মূল বাক্যটি হচ্ছে, فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এখানে ইকতিহাম (اِقْتِحَام) মানে হচ্ছে, নিজেকে কোন কঠিন ও পরিশ্রম সাধ্য কাজে নিযুক্ত করা। আর পর্বতশৃঙ্গে যাবার জন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয় তাকে বলা হয় আকাবাহ (عَقَبَة)। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, দু'টি পথ আমি তাকে দেখিয়েছি। একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংখা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বীধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

১২. ওপরে তার অমিতব্যয়িতার কথা বলা হয়েছে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী ও অহংকার প্রকাশ করার জন্য সে অর্থের অপচয় করতো। তাই এখানে তার মোকাবেলায় এমন ব্যয় ও ব্যয়বস্ত্রের কথা বলা হয়েছে যা মানুষের নৈতিক অধঃপতন রোধ করে তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এতে প্রবৃত্তির কোন স্থানুভব নেই। বরং এ জন্য মানুষকে প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটিয়ে ত্যাগের মহড়া দিতে হয়। নিজেই কোন দাসকে দাসত্বমুক্ত করে সেই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। অথবা তাকে আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে। তার ফলে সে নিজের মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত হতে পারে। অথবা অর্থ সাহায্য করে কোন গরীবের গলাকে ঝগমুক্ত করা যেতে পারে। অথবা কোন অসচ্ছল ব্যক্তি যদি কোন অর্থদণ্ডের বোঝার তলায় চাপা পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে তা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোন নিকটবর্তী অর্থাৎ আত্মীয় বা

প্রতিবেশী) এতিম এবং এমন কোন ধরনের অসহায় অভাবীকে আহ্বার করিয়ে এই অর্থ ব্যয় করা যায় যাকে দারিদ্র ও উৎকট অর্থহীনতা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে এবং যাকে হাত ধরে তোলার কেউ নেই। এই ধরনের লোকদের সাহায্য করলে মানুষের খ্যাতির ডংকা বাজে না। এদেরকে খাওয়ালে কারো ধনাঢ্যতা ও বদান্যতার তেমন কোন চর্চা হয় না। বরং হাজার হাজার সচ্ছল ব্যক্তি ও ধনীদের জন্য শানদার জিয়াফতের ব্যবস্থা করে তার তুলনায় অনেক বেশী শোহরতের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু নৈতিক উন্নতির পথটি এই দুর্গম গিরিপথটি অতিক্রম করেই এগিয়ে গেছে।

এই আয়াতগুলোতে যেসব সৎকাজের উল্লেখ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে সেগুলোর বিপুল মর্যাদা ও সওয়াবের কথা ঘোষণা করেছেন। فَكَرْبَةٍ (গলাকে দাসত্বমুক্ত করা) সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হুরাইরা (রা)। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলামকে আযাদ করে আল্লাহ ঐ গোলামের প্রতিটি অংগের বদলে আযাদকারীর প্রতিটি অংগকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা এবং লজ্জাস্থানের বদলে লজ্জাস্থান। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।) হযরত আলী ইবনে হসাইন (ইমাম যইনুল আবেদীন) এই হাদীসের বর্ণনাকারী সা'দ ইবনে মারজানাহকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি নিজে আবু হুরাইরার (রা) কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনেছো? তিনি জবাব দেন, হী। কথা শুনে ইমাম যইনুল আবেদীন নিজের সবচেয়ে মূল্যবান গোলামটিকে ডাকেন এবং সেই মুহূর্তেই তাকে আযাদ করে দেন। মুসলিম শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, এই গোলামটির জন্য লোকেরা তাকে দশ হাজার দিরহাম দিতে চেয়েছিল। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম শা'বী (র) এই আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, গোলাম আযাদ করা সাদকার চাইতে ভালো। কারণ আল্লাহ সাদকার কথা বলার আগে তার কথা বলেছেন।

মিসকিনদের সাহায্য করার ফজিলত সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও অসংখ্য হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

الساعي على الائمة والمسكين كالساعي في سبيل الله واحسبه

قال القائم لايفتروكا لصائم لايفطر -

“বিধবা ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালায় সে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তির সমতুল্য। (আর হযরত আবু হুরাইরা বলেন :) আমার মনে হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা) একথাও বলেন যে, সে ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে নামাযে রত আছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে নামায পড়ে যাচ্ছে, আরাম করছে না এবং সেই রোযাদারের মতো যে অনবরত রোযা রেখে যাচ্ছে, কখনো রোযা ভাঙে না।” (বুখারী ও মুসলিম)

এতিমদের সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য বাণী রয়েছে। হযরত সাইল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
هُمُ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ عَلَيْهِمُ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ ۝ ١٢٠

তারপর (এই সংগে) তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে^{১৩} এবং যারা পরস্পরকে সবার ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) রহম করার উপদেশ দেয়।^{১৪} এরাই ডানপন্থী। আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী।^{১৫} এদের ওপর আগুন ছেয়ে থাকবে।^{১৬}

বলেন : “যে ব্যক্তি কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় এতিমের ভরণ পোষণ করে সে ও আমি জাহান্নামে ঠিক এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দু’টি পাশাপাশি রেখে দেখান এবং দু’টি আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন।” (বুখারী) হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন, “মুসলমানদের বাড়িগুলোর মধ্যে যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে সদ্যবহার করা হচ্ছে সেটিই সর্বোত্তম বাড়ি এবং যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে অসদ্যবহার করা হচ্ছে সেটি সবচেয়ে খারাপ বাড়ি।” (ইবনে মাজাহ, বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)। হযরত আবু উমামাহ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “যে ব্যক্তি কোন এতিমের মাথার হাত বুলায় এবং নিছক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাত বুলায়, সে ঐ এতিমের মাথায় যতগুলো চুলের ওপর হাত বুলিয়েছে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য নেকী লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন এতিম ছেলে বা মেয়ের সাথে সদ্যবহার করে সে ও আমি জাহান্নামে এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি নিজের দু’টি আঙ্গুল মিলিয়ে দেখান। (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি নিজের পানাহারে কোন এতিমকে শামিল করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তবে সে ব্যক্তি যদি ক্ষমার অযোগ্য কোন গোনাহ করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা (শারহুস সুন্নাহ) হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন, “আমার মন বড় কঠিন।” রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন, “এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনকে আহ্বান করো।” (মুসনাদে আহমাদ)।

১৩. অর্থাৎ ওপরে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে তার জন্য মু’মিন হওয়াও জরুরী। কারণ ঈমান ছাড়া কোন কাজ সৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে এবং আল্লাহর কাছেও গৃহীত হতে পারে না। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঈমান সহকারে যে সৎকাজ করা হয় একমাত্র সেটিই নেকী ও মুক্তির উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। যেমন সূরা নিসায় বলা হয়েছে : “পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করে সে যদি মু’মিন হয়, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (১২৪)

আয়াত) সূরা নাহলে বলা হয়েছে : “পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং এই ধরনের লোকদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেবো।” (৯৭ আয়াত) সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে : “পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সেখানে তাকে দেয়া হবে বেহিসেব রিয়িক।” (৪০ আয়াত) যে কোন ব্যক্তিই কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন এ কিতাবের যেখানেই সৎকাজ ও তার উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই অবশ্যই তার সাথে ঈমানের শর্ত লাগানো হয়েছে। ঈমান বিহীন আমল আল্লাহর কাছে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোথাও এ ধরনের কাজের বিনিময়ে কোন প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, আয়াতে একথা বলা হয়নি, “তারপর সে ঈমান এনেছে।” বরং বলা হয়েছে, “তারপর সে তাদের মধ্যে शामिल হয়েছে যারা ঈমান এনেছে।” এর অর্থ হয়, নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে তার নিজের ঈমান আনাই কেবলমাত্র এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে মূল লক্ষ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে সে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে তার সাথে शामिल হয়ে যাবে। এর ফলে ঈমানদারদের একটি জামায়াত তৈরি হয়ে যাবে। মু'মিনদের একটি সমাজ গড়ে উঠবে। সামগ্রিক ও সমাজবদ্ধভাবে নেকী, সততা ও সংবৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঈমানের দাবী। অন্যদিকে অসংবৃদ্ধি ও পাপ নির্মূল হয়ে যাবে, যেগুলো খতম করাই ছিল ঈমানের মৌলিক চাহিদার অন্তরভুক্ত।

১৪. এখানে মুসলিম সমাজের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে দু'টি ছোট ছোট বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই সমাজের সদস্যরা পরস্পরকে সবার করার উপদেশ দেবে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা পরস্পরকে রহম ও পরস্পরের প্রতি স্নেহার্হ ব্যবহারের উপদেশ দান করবে।

সবরের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি বারবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি, কুরআন মজীদ যে ব্যাপক অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার করেছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে মু'মিনের সমগ্র জীবনকেই সবরের জীবন বলা যায়। ঈমানের পথে পা রাখার সাথে সাথেই মানুষের সবরের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ যেসব ইবাদাত ফরয করেছেন, সেগুলো সম্পাদন করতে গেলে সবরের প্রয়োজন। আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ও সঠিকভাবে মেনে চলার জন্যও সবরের দরকার। আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সবরের সাহায্য ছাড়া সেগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়াও কঠিন। নৈতিক অসংবৃদ্ধি পরিহার করা ও সংবৃদ্ধি অবলম্বন করার জন্য সবরের প্রয়োজন। প্রতি পদে পদে গোনাহ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। তার মোকাবেলা করা সবার ছাড়া সম্ভব নয়। জীবনের এমন বহু সময় আসে যখন আল্লাহর আইনের আনুগত্য করলে বিপদ-আপদ, কষ্ট, ক্ষতি ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়। আবার এর বিপরীত পক্ষে নাকফরমানির পথ অবলম্বন করলে লাভ, ফায়দা, আনন্দ ও ভোগের পেয়ালো উপচে পড়তে দেখা যায়। সবার ছাড়া কোন মু'মিন এ পর্যায়গুলো নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারে না। তারপর ঈমানের পথ অবলম্বন করতেই মানুষ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। নিজের সন্তান-সন্ততির, পরিবারের, সমাজের, দেশের, জাতির ও সারা দুনিয়ার মানুষ ও জ্বিন শয়তানদের। এমনকি তাকে আল্লাহর পথে হিজরত এবং জিহাদও করতে হয়। এসব

অবস্থায় একমাত্র সবরের গুণই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, এক একজন মু'মিন একা একা যদি এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাহলে তার সবসময় পরাজিত হবার ভয় থাকে। অতি কষ্টে হয়তো সে কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে। বিপরীত পক্ষে যদি মু'মিনদের এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে, যার প্রত্যেকটি সদস্য সবরকারী হয় এবং এই সমাজের সদস্যরা সবারের এই ব্যাপকতর পরীক্ষায় পরস্পরকে সাহায্য সহায়তা দান করতে থাকে তাহলে সাফল্যের ডালি এই সমাজের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। সেখানে পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সীমাহীন শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি হবে। এভাবে মানুষের সমাজকে ন্যায়, সত্যতা ও নেকীর পথে আনার জন্য একটি জবরদস্ত শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি হয়ে যাবে।

আর রহমের ব্যাপারে বলা যায়, ঈমানদারদের সমাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, এটা কোন জালাম, নির্দয়, বেরহম, পাষণ্ড হৃদয় ও হৃদয়হীনদের সমাজ হয় না। বরং সমগ্র মানবতার জন্য এটি হয় একটি স্নেহশীল, করুণাপ্রবণ এবং নিজেদের পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল ও পরস্পরের দুঃখে-শোকে বেদনা অনুভবকারী একটি সংবেদনশীল সমাজ। ব্যক্তি হিসেবেও একজন মু'মিন হয় আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রকাশ এবং দলগতভাবেও মু'মিনদের দল আল্লাহর এমন এক নবীর প্রতিনিধি যার প্রশংসায় বলা হয়েছে— وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুণা হিসেবেই তোমাকে পাঠিয়েছি। আখিয়া : ১০৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতের মধ্যে এই রহম ও করুণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত বাণীগুলো দেখুন। এগুলো থেকে তাঁর দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব কি ছিল তা জানা যাবে। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়য়াত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি রহম করে না, আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না।”

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বলেছেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ - اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِى السَّمَاءِ -

“রহমকারীদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। পৃথিবীবাসীদের প্রতি রহম করো। আকাশবাসী তোমার প্রতি রহম করবেন।” (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন : مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ “যে ব্যক্তি রহম করে না তার প্রতি রহম করা হয় না।” (বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا

“যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” (তিরমিযী)

ইমাম আবু দাউদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বরাতে দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের হক চেনে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি আবুল কাসেম (নবী করীম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : لَا تَنْزِعِ الرَّحْمَةَ الْأَمِنْ شَقِيٍّ “হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই রহম তুলে নেয়া হয়।” (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

হযরত সৈয়্য ইবনে হিমার (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন ধরনের লোক জান্নাতী। তার মধ্যে একজন হচ্ছে :

رَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ -

“যে ব্যক্তি প্রত্যেক অন্তরী ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দয়ালু হৃদয় ও কোমল প্রাণ” (মুসলিম)

হযরত নু’মান ইবনে বশীর বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَأَحْمَهُمْ وَتَوَادَّهُمْ وَتَعَا طِفْهُمُ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى -

“তোমরা মু’মিনদেরকে পরস্পরের মধ্যে রহম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ব্যাপারে একটি দেহের মতো পাবে। যদি একটি অংশে কোন কষ্ট অনুভূত হয় তাহলে সারা দেহ তাতে নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু মুসা আশ’আরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمُ بَعْضًا “মু’মিন অন্য মু’মিনের জন্য এমন দেয়ালের মতো যার প্রতিটি অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে।” (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ
اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

“মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে সাহায্য করতেও বিরত হয় না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদগুলোর মধ্য থেকে একটি বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

সৎকর্মকারীদেরকে ইমান আনার পর ইমানদারদের দলে शामिल হবার যে নির্দেশ কুরআন মজীদে এই আয়াতে দেয়া হয়েছে তার ফলে কোন্ ধরনের সমাজ গঠন করতে চাওয়া হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিগুলো থেকে জানা যায়।

১৫. ডানপন্থী ও বামপন্থীর ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে সূরা ওয়াকি'আর তাকসীরে করে এসেছি। দেখুন তাকহীমুল কুরআন, আল ওয়াকি'আ ৫-৬ টাকা।

১৬. অর্থাৎ আগুন তাদেরকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে থাকবে যে তা থেকে বের হবার কোন পথ থাকবে না।

আশ শামস

৯১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আশ শামসকে (الشَّمْسُ) এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাখিলের সময়-কাল

বিশ্ববস্তুর ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে জানা যায়, এ সূরাটিও মক্কা মু'আযযমায়া প্রথম যুগে নাখিল হয়। কিন্তু এটি এমন সময় নাখিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা ভুগে উঠেছিল।

বিশ্ববস্তুর ও মূল বক্তব্য

এর বিশ্ববস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ নেকী ও গোনাহর পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এই পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে আর গোনাহর পথে চলার ওপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে এবং ১০ আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকী ও গোনাহও পরস্পর ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়েও তারা পরস্পর বিরোধী। এদের উভয়ের আকৃতি এক নয় এবং ফলাফলও এক হতে পারে না। দুই, মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় একেবারে চেতনাহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গোনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দোর প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিন, মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কাউকে উদ্দীপিত করে আবার কাউকে দাবিয়ে দেয়। এরি ওপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। যদি সে সৎপ্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অসৎ-প্রবণতাসমূহ থেকে নিজের নফসকে পবিত্র করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। বিপরীত পক্ষে যদি সে নফসের সৎপ্রবণতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে এবং অসৎ-প্রবণতাকে উদ্দীপিত করতে থাকে তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অংশে সামূদ জাতির ঐতিহাসিক নজীর পেশ করে রিসালাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ভালো ও মন্দে যে চেতনালব্ধি আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে পুরোপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দে বিভ্রান্তিকর দর্শন ও মানদণ্ড নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট হতে থাকে। তাই মহান আল্লাহ এই প্রকৃতিগত চেতনাকে সাহায্য করার জন্য আখিয়া আল্লাইহিমুল সালামদের ওপর সুস্পষ্ট এ দ্ব্যর্থহীন অহী নাযিল করেছেন। এর ফলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গোনাহ কি তা জানাতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ দুনিয়ায় নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। এই ধরনেরই একজন নবী ছিলেন হযরত সালেহ আল্লাইহিস সালাম। তাঁকে সামূদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সামূদরা তাদের প্রবৃত্তির অসম্প্রবণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড় বেনী হকুম অমান্য করার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। যার ফলে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের মুজিয়া দেখাবার দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের সামনে একটি উটনী পেশ করলেন। তাঁর সাবধান বাণী সত্ত্বেও এই জাতির সবচেয়ে দুচরিত্র ব্যক্তিটি সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উটনীটিকে হত্যা করলো। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেলো।

সামূদ জাতির এ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমগ্র সূরার কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! যদি তোমরা সামূদদের মতো তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমরাও সামূদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সালেহ আল্লাইহিস সালামের মোকাবেলায় সামূদ জাতির দুচরিত্র লোকেরা যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল মক্কায় সে সময় সেই একই অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই এ অবস্থায় এই কাহিনী শুনিয়া দেয়াটা আসলে সামূদদের এই ঐতিহাসিক নজীর কিভাবে মক্কাবাসীদের সাথে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আয়াত ১৫

সূরা আশ শামস-মকী

রুকু' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا
 جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّيِّءَاتِ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالْأَرْضِ وَمَا
 طَحَاهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ
 مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

সূর্যের ও তার রোদের কসম।^১ চাঁদের কসম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। দিনের কসম যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে। রাতের কসম যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে নেয়।^২ আকাশের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।^৩ পৃথিবীর ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে বিছিয়েছেন। মানুষের নফসের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন।^৪ তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।^৫ নিসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তির নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে সে ব্যর্থ হয়েছে।^৬

১. মূলে দুহা (فُضَى) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দুহা মানে সূর্যের আলো ও তাপ দুটোই। আরবী ভাষায় এর পরিচিত মানে হচ্ছে চান্ডের সময়, যখন সূর্য উদয়ের পরে যথেষ্ট উপরে উঠে যায় কিন্তু উপরে ওঠার পরে কোন আলোই বেড়ে যায় না, তাপও বিকীর্ণ করতে থাকে। তাই 'দুহা' শব্দটি যখন সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তার আলো বা তার বদৌলতে যে দিনের উদয় হয় তা থেকে তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এর ভুলনায় রোদ শব্দটি তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

২. রাতের আগমনে সূর্য লুকিয়ে যায়। সারা রাত তার আলো দেখা যায় না। এই অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : রাত সূর্যকে ঢেকে নেয়। কারণ সূর্যের দিগন্ত রেখার নীচে নেমে যাওয়াকেই রাত বলে। এর ফলে পৃথিবীর যে অংশে রাত নামে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না।

৩. হাদের মতো পৃথিবীর বুকে তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই আয়াতে এবং এর পরের দু'টি আয়াতে 'মা' (مَا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মা-বানাহা (مَا بَنَاهَا) মা-তাহাহা (مَا طَاحَاهَا) ও মা-সাতওয়াহা (مَا سَوَاهَا)। মুফাস্সিরগণের একটি দল এই 'মা' শব্দটিকে ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তারা এই আয়াতগুলোর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন : আকাশ ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কসম, পৃথিবী ও তাকে বিছিয়ে দেবার কসম এবং মানুষের নফসের ও তাকে ঠিকভাবে গঠন করার কসম। কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। কারণ এই তিনটি বাক্যের পরে নিম্নোক্ত বাক্যটি আনা হয়েছে : "তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইনহাম করেছেন।" আর এই বাক্যটি আগের বাক্য তিনটির সাথে খাপ খায় না। অন্য মুফাস্সিরগণ এখানে 'মা' (مَا) কে মান (مَنْ) বা 'আল্লায়ী' (الَّذِينَ) এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে তারা এই বাক্যগুলোর অর্থ করেছেন : যিনি আকাশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি পৃথিবীকে বিছিয়েছেন এবং যিনি মানুষের নফসকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন। আমার মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই সঠিক। এর বিরুদ্ধে এ আপত্তি ওঠানো ঠিক হতে পারে না যে, আরবী ভাষায় 'মা' শব্দ প্রাণহীন বস্তু ও বুদ্ধিহীন জীবের জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ খোদা কুরআনেই 'মা' কে 'মান' অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, وَلَا أَنْتُمْ غَيْبُونَ مِمَّا غَابُوا (আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি)। فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (কাজেই মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ করো বিয়ে করে নাও)। وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (আর যেসব মেয়েকে তোমাদের বাপেরা বিয়ে করেছে তাদেরকে বিয়ে করো না)।

৪. 'ঠিকভাবে গঠন করেছেন' মানে হচ্ছে, তাকে এমন একটি দেহ দান করেছেন, যা তার সুডৌল গঠনাকৃতি, হাত-পা ও মস্তিষ্ক সংযোজনের দিক থেকে মানবিক জীবন যাপন করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী ছিল। তাকে দেখার, শুনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার ও ছাণ নেবার জন্য এমন ইন্দ্রিয় দান করেছেন যা তার বৈশিষ্ট্য ও আনুপাতিক কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে তার জন্য জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারতো। তাকে চিন্তা ও বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তি, যুক্তি উপস্থাপন ও প্রমাণ পেশ করার শক্তি, কল্পনা শক্তি, স্মৃতি শক্তি, পার্থক্য করার শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি, সংকল্প শক্তি এবং এমন অনেক মানসিক শক্তি দান করেছেন যার ফলে সে এই দুনিয়ায় মানুষের মতো কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এছাড়া "ঠিকভাবে গঠন করার" মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, তাকে জন্মগত পাপী ও প্রকৃতিগত বদমায়েশ হিসেবে তৈরি না করে বরং সহজ সরল প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তার গঠনাকৃতিতে এমন ধরনের কোন বক্তৃতা রেখে দেননি যা তাকে সোজাপথ অবলম্বন করতে চাইলেও করতে দিতো না। একথাটিকেই সূরা রুমে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : فَطَرْنَا لِلَّهِ النَّاسَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا : "সেই প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" (২০ আয়াত) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এ কথাটিকেই একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন : "এমন কোন শিশু নেই যে প্রকৃতি ছাড়া অন্যকিছুর ওপর পয়দা হয়। তারপর মা-বাপ তাকে ইহুদি, খৃষ্টান বা অগ্নি উপাসক বানায়। এটা তেমনি যেমন পশুর পেট থেকে সুস্থ, সবল ও পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট বাচ্চা পয়দা হয়। তোমরা কি তাদের কাউকে কানকাটা পেয়েছো? (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ পরবর্তী কালে মুশরিকরা তাদের জাহেলী

কুসংস্কারের কারণে পশুদের কান কেটে দেয়। নয়তো আল্লাহ কোন পশুকে তার মায়েস পেট থেকে কানকাটা অবস্থায় পয়দা করেননি। অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “আমর রব বলেন, আমার সকল বান্দাকে আমি হানীফ (সঠিক প্রকৃতির ওপর) সৃষ্টি করেছিলাম। তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দীন (অর্থাৎ তাদের প্রাকৃতিক দীন) থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের ওপর এমন সব জিনিস হারাম করে দিয়েছে যা আমি তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছিলাম। শয়তানরা আমার সাথে তাদেরকে শরীক করার জন্য তাদেরকে হুকুম দিয়েছে, অথচ আমার সাথে তাদের শরীক হবার ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি।” (মুসনাদে আহমাদ, ইমাম মুসলিম ও প্রায় একই রকম শব্দ সহকারে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন)

৫. ইলহাম শব্দটির উৎপত্তি লহম (لحم) থেকে। এর মানে গিলে ফেলা। যেমন বলা হয়, لَهْمُ الشَّيْءِ الْنَهْمُ উম্মুক ব্যক্তি জিনিসটিকে গিলে ফেলেছে। আর الْهَيْئَةُ الشَّيْءِ মানে হয়, আমি উম্মুক জিনিসটি তাকে গিলিয়ে দিয়েছি বা তার গলার নীচে নামিয়ে দিয়েছি। এই মৌলিক অর্থের দিক দিয়ে ইলহাম শব্দ পারিতোষিক অর্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কল্পনা বা চিন্তাকে অবচেতনভাবে বান্দার মন ও মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশে নামিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মানুষের প্রতি তার পাপ এবং তার নেকী ও তাকওয়া ইলহাম করে দেয়ার দুটি অর্থ হয়। এক, সৃষ্ট তার মধ্যে নেকী ও গোনাহ উভয়ের কৌণ প্রবণতা রেখে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এটি অনুভব করে। দুই, প্রত্যেক ব্যক্তির অবচেতন মনে আল্লাহ এ চিন্তাটি রেখে দিয়েছেন যে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন জিনিস ভালো ও কোন জিনিস মন্দ এবং সৎ নৈতিক বৃত্তি ও সৎকাজ এবং অসৎ নৈতিক বৃত্তি ও অসৎকাজ সমান নয়। ফজুর (দুষ্কৃতি ও পাপ) একটি খারাপ জিনিস এবং তাকওয়া (খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা) একটি ভালো জিনিস, এ চিন্তাধারা মানুষের জন্য নতুন নয়। বরং তার প্রকৃতি এগুলোর সাথে পরিচিত। সৃষ্ট তার মধ্যে জন্মগতভাবে ভালো ও মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একথাটিই সূরা আল বালাদে এভাবে বলা হয়েছে : وَهَدَيْنَا النُّجُودِ “আর আমি ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।” (১০ আয়াত) সূরা আদদাহুরে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا “আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।” (৩ আয়াত) একথাটিই সূরা আল কিয়ামাহে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে : মানুষের মধ্যে একটি নফসে লাওয়ামাহ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। (২ আয়াত) আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওজর পেশ করুক না কেন সে কি তা সে খুব ভালো করেই জানে। (১৪-১৫ আয়াত)

এখানে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহ স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত ইলহাম করেছেন প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি তার মর্যাদা, ভূমিকা ও স্বরূপ অনুযায়ী। যেমন সূরা তা-হা'য় বলা হয়েছে : الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ مَدَى “যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন।” (৫০ আয়াত) যেমন প্রাণীদের প্রত্যেক প্রজাতিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। যার ফলে মাছ নিজে নিজেই সীতার কাটে। পাখি উড়ে বেড়ায়। মৌমাছি

মৌচাক তৈরি করে। চাতক বাসা বাঁনায়। মানুষকেও তার বিভিন্ন পর্যায় ও ভূমিকার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মানুষ এক দিক দিয়ে প্রাণী গোষ্ঠীভুক্ত। এই দিক দিয়ে তাকে যে ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মানব শিশু জন্মের সাথে সাথেই মায়ের স্তন চুষতে থাকে। আল্লাহ যদি প্রকৃতিগতভাবে তাকে এ শিক্ষাটি না দিতেন তাহলে তাকে এ কৌশলটি শিক্ষা দেবার সাধ্য কারো ছিল না। অন্যদিক দিয়ে মানুষ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। এদিক দিয়ে তার সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তাকে অনবরত ইলহামী পথনির্দেশনা দিয়ে চলাছেন। এর ফলে সে একের পর এক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধন করেছে। এই সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ইতিহাস অধ্যয়নকারী যে কোন ব্যক্তিই একথা অনুভব করবেন যে, সম্ভবত মানুষের চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল হিসেবে দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটি আবিষ্কার আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছে। ইঠাৎ এক ব্যক্তির মাথায় একটি চিন্তার উদয় হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে সে কোন জিনিস আবিষ্কার করেছে। এই দু'টি মর্যাদা ছাড়াও মানুষের আর একটি মর্যাদা ও ভূমিকা আছে। সে একটি নৈতিক জীবও। এই পর্যায়ে আল্লাহ তাকে ভালো ও মন্দে মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি এবং ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ জানার অনুভূতি ইলহাম করেছেন। এই শক্তি, বোধ ও অনুভূতি একটি বিধ্বংসনীয় সত্য। এর ফলে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন কোন সমাজ সভ্যতা গড়ে ওঠেনি যেখানে ভালো ও মন্দের ধারণা ও চিন্তা কার্যকর ছিল না। আর এমন কোন সমাজ ইতিহাসে কোন দিন পাওয়া যায়নি এবং আজো পাওয়া যায় না যেখানকার ব্যবস্থায় ভালো ও মন্দের এবং সৎ ও অসৎকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। প্রতিযোগে, প্রত্যেক জায়গায় এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রত্যেক পর্যায়ে এই জিনিসটির অস্তিত্বই এর স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ স্রষ্টা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটি গচ্ছিত রেখেছেন, একথাও এ থেকে প্রমাণিত হয়। কারণ যেসব উপাদানে মানুষ তৈরি এবং যেসব আইন ও নিয়মের মাধ্যমে জড় জগত চলছে তার কোথাও নৈতিকতার কোন একটি বিষয়ও চিহ্নিত করা যাবে না।

৬. একথাটির ওপরই ওপরের আয়াতগুলোতে বিভিন্ন জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। ওই জিনিসগুলো থেকে একথাটি কিভাবে প্রমাণ হয় তা এখন চিন্তা করে দেখুন। যেসব গভীর তত্ত্ব আল্লাহ মানুষকে বুঝাতে চান সেগুলো সম্পর্কে তিনি কুরআনে যে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করেছেন তা হচ্ছে এই যে, সেগুলো প্রমাণ করার জন্য তিনি হাতের কাছের এমন কিছু সুস্পষ্ট ও সর্বজন পরিচিত জিনিস পেশ করেন, যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার আশেপাশে অথবা নিজের অস্তিত্বের মধ্যে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে দেখে। এই নিয়ম অনুযায়ী এখানে এক এক জোড়া জিনিস নিয়ে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছে। তারা পরস্পরের বিপরীতধর্মী কাজেই তাদের প্রভাব ও ফলাফলও সমান নয়। বরং অনিবার্যভাবে তারা পরস্পর বিভিন্ন। একদিকে সূর্য, অন্যদিকে চাঁদ। সূর্যের আলো অত্যন্ত প্রখর। এর মধ্যে রয়েছে তাপ। এর তুলনায় চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের উপস্থিতিতে সে আকাশে থাকলেও আলোহীন থাকে। সূর্য ডুবে যাবার পর সে উজ্জ্বল হয়। সে সময়ও তার আলোর মধ্যে রাতকে দিন বানিয়ে দেবার ঔজ্জ্বল্য থাকে না। সূর্য তার আলোর প্রখরতা দিয়ে দুনিয়ায় যে কাজ করে চাঁদের আলোর মধ্যে সে প্রখরতা থাকে না। তবে তার নিজস্ব কিছু প্রভাব রয়েছে। এগুলো সূর্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

এভাবে একদিকে আছে দিন এবং অন্যদিকে রাত। এরা পরস্পরের বিপরীতধর্মী। উভয়ের প্রভাব ও ফলাফল এত বেশী বিভিন্ন যে, এদেরকে কেউ একসাথে জমা করতে পারে না। এমন কি সবচেয়ে নিবোধ ব্যক্তিটির পক্ষেও একথা বলা সম্ভব হয় না যে, রাত হলোই বা কি আর দিন হলোই বা কি, এতে কোন পার্থক্য হয় না। ঠিক তেমনি একদিকে রয়েছে আকাশ। স্রষ্টা তাকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে রয়েছে পৃথিবী। এর স্রষ্টা একে আকাশের তলায় বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। এরা উভয়েই একই বিশ্ব জাহানের ও তার ব্যবস্থার সেবা করছে এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ করছে। কিন্তু উভয়ের কাজ এবং প্রভাব ও ফলাফলের মধ্যে আসমান-যমীন ফারাক। উর্ধ্বজগতের এই সাক্ষ প্রমাণগুলো পেশ করার পর মানুষের নিজের শরীর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার অংগ-প্রত্যংগ এবং ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলোকে আনুপাতিক ও সমতাপূর্ণ মিশ্রণের মাধ্যমে সৃষ্টি করে স্রষ্টা তার মধ্যে সং ও অসং উভয় প্রবণতা ও কার্যকারণসমূহ রেখে দিয়েছেন। এগুলো পরস্পরের বিপরীত ধর্মী। ইনহামী তথা অবচেতনভাবে তাকে এদের উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এদের একটি হচ্ছে ফুজুর-দুষ্টি, তা খারাপ এবং অন্যটি হচ্ছে, তাকওয়া-আল্লাহভীতি, তা ভালো। এখন যদি সূর্য ও চন্দ্র, রাত ও দিন এবং আকাশ ও পৃথিবী এক না হয়ে থাকে বরং তাদের প্রভাব ও ফলাফল অনিবার্যভাবে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে থাকে তাহলে, মানুষের নফসের দুষ্টি ও তাকওয়া পরস্পরের বিপরীতধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এক হতে পারে কেমন করে? মানুষ নিজেই এই দুনিয়ায় নেকী ও পাপকে এই মনে করে না। নিজের মনগড়া দর্শনের দৃষ্টিতে সে যদি ভালো ও মন্দের কিছু মানদণ্ড তৈরি করে নিয়েই থাকে তাহলেও যে জিনিসটিকে সে নেকী মনে করে, সে সম্পর্কে তার অভিমত হচ্ছে এই যে, তা প্রশংসনীয় এবং প্রতিফল ও পুরস্কার লাভের যোগ্য। অন্যদিকে যাকে সে অসং ও গোনাহ মনে করে, সে সম্পর্কে তার নিজের নিরপেক্ষ অভিমত হচ্ছে এই যে, তা নিন্দনীয় ও শাস্তির যোগ্য। কিন্তু আসল ফায়সালা মানুষের হাতে নেই। বরং যে স্রষ্টা মানুষের প্রতি তার গোনাহ ও তাকওয়া ইনহাম করেছেন তার হাতেই রয়েছে এর ফায়সালা। স্রষ্টার দৃষ্টিতে যা গোনাহ ও দুষ্টি আসলে তাই হচ্ছে গোনাহ ও দুষ্টি এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা তাকওয়া আসলে তাই হচ্ছে তাকওয়া। স্রষ্টার কাছে এ দু'টির রয়েছে পৃথক পরিণাম। একটির পরিণাম হচ্ছে, যে নিজের নফসের পরিশুদ্ধি করবে সে সাফল্য লাভ করবে এবং অন্যটির পরিণাম হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের নফসকে দাবিয়ে দেবে সে ব্যর্থ হবে।

তায়াক্ক (تزكى) পরিশুদ্ধ করা মানে পাক-পবিত্র করা, বিকশিত করা এবং উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করা। পূর্বাগর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর পরিকার অর্থ দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি নিজের নফস ও প্রবৃত্তিকে দুষ্টি থেকে পাক-পবিত্র করে, তাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে তাকওয়ার উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং তার মধ্যে সংপ্রবণতাকে বিকশিত করে, সে সাফল্য লাভ করবে। এর মোকাবেলায় দাসুসাহা (نُصْحًا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শব্দমূল হচ্ছে তাদসীয়া (تدسية) তাদসীয়া মানে হচ্ছে দাবিয়ে দেয়া, লুকিয়ে ফেলা, ছিনিয়ে নেয়া, আত্মসাৎ করা ও পথভ্রষ্ট করা। পূর্বাগর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ব্যর্থ হবে, যে নিজের নফসের মধ্যে নেকী ও সংকর্মের যে প্রবণতা পাওয়া যাচ্ছিল তাকে উদ্দীপিত ও বিকশিত করার পরিবর্তে দাবিয়ে দেয়, তাকে

বিক্রান্ত করে অসংপ্রবণতার দিকে নিয়ে যায় এবং দুহৃত্তিকে তার ওপর এত বেশী প্রবল করে দেয় যার ফলে তাকওয়া তার নীচে এমনভাবে মুখ ঢাকে যেমন কোন লাপকে কবরের মধ্যে রেখে তার ওপর মাটি ঢালা দিলে তা ঢেকে যায়। কোন কোন তাফসীরকার এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ اللَّهُ نَفْسَهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّىٰ اللَّهُ نَفْسَهُ** অর্থাৎ যে ব্যক্তির নফসকে আল্লাহ পাক-পবিত্র করে দিয়েছেন সে সাফল্য লাভ করেছে এবং যার নফসকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি প্রথমত ভাষার দিক দিয়ে কুরআনের বর্ণনাতীত্য় পরিপন্থী। কারণ আল্লাহর যদি একথা বলাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তিনি এভাবে বলতেন : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ اللَّهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّىٰ اللَّهُ** (যে নফসকে আল্লাহ পাক-পবিত্র করে দিয়েছেন সে সফল হয়ে গেছে এবং ব্যর্থ হয়ে গেছে সেই নফস যাকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন।) দ্বিতীয়, এই ব্যাখ্যাটি এই বিষয়বস্তু সম্বলিত, কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষশীল। সূরা আ'নাম মহান আল্লাহ বলেছেন : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ** (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে—৪ আয়াত) সূরা আবাসার মহান আল্লাহ রসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন : **وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّيَ** “তোমাদের ওপর কি দায়িত্ব আছে যদি তারা পবিত্রতা অবলম্বন না করে?” এই দু'টি আয়াতে পবিত্রতা অবলম্বন করাকে বান্দার কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন সূরা দাহর-এ বলা হয়েছে : “আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত শুক্ল বেকে পয়দা করেছি, যাতে তাকে পরীক্ষা করতে পারি, তাই তাকে আমি শোনার ও দেখার ক্ষমতা দিয়েছি।” (২ আয়াত) সূরা মূলকে বলা হয়েছে : “তিনি মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।” (২ আয়াত) যখন একথা সুস্পষ্ট, পরীক্ষা গ্রহণকারী যদি আগেভাগেই একজন পরীক্ষার্থীকে সামনে বাড়িয়ে দেয় এবং অন্যজনকে দাবিয়ে দেয় তাহলে আদতে পরীক্ষাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই কাতাদাহ, ইকরামা, মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে জুবাইর যা বলেছেন সেটিই হচ্ছে এর আসল তাফসীর। তারা বলেছেন : যাক্বাহা ও দাস্‌সাহা'র কর্তা হচ্ছে বান্দা, আল্লাহ নন। আর ইবনে আবী হাতেম জুওয়াইর ইবনে সাঈদ থেকে এবং তিনি যাহ্‌হাক থেকে এবং যাহ্‌হাক ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন : **أَفْلَحَ نَفْسٌ زَكَّىٰ اللَّهُ** (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যাকে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ পবিত্র করে দিয়েছেন)। এ হাদীসটি সম্পর্কে বলা যায়, এখানে রসূলুল্লাহ (সা)-এর যে উক্তি পেশ করা হয়েছে তা আসলে তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ এই সনদের রাবী জুওয়াইর একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। অন্যদিকে ইবনে আব্বাসের সাথে যাহ্‌হাকের সাক্ষাত হয়নি। তবে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, নাসাই ও ইবনে আবী শাইবা হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে যে রেওয়ায়াতটি করেছেন সেটি অবশ্যি একটি সহীহ হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন :

اللَّهُمَّ أَتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَذَمُّوا آلَ عَلَيْهِمْ
رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۖ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۖ

সামুদ জাতি^৭ নিজের বিদ্রোহের কারণে মিথ্যা আরোপ করলো।^৮ যখন সেই জাতির সবচেয়ে বড় হতভাগ্য লোকটি ক্ষেপে গেলো, আল্লাহর রসূল তাদেরকে বললো : সাবধান! আল্লাহর উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান করতে (বাধা দিয়ো না)^৯ কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করলো এবং উটনীটিকে মেরে ফেললো।^{১০} অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদের রব তাদের ওপর বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। আর তিনি (তঁার এই কাজের) খারাপ পরিণতির কোন ভয়ই করেন না।^{১১}

“হে আল্লাহ! আমার নফসকে তার তাকওয়া দান করো এবং তাকে পবিত্র করো। তাকে পবিত্র করার জন্যে তুমিই সর্বোত্তম সত্তা। তুমিই তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক।”

রসূলের প্রায় এই একই ধরনের দোয়া তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনুল মুনিযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইমাম আহমাদ হযরত আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মূলত এর অর্থ হচ্ছে, বান্দা কেবল তাকওয়া ও তায়কীয়া তথা পবিত্রতা অবলম্বন করার ইচ্ছাই প্রকাশ করতে পারে। তবে তা তার ভাগ্যে জুটে যাওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। তাদসীয়া তথা নফসকে দাবিয়ে দেবার ব্যাপারেও এই একই অবস্থা অর্থাৎ আল্লাহ জোর করে কোন নফসকে দাবিয়ে দেন না। কিন্তু বান্দা যখন এ ব্যাপারে একেবারে আদা-পানি খেয়ে লাগে তখন তাকে তাকওয়া ও তায়কীয়ার তাওফীক থেকে বঞ্চিত করেন এবং সে তার নফসকে যে ধরনের ময়লা আবর্জনার মধ্যে দাবিয়ে দিতে চায় তার মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেন।

৭. ওপরের আয়াতগুলোতে নীতিগতভাবে যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে এখন একটি ঐতিহাসিক নজীরের সাহায্যে তাকে সুস্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে। এটি কিসের নজীর এবং ওপরের বর্ণনার সাথে এর কি সম্পর্ক তা জানার জন্যে কুরআন মজীদের অন্যান্য বর্ণনার আলোকে ৭ থেকে ১০ আয়াতে বর্ণিত দু’টি মৌলিক সত্য সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা গবেষণা করা উচিত।

এক : সেখানে বলা হয়েছে, মানুষের নফসকে একটি সুগঠিত ও সুসামঞ্জস্য প্রতিকৃতির ওপর সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তার দুষ্টি ও তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন। কুরআন এ সত্যটি বর্ণনা করার পর একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, দুষ্টি ও তাকওয়ার এই ইলহামী (চেতনালব্ধ) জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বভাবে বিস্তারিত পথ

নির্দেশনা লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং এই উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে নবীগণকে বিস্তারিত পথনির্দেশনা দান করেছেন। তাতে দুকূতির আওতায় কি কি জিনিস পড়ে, যা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তাকওয়া কাকে বলে, তা কিভাবে হাসিল করা যায়—এসব কথা পরিকারভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যদি অহীর মাধ্যমে প্রেরিত এই বিস্তারিত পথনির্দেশনা মানুষ গ্রহণ না করে, তাহলে সে দুকূতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না এবং তাকওয়া অবলম্বনের পথও পাবে না।

দুই : এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, দুকূতি ও তাকওয়া দু'টোর মধ্যে থেকে যে কোনটি অবলম্বন করার অনিবার্য ফল হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তি। নফসকে দুকূতি মুক্ত ও তাকওয়ার সাহায্যে উন্নত করার ফলে সাফল্য অর্জিত হয়। আর তার সম্প্রবণতাগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে তাকে দুকূতির মধ্যে ডুবিয়ে দেবার ফল হচ্ছে ব্যর্থতা ও ধ্বংস।

একথাটি বুঝাবার জন্যে একটি ঐতিহাসিক নজীর পেশ করা হচ্ছে। এ জন্যে নমুনা হিসেবে সামুদ জাতিক পেশ করা হয়েছে। কারণ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের মধ্যে এই জাতিটির এলাকা ছিল মক্কাবাসীদের সবচেয়ে কাছে। উত্তর হিজ্রায়ে এর ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ছিল। মক্কাবাসীদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া যাবার পথে প্রায়ই এই স্থানটি অতিক্রম করতো। জাহেলী যুগের কবিতায় এই জাতির উল্লেখ যেমন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে তাতে বুঝা যায়, আরববাসীদের মধ্যে তাদের ধ্বংসের চর্চা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল।

৮. অর্থাৎ তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে হযরত সালেহকে পাঠানো হয়েছিল। যে দুকূতিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল। তা ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না এবং হযরত সালেহ (আ) যে তাকওয়ার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করতে তারা চাইছিল না। নিজেদের এই বিদ্রোহী মনোভাব ও কার্যক্রমের কারণে তাই তারা তার নবুওয়াতকে মিথ্যা বলছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য পড়ুন তাকহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৭৩-৭৬ আয়াত, হুদ ৬১-৬২ আয়াত, আশ্ শু'আরা ১৪১-১৫৩ আয়াত, আন নামল ৪৫-৪৯ আয়াত, আল ক্বামার ২৩-২৫ আয়াত।

৯. কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামুদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে এই বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিশানী (মুজিয়া) পেশ করো। একথায় হযরত সালেহ (আ) মুজিয়া হিসেবে একটি উটনী তাদের সামনে হাথির করেন, তিনি বলেন : এটি আল্লাহর উটনী। যমীনের যেখানে ইচ্ছা সে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা সমস্ত পানি পান করবে এবং অন্যদিন তোমরা সবাই ও তোমাদের পশুরা পানি পান করবে। যদি তোমরা তার গায়ে হাত লাগাও তাহলে মনে রেখো তোমাদের ওপর কঠিন আযাব বর্ষিত হবে। একথায় তারা কিছুদিন পর্যন্ত ভয় করতে থাকলো। তারপর তারা তাদের সবচেয়ে বড় শয়তান ও বিদ্রোহী সরদারকে ডেকে বললো, এই উটনীটিকে শেষ করে দাও। সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। (আল আরাফ ৭৩ আয়াত, আশ্ শু'আরা ১৫৪-১৫৬ আয়াত এবং আল ক্বামার ২৯ আয়াত)

১০. সূরা আরাফে বলা হয়েছে : উটনীকে হত্যা করার পর সামুদের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাতো এখন সেই আযাব আনো। (৭৭ আয়াত) সূরা হুদে বলা হয়েছে, হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে আরো আয়েশ করে নাও, তারপর আযাব এসে যাবে এবং এটি এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না। (৬৫ আয়াত)

১১. অর্থাৎ দুনিয়ার বাদশাহ ও শাসকদের মতো নন। তিনি কোন জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এর পরিণাম কি হবে, একথা ভাবতে বাধ্য হন না। তিনি সবার ওপর কর্তৃত্বশালী। সামুদ জাতির সাহায্যকারী এমন কোন শক্তি আছে যে তার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে, এ ভয় তাঁর নেই।

আল লাইল

৯২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াল লাইল (وَاللَّيْلِ) -কে এই সূরার নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাখিলের সময়-কাল

পূর্ববর্তী সূরা আশ শামসের সাথে এই সূরাটির বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এদিক দিয়ে এদের একটিকে অপরটির ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একই কথাকে সূরা আশ শামসে একভাবে বলা হয়েছে আবার সেটিকে এই সূরায় অন্যভাবে বলা হয়েছে। এথেকে আন্দাজ করা যায়, এ দু'টি সূরা প্রায় একই যুগে নাখিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পার্থক্য এবং তাদের পরিণাম ও ফলাফলের প্রভেদ বর্ণনা করাই হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগটি ১২ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম অংশে বলা হয়েছে, মানুষ ব্যক্তিগত, জাতিগত ও দলগতভাবে দুনিয়ায় যা কিছু প্রচেষ্টা ও কর্ম তৎপরতা চালায় তা অনিবার্যভাবে নৈতিক দিক দিয়ে ঠিক তেমনি বিভিন্ন যেমন দিন ও রাত এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তারপর কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলোর বর্ণনাভঙ্গী অনুযায়ী প্রচেষ্টা ও কর্মের সমগ্র যোগফল থেকে এক ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্য ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা শুনে এদের মধ্যকার পার্থক্য সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কারণ এক ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য যে ধরনের জীবন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে অন্য ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যে ঠিক তার বিপরীতধর্মী জীবন পদ্ধতির চিহ্ন কুটে ওঠে। এই উভয় প্রকার নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে ছোট ছোট, আকর্ষণীয়, সুন্দর ও সুগঠিত বাক্যের সাহায্যে। শোনার সাথে সাথে এগুলোর মর্মবাণী মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যায় এবং সে সহজে সেগুলো আঙড়াতে থাকে। প্রথম ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : অর্থ-সম্পদ দান করা, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সংবৃদ্ধিকে সংবৃদ্ধি বলে মেনে নেয়া। দ্বিতীয় ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : কৃপণতা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পরোয়া না করা এবং ভালো কথাকে মিথ্যা গণ্য করা। তারপর বলা হয়েছে, এই উভয় ধরনের সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী কর্মপদ্ধতি নিজের পরিণাম ও ফলাফলের দিক

থেকে মোটেই এক নয়। বরং যেমন এরা পরস্পর বিপরীতধর্মী, ঠিক তেমনি এদের ফলাফলও বিপরীতধর্মী। যে ব্যক্তি বা দল প্রথম কর্মপদ্ধতিটি গ্রহণ করবে তার জন্য মহান আল্লাহ জীবনের সত্য সরল পথটি সহজ নভা করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য সংকীর্ণ করা সহজ ও অসংকীর্ণ করা কঠিন হয়ে যাবে। আর যারা দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতিটি অবলম্বন করবে আল্লাহ জীবনের নোহরা, অপরিচ্ছন্ন ও কঠিন পথ তাদের জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তাদের জন্য অসংকীর্ণ করা সহজ এবং সংকীর্ণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ বর্ণনা এমন একটি বাক্যের দ্বারা শেষ করা হয়েছে যা তীরবেগে হৃদয়ে প্রবেশ করে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সে বাক্যটি হচ্ছে : দুনিয়ার এই ধন-সম্পদ যার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়ে দেয়, এসব তো কবরে তার সাথে যাবে না, তাহলে মরণের পরে এগুলো তার কি কাজে লাগবে?

দ্বিতীয় অংশেও এই একই রকম সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি মৌলিক তত্ত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে আল্লাহ মানুষকে অগ্রিম কিছু না জানিয়ে একেবারে অজ্ঞ করে পাঠিয়ে দেননি। বরং জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে সোজা পথ কোনটি এটি তাকে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজের জিম্মায় নিয়েছেন। এই সংগে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না যে, নিজের রসূল ও নিজের কিতাব পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ সবাইকে পথ দেখাবার জন্য রসূল ও কুরআন সবার সামনে উপস্থিত ছিল। দুই, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর কাছে দুনিয়া চাইলে তাও পাওয়া যাবে আবার আখেরাত চাইলে তাও তিনি দেবেন। এখন মানুষ এর মধ্য থেকে কোনটি চাইবে—সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানুষের নিজের দায়িত্ব। তিন, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে ন্যায় ও কল্যাণ পেশ করা হচ্ছে, যে হৃদভাগ্য ব্যক্তি তাকে মিথ্যা গণ্য করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। আর যে আল্লাহতীর্থ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে নিছক নিজের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের ধন-মাল সম্পর্কে ব্যয় করবে তার রব তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে এত বেশী দান করবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

আয়াত ২১

সূরা আল লাইল-মকী

রুকু' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
 وَالْأُنثَى ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى ۝
 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنَمِسِرَهُ لِلْإِمْرَى ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
 وَاسْتَغْنَى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنَمِسِرَهُ لِلْعَمْرَى ۝
 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

রাতের কসম যখন তা ঢেকে যায়। দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল হয়। আর সেই সত্তার কসম যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। আসলে তোমাদের প্রচেষ্টা নানা ধরনের।^১ কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ দান করেছে, (আল্লাহর নাফরমানি থেকে) দূরে থেকেছে এবং সংবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,^২ তাকে আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।^৩ আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং সংবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করেছে,^৪ তাকে আমি কঠিন পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।^৫ আর তার ধন-সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে।^৬

১. এ কথার জন্যই রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের জন্মের কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যেভাবে রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং তাদের প্রত্যেক জোড়ার প্রভাব ও ফলাফল পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি তোমরা যেসব পথে ও যেসব উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সেগুলোও বিভিন্ন ধরনের এবং সেগুলোর পরিণাম বিভিন্ন বিপরীতধর্মী ফলাফলেরও উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে : এসব বিভিন্ন প্রচেষ্টা দু'টি বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

২. এটি এক ধরনের মানবিক প্রচেষ্টা। তিনটি জিনিসকে এর অংশীভূত করা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলোর মধ্যে সব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এর

মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ যেন অর্থ লিঙ্গায় ডুবে না যায়। বরং নিজের অর্থ-সম্পদ, যে পরিমাণ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ে, সং-কাজে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে সাহায্য করার কাজে ব্যয় করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তার মনে যেন আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে। সে যেন নিজের যাবতীয় কর্ম, আচরণ-আচরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে এমন প্রত্যেকটি কাজ থেকে দূরে থাকে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, সে যেন সংবৃদ্ধি ও সংকাজের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়। সংবৃদ্ধি ও সংকাজ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্ম তিনটি সংবৃদ্ধির অন্তরভুক্ত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংবৃদ্ধির স্বীকৃতি হচ্ছে, শিরক, কুফরী ও নাস্তিকাবাদ পরিত্যাগ করে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে সত্য বলে মেনে নেবে। আর কর্ম ও নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে সংবৃদ্ধির স্বীকৃতি হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ছাড়াই নিছক নিজের অজ্ঞাতসারে কোন সংকাজ সম্পাদিত হওয়া নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও সংবৃদ্ধির যে ব্যবস্থা দান করা হয়েছে মানুষ তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবে। আল্লাহ শরীয়াত নামক যে ব্যাপকতর ব্যবস্থাটি দান করেছেন এবং যার মধ্যে সব ধরনের ও সকল প্রকার সংবৃদ্ধি ও সংকাজকে সুশৃঙ্খলভাবে একটি ব্যবস্থার আওতাধীন করেছেন, মানুষ তাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই অনুযায়ী সংকাজ করবে।

৩. এটি হচ্ছে এই ধরনের প্রচেষ্টার ফল। সহজ পথ মানে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে মিল রয়েছে এমন পথ। যে স্রষ্টা মানুষ ও এই সমগ্র বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন তিনি যেমন চান তেমন পথ। যে পথে নিজের বিবেকের সাথে লড়াই করে মানুষকে চলতে হয় না। যে পথে মানুষকে নিজের দেহ, প্রাণ, বুদ্ধি ও মনের শক্তিগুলোর ওপর জোর খাটিয়ে যে কাজের জন্য তাদেরকে এ শক্তি দান করা হয়নি জ্বরদগ্ধি তাদের থেকে সেই কাজ আদায় করে নিতে হয় না। বরং তাদের থেকে এমন কাজ নেয় যে জন্য তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এই শক্তিগুলো দান করা হয়েছে। পাপপূর্ণ জীবনে চতুর্দিকে যেমন প্রতি পদে পদে সংঘাত, সংঘর্ষ ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, এ পথে মানুষকে তেমনি ধরনের কোন বাধা ও সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয় না। বরং মানুষের সমাজে প্রতি পদে পদে সে সহানুভূতি, সহযোগিতা, প্রেম, ভালোবাসা, মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে থাকে। একথা সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ মানুষের সেবার নিয়োজিত করে, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে, নিজের জীবনকে অগ্নীল কার্যকলাপ ও দুহুতিমুক্ত রাখে, নিজের লেন-দেনের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়-নিষ্ঠ থাকে, কারো সাথে বেইমানী, শপথ ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে না, যার পক্ষ থেকে কারোর প্রতি জুলুম, নির্যাতন ও অন্যায় আচরণের আশংকা থাকে না। যে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং যার চরিত্র ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার সুযোগ কারোর থাকে না, সে যতই নষ্ট ও ভ্রষ্ট সমাজে বাস করুক না কেন সেখানে অবশ্য সে মর্যাদার আসনে সমাসীন থাকে। মানুষের মন তার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। মানুষের হৃদয়ে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার নিজের মন ও বিবেকও নিশ্চিত হয়ে যায়। সমাজে তার এমন মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোন অসংব্যক্তি ও দুহুতকারী কোন দিন লাভ করতে পারে না। একথাটিকেই সূরা আন নাহলে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

“যে ব্যক্তি সংকাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মু’মিন হলে আমি অবশি তাকে ভালো জীবন যাপন করাবো।” (৯৭ আয়াত)

আবার একথাটি সূরা মারয়ামে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِدًّا -

“নিসন্দেহে যারা ইমান এনেছে এবং যারা সংকাজ করেছে রহমান তাদের জন্য হৃদয়গুলোতে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।” (৯৬ আয়াত)

তাহাড়া এটিই মানুষের জন্য দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত পূর্ণ আনন্দের একমাত্র পথ। একমাত্র এ পথেই আছে আরাম ও প্রশান্তি। এর ফলাফল সাময়িক ও ক্ষণকালীন নয় বরং এটা হচ্ছে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ফল, এর কোন ক্ষয় নেই।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বনছেন, আমি তাকে এ পথে চলার সহজ সুযোগ দেবো। এর মানে হচ্ছে, যখন সে সংবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, এটিই তার উপযোগী পথ এবং দুষ্কৃতির পথ তার উপযোগী নয়, আর যখন সে কার্যত আর্থিক ভ্যাগ ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে একথা প্রমাণ করবে যে, তার এই স্বীকৃতি সত্য, তখন আল্লাহ এ পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য আবার গোনাহ করা কঠিন এবং নেকী করা সহজ হয়ে যাবে। হারাম অর্থ-সম্পদ তার সামনে এলে সে তাকে লাভের সওদা মনে করবে না। বরং সে অনুভব করবে, এটা জ্বলন্ত অংগার, একে সে হাতের তালুতে উঠিয়ে নিতে পারে না। ব্যভিচারের সুযোগ সে পাবে। কিন্তু তাকে সে ইন্দ্রিয় লিপ্সা চরিতার্থ করার সুযোগ মনে করে সেদিকে পা বাড়াবে না। বরং জাহান্নামের দরজা মনে করে তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। নামায তার কাছে কঠিন মনে হবে না বরং নামাযের সময় হয়ে গেলে নামায না পড়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না। যাকাত দিতে তার মনে কষ্ট হবে না। বরং যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত নিজের ধন-সম্পদ তার কাছে নাপাক মনে হবে। মোটকথা, প্রতি পদে পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পথে চলার সুযোগ ও সুবিধা সে লাভ করতে থাকবে। অবস্থাকে তার উপযোগী বানিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, ইতিপূর্বে সূরা আল বালাদে এ পথটিকে দুর্গম পার্বত্য পথ বলা হয়েছিল আর এখানে একে বলা হচ্ছে, সহজ পথ। এই দু’টি কথাকে কিভাবে এক করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, এই পথ অবলম্বন করার আগে এটা মানুষের কাছে দুর্গম পার্বত্য পথই মনে হতে থাকে। এ উঁচু দুর্গম পার্বত্য পথে চলার জন্য তাকে নিজের প্রবৃত্তির লালসা নিজের বৈষয়িক সার্থের অনুরাগী পরিবার পরিজন, নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও কাজ-কারবারের লোকজন এবং সবচেয়ে বেশী শয়তানের সাথে লড়াই করতে হয়। কারণ এদের প্রত্যেকেই তাকে এ পথে চলতে বাধা দেয় এবং একে ভীতিপ্রদ বানিয়ে তার সামনে হাথির করে। কিন্তু যখন মানুষ সংবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়ে সে পথে চলার সংকল্প করে, নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে কার্যত এই সংকল্পকে প্যাকাপোক্ত করে নেয়, তখন এই দুর্গম পথ

পাড়ি দেয়া তার জন্য সহজ এবং নৈতিক অবনতির গভীর খাদে গড়িয়ে পড়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. এটি দ্বিতীয় ধরনের মানসিক প্রচেষ্টা। প্রথম ধরনের প্রচেষ্টাটির সাথে প্রতি পদে পদে রয়েছে এর অমিল। কৃপণতা মানে শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে যাকে কৃপণতা বলা হয় তা নয়। অর্থাৎ এক একটি পয়সা গুণে গুণে রাখা, খরচ না করা, না নিজের জন্য না নিজের ছেলেমেয়ের জন্য। বরং এখানে কৃপণতা বলতে আল্লাহর পথে এবং নেকী ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় না করা বুঝাচ্ছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে এমন ব্যক্তিকেও কৃপণ বলা যায়, যে নিজের জন্য, নিজের আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যাসনের স্বার্থে এবং নিজের ইচ্ছামতো খুশী ও আনন্দ বিহারে দু'হাতে টাকা উড়ায় কিন্তু কোন ভালো কাজে তার পকেট থেকে একটি পয়সাও বের হয় না। অথবা কখনো বের হলেও তার পেছনে থাকে এর বিনিময়ে দুনিয়ার খ্যাতি, যশ, শাসকদের নৈকট্য লাভ বা অন্য কোন রকমের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার। বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার অর্থ দুনিয়ার বৈষয়িক লাভ ও স্বার্থকে নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের লক্ষে পরিণত করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাওয়া। কোন কাজে আল্লাহ খুশী হন এবং কোন কাজে নাখোশ হন তার কোন তোয়াক্কা না করা। আর সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করার মানে হচ্ছে, সৎকাজকে তার সকল বিস্তারিত আকারে সত্য বলে মেনে না নেয়া এখানে এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিপূর্বে সৎবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নেয়ার বিষয়টি আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

৫. এ পথকে কঠিন বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পথে যে পাড়ি জমাতে চায় সে যদিও বৈষয়িক লাভ, পার্থিব ভোগ-বিলাস ও বাহ্যিক সাফল্যের লোভে এ দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু এখানে সর্বক্ষণ তাকে নিজের প্রকৃতি, বিবেক, বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির তৈরি করা আইন এবং তার চারপাশের সমাজ পরিবেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। সততা, ন্যায় পরায়ণতা, বিশুদ্ধতা, ভদ্রতা, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা ও নীতি-নৈতিকতার সীমানালংঘন করে যখন সে সর্বপ্রকারে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ-লালসা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালায়, যখন তার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হতে থাকে এবং সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে তখন নিজের চোখেই সে লাস্ত্রিত ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হয় এবং যে সমাজে সে বাস করে সেখানেও তাকে প্রতি পদে পদে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। সে দুর্বল হলে এসব কার্যকলাপের জন্য তাকে নানা ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর সে ধনী, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হলে সারা দুনিয়া তার শক্তির সামনে মাথা নত করলেও কারো মনে তার জন্য সামান্যতমও শুভাকাংক্ষা, সম্মানবোধ ও ভালোবাসার প্রবণতা জাগে না। এমন কি তার কাজের সাথী-সহযোগীরাও তাকে একচ্ছন্ন স্বজ্ঞাত-দুর্বৃত্ত হিসেবেই গণ্য করতে থাকে। আর এ ব্যাপারটি কেবলমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী জাতিরাও যখন নৈতিকতার সীমানালংঘন করে নিজেদের শক্তি ও অর্থের বিভ্রমে পড়ে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তখন একদিকে বাইরের জগত তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদিকে তাদের নিজেদের সমাজ অপরাধমূলক কার্যকলাপ, আত্মহত্যা, নেশাখোরী, দুরারোগ্য ব্যাধি, পারিবারিক জীবনের ধ্বংস, যুব সমাজের অসৎপথ অবলম্বন, শ্রমী সংঘাত এবং জুলুম নিপীড়নের

إِن عَلِمْنَا لَكَهُدًى ۖ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۖ فَأَنْذَرْتُكَ نَارًا تَلْتَظِي ۚ لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۖ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۖ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۚ

নিসন্দেহে পথনির্দেশ দেয়া তো আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।^৭ আর আসলে আমি তো আখেরাত ও দুনিয়া উভয়েরই মালিক।^৮ তাই আমি তোমাদের সাবধান করে দিয়েছি জ্বলন্ত আগুন থেকে। যে চরম হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ তাতে ঝলসে যাবে না। আর যে পরম মুত্তাকী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে তাকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।^৯ তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। সেতো কেবলমাত্র নিজের রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এ কাজ করে।^{১০} আর তিনি অবশ্যি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।^{১১}

বিপুলাকার রোগে আক্রান্ত হয়। এমন কি উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে একবার পতন ঘটান পর ইতিহাসের পাতায় তাদের জন্য কলংক, লানত ও অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই থাকেনি।

আর এই ধরনের লোককে আমি কঠিন পথে চলার সুবিধা দেবো, একথা বলার মানে হচ্ছে, তার থেকে সংপথে চলার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হবে। অসংপথের দরজা তার জন্য খুলে দেয় হবে। অসৎকাজ করার যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হবে। খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ হবে এবং ভালো কাজ করার চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই সে মনে করবে এই বুঝি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থাটিকেই কুরআনে অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে : "আল্লাহ যাকে পথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বন্ধদেশ ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেবার এরাদা করেন তার বন্ধদেশকে সংকীর্ণ করে দেন এবং তাকে এমনভাবে সংকুচিত করেন যার ফলে (ইসলামের কথা মনে হলেই) সে অনুভব করতে থাকে যেন তার প্রাণবায়ু উড়ে যাচ্ছে। (আনআম ১২৫ আয়াত) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে : নিসন্দেহে নামায একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ অনুগত বান্দার জন্য নয়।" (আল বাকারাহ ৪৬ আয়াত) আর মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তারা নামাযের দিকে এলেও গড়িমসি করে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলেও যেন মন চায় না তবুও খরচ

করে।" (আত তাওবাহ ৫৪ আয়াত) আরো বলা হয়েছে : "তাদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের ওপর জবরদস্তি আরোপিত জরিমানা মনে করে।" (আত তাওবাহ ৯৮ আয়াত)

৬. অন্য কথায় বলা যায়, একদিন তাকে অবশ্যি মরতে হবে। তখন এখানে আশ্রয় আরামের জন্য সে যা কিছু সংগ্রহ করেছিল সব এই দুনিয়াতেই রেখে যেতে হবে। যদি নিজের আখেরাতের জন্য এখান থেকে কিছু কামাই করে না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ার এ ধন-সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে? সে তো কোন দালান কোঠা, মোটরগাড়ি, সম্পত্তি বা জমানো অর্থ সংগে করে কবরে যাবে না।

৭. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি হবার কারণে মহান আল্লাহ নিজের জ্ঞানগূর্ণ কর্মনীতি, ন্যায়নিষ্ঠা ও রহমতের ভিত্তিতে নিজেই মানুষকে এ দুনিয়ায় এমনভাবে ছেড়ে দেননি যে, সে কিছুই জানে না। বরং সঠিক পথ কোন্টি ও ভুল পথ কোন্টি, নেকী, গোনাহ, হালাল ও হারাম কি, কোন্ কর্মনীতি তাকে নাকরমান বান্দার ভূমিকায় এনে বসাবে—এসব কথা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন।

একথাটিকেই সূরা আন নাহলে এভাবে বলা হয়েছে : وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ "আর সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহরই ওপর বার্তায় যখন বাঁকা পথও রয়েছে।" (৯ আয়াত) ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাক্বীমুল কুরআন, আন নাহল, ৯ টীকা।

৮. এ বক্তব্যটির কয়েকটি অর্থ হয়। সবগুলো অর্থই সঠিক। এক, দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত কোথাও তোমরা আমার নিয়ন্ত্রণ ও পাকড়াও এর বাইরে অবস্থান করছো না। কারণ আমিই উভয় জাহানের মালিক। দুই, তোমরা আমার দেখানো পথে চলো বা না চলো আসলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের ওপর আমার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। তোমরা ভুল পথে চললে তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না, তোমাদের ক্ষতি হবে। আর তোমরা সঠিক পথে চললে আমার কোন লাভ হবে না, তোমরাই লাভবান হবে। তোমাদের নাকরমানির কারণে আমার মালিকানায় কোন কমতি দেখা দেবে না এবং তোমাদের আনুগত্য তার মধ্যে কোন বৃদ্ধিও ঘটতে পারবে না। তিন, আমিই উভয় জাহানের মালিক। দুনিয়া তথা বৈশ্বিক স্বার্থ চাইলে তা আমার কাছ থেকেই তোমরা পাবে। আবার আখেরাতের কল্যাণ চাইলে তাও দেবার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। একথাটিই সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে :

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সওয়াব হাসিলের সংকল্পে কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো আর যে ব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব হাসিলের সংকল্পে কাজ করবে আমি তাকে আখেরাত থেকে দেবো।"

সূরা শুরা ২০ আয়াতে একথাটি নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ -

“যে ব্যক্তি আখেরাতের কৃষি চায় তার কৃষিকে আমি বাড়িয়ে দেই আর যে দুনিয়ার কৃষি চায় তাকে দুনিয়া থেকেই দান করি, কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।”

আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাহফীমুল কুরআন, আলে ইমরান ১০৫ টীকা এবং আশ শূরা ৩৫ টীকা।

৯. এর অর্থ এই নয় যে, চরম হতভাগ্য ছাড়া আর কেউ জাহান্নামে যাবে না এবং পরম মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। বরং দু’টি চরম পরস্পর বিরোধী চরিত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশ করে তাদের পরস্পর বিরোধী চরম পরিণাম বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শিক্ষাকে মিথ্যা বলে এবং আনুগত্যের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেবল ইমান এনেই ক্ষান্ত হয় না বরং পরম আন্তরিকতা সহকারে কোন প্রকার লোক দেখানো প্রবণতা, নাম যশ ও খ্যাতির মোহ ছাড়াই শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পাক-পবিত্র মানুষ হিসেবে গণ্য হবার আকাংক্ষায় আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। এই দু’ ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক সে সময় মক্কার সমাজে সবার সমানে বর্তমান ছিল। তাই কারো নাম না নিয়ে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, জাহান্নামের আগুনে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক নয় বরং প্রথম ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকই পুড়বে। আর এই আগুন থেকে প্রথম ধরনের লোক নয় বরং দ্বিতীয় ধরনের লোককেই দূরে রাখা হবে।

১০. এখানে সেই মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু ব্যক্তির আন্তরিকতার আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে, আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না, যার বদলা সে এখন চুকাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে আরো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে উপহার উপঢৌকন ইত্যাদি দিচ্ছে এবং তাদেরকে দাওয়াত খাওয়াচ্ছে। বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এমনসব লোককে সাহায্য করছে, যারা ইতিপূর্বে তার কোন উপকার করেনি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার করার কোন আশা নেই। এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম ও বাদীদের আযাদ করার কাজটি। মক্কা মু’আযযমার যে অসহায় গোলাম ও বাদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকণ্ঠা নির্ঘাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল হযরত আবু বকর (রা) তাদেরকে মালিকদের জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছিলেন। ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের এই রেওয়াযাট উদ্ধৃত করেছেন : হযরত আবু বকরকে এভাবে গরীব গোলাম ও বাদীদেরকে গোলামী মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে দেখে তাঁর পিতা তাকে বলেন, হে পুত্র! আমি দেখছি তুমি দুর্বল লোকদের মুক্ত করে দিচ্ছো, যদি এ টাকাটা তুমি শক্তিশালী জোয়ানদের মুক্ত করার জন্য খরচ করতে তাহলে তারা তোমার হাতকে শক্তিশালী করতো। একথায হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে বলেন: **أَيُّ أَبَاهُ إِنَّمَا أُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ** ‘আব্বাজান! আমি তো আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান চাই।’

১১. এ আয়াতের দু’টি অর্থ হতে পারে। দু’টি অর্থই সঠিক। একটি অর্থ হচ্ছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, শীঘ্রই আল্লাহ এ ব্যক্তিকে এতসব কিছু দেবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

আদ দুহা

৯৩

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াদুহা (وَالضُّحَى) -কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাখিলের সময়-কাল

এই সূরার বক্তব্য বিষয় থেকে একথা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এটি মক্কা মু'আযযমায় প্রথম যুগে নাখিল হয়। হাদীস থেকেও জানা যায়, কিছুদিন অহীর অবতরণ বন্ধ ছিল। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বারবার তাঁর মনে এই আশংকার উদয় হচ্ছিল, হয়তো তাঁর এমন কোন ত্রুটি হয়ে গেছে যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কোন প্রকার অসন্তুষ্টির কারণে অহীর সিলসিলা বন্ধ করা হয়নি। বরং এর পেছনে সেই একই কারণ সক্রিয় ছিল যা আলোকোজ্জ্বল দিনের পরে রাতের নিস্তব্ধতা এ প্রশান্তি ছেয়ে যাবার মধ্যে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ অহীর প্রথর কিরণ যদি একনাগাড়ে তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো তাহলে তাঁর স্নায়ু তা বরদাশত করতে পারতো না। তাই মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। তাঁকে আশ্রয় ও প্রশান্তি দান করাই এর উদ্দেশ্য। নবুওয়্যাতের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থার মুখোমুখি হন। সে সময় অহী নাখিলের কষ্ট বরদাশত করার অভ্যাস তাঁর গড়ে ওঠেনি। তাই মাঝে মাঝে ফকি দেবার প্রয়োজন ছিল। সূরা মুদাসসিরের ভূমিকায় আমরা একথা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আর অহী নাখিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাস্থ্য ওপর এর কী গভীর গুজাব পড়তো তা আমি সূরা মুযামিলের ৫ টীকায় বলেছি। পরে তাঁর মধ্যে এই মহাতার বরদাশত করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে গেলে আর দীর্ঘ ফকি দেবার প্রয়োজন থাকেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য রসূলুন্নাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া। আর এই সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্য ছিল অহী নাখিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাঁর মধ্যে যে পেরেশানী দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। প্রথমে আলো ঝলমল দিনের এবং রাতের নীরবতা ও প্রশান্তির কসম খেয়ে তাঁকে এই মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করা হয়েছে যে, তাঁর রব তাঁকে মোটেই পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। এরপর তাঁকে

সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এগুলো মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। তাঁর জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উন্নততর হয়ে যেতেই থাকবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এমনভাবে তাঁর দান বর্ষণ করতে থাকবেন যার ফলে তিনি খুশী হয়ে যাবেন। কুরআনের যেসব সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় এটি তার অন্যতম। অথচ যে সময় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন যেসব অসহায় সাহায্য-স্বলহীন ব্যক্তি মক্কায় সমগ্র জাতির জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল তারা যে কোনদিন এত বড় বিখ্যকর সাফল্যের মুখ দেখবে এর কোন দূরবর্তী আলামতও কোথাও দেখা যায়নি।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি—এ ধরনের পেরেশানীতে তুমি ভুগছো কেন? আমি তো তোমার জন্মের দিন থেকেই তোমার প্রতি অবিরাম মেহেরবানী করে আসছি। তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে। আমি তোমার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা করেছি। তুমি অনভিজ্ঞ ছিলে। আমি তোমাকে পথের সন্ধান দিয়েছি। তুমি অর্থ-সম্পদহীন ছিলে। আমি তোমাকে বিস্ত্রশালী করেছি। এসব কথা পরিকারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি শুরু থেকেই আমার প্রিয়পাত্র আছো এবং আমার মেহেরবানী, অনুগ্রহ দান স্থায়ীভাবে তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সূরা ত্বা-হা'র ৩৭ থেকে ৪২ পর্যন্ত আয়াতগুলোও সামনে রাখতে হবে। এই আয়াতগুলোতে ইয়রত মূসাকে ফেরাউনের মতো শক্তিশালী জালেমের বিরুদ্ধে পাঠাবার সময় আল্লাহ তাঁর পেরেশানী দূর করার জন্য তাঁর জ্ঞানের পর থেকে কিভাবে আল্লাহর মেহেরবানী তাঁকে ঘিরে রেখেছিল সে কথা তাঁকে বলেন। এই সংগে তাঁকে একথাও বলেন যে, এ অবস্থায় তুমি নিশ্চিত থাকো, এই ভয়াবহ অভিযানে তুমি একাকী থাকবে না বরং আমার মেহেরবানীও তোমার সাথে থাকবে।

সবশেষে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার জবাবে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তাঁর কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে একথা তাঁকে জানিয়ে দেন।

আয়াত ১১

সূরা আদ দুহা-মকী

কক্ব' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَآ قَلَىٰ ۝
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

উজ্জ্বল দিনের কসম^১ এবং রাতের কসম যখন তা নিখুম হয়ে যায়।^২ (হে নবী!) তোমার রব তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টিও হননি।^৩ নিসন্দেহে তোমার জন্য পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো।^৪ আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে।^৫

১. এখানে 'দুহা' শব্দটি রাতের মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়েছে তাই এর অর্থ উজ্জ্বল দিবা। সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে এর নজীর হিসেবে পেশ করা যায় :

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۚ أَوْ أَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ -

'জনপদবাসীরা কি এ ব্যাপারে নির্ভর হয়ে পড়েছে যে, তাদের ওপর রাতে আমার আযাব আসবে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে? আর জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে তাদের ওপর দিন-দুপুরে আমার আযাব আসবে যখন তারা খেলতে থাকবে?' (৯৭-৯৮ আয়াত) এই আয়াতগুলোতেও 'দুহা' (ضُحًى) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাতের মোকাবেলায়। আর এর অর্থ চাপ্ত এর সময় নয়, বরং দিন।

২. মূলে রাতের সাথে سَجَى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র অন্ধকার ছেয়ে যাবারই নয় বরং নিখুম ও শান্ত হয়ে যাবার অর্থও পাওয়া যায়। সামনের দিকে যে বর্ণনা আসছে তার সাথে রাতের এই গুণাবলীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

৩. হাদীস থেকে জানা যায়, কিছুদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাখিল বন্ধ ছিল। এ সময়টা কতদিনের ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। ইবনে জুরাইজ ১২ দিন, কাসবী ১৫ দিন, ইবনে আব্বাস ২৫ দিন, সুদী ও মুকাতিল এর মেয়াদ ৪৫ দিন বলে বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সা) নিজে এ জন্য স্ত্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন এবং বিরোধীরাও তাঁকে বিদূষ করতে শুরু করেছিল। কারণ তাঁর ওপর নতুন নতুন সূরা নাখিল হলে তিনি তা

লোকদের শুনাতেন। তাই দীর্ঘদিন যখন তিনি লোকদেরকে কোন অহী শুনােন না তখন বিরোধীরা মনে করলো এ কালাম যেখান থেকে আসতো সে উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। জন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা) রেওয়য়াত করেন, যখন জিব্রীল আলাইহিস সালামের আসার সিলসিলা খেমে গেলো, মুশরিকরা বলতে শুরু করলো : মুহাম্মাদকে (সা) তাঁর রব পরিত্যাগ করেছেন। (ইবনে জারীর, তাবারানী, আবদ ইবনে হমাইদ, সাঈদ ইবনে মনসূর ও ইবনে মারদুইয়া) অন্যান্য বিভিন্ন রেওয়য়াত থেকে জানা যায়, রসূল (সা)-এর চাচী আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের ঘর ছিল তাঁর ঘরের সাথে লাগোয়া। সে তাঁকে ডেকে বললো : “মনে হচ্ছে তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।” আউফী ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়য়াত উদ্ধৃত করে বলেন : কয়েকদিন পর্যন্ত জিব্রীলের আসা বন্ধ থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে মুশরিকরা বলতে শুরু করলো, তার রব তার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। কাতাদাহ ও যাহ্বাক বর্ণিত মুরসাল* হাদীসেও প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) গভীর দুঃখ ও মর্মব্যথার কথাও বর্ণিত হয়েছে। আর এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। কারণ প্রেমাস্পদের দিক থেকে বাহ্যত অমনোযোগিতা ও উপেক্ষা, কুফর ও ঈমানের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবার পর এই প্রাণান্তকর সংঘাত সংগ্রামের মাঝ দরিয়ায় যে শক্তিটি ছিল তাঁর একমাত্র সহায় তার সাহায্য থেকে বাহ্যত বঞ্চিত হওয়া এবং এর ওপর বাড়তি বিপদ হিসেবে শত্রুদের বিদূষ-ভর্ৎসনা ইত্যাদি এসব কিছু মিলে অবশ্যি তাঁর জন্য মারাত্মক ধরনের পেরেশানী সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ অবস্থায় তাঁর মনে বারবার এ সন্দেহ জেগে থাকবে যে, তিনি এমন কোন ভুল তো করেননি যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি হক ও বাতিলের এই লড়াইয়ে তাঁকে একাকী ছেড়ে দিয়েছেন।

এই অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহুনা দেবার জন্য সূরাটি নাখিল হয়। এতে দিনের আলোর ও রাতের নিরবতার কসম খেয়ে রসূলুল্লাহকে (সা) বলা হয়েছে : তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি। একথার জন্য যে সঙ্কল্পে ভিত্তিতে এই দু’টি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, দিনের আলোকমালায় উদ্ভাসিত হওয়া এবং রাতের নিবৃত্ততা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়া যেমন আল্লাহর দিনে মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট এবং রাতে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকার জন্য নয় বরং একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনে এই দু’টি অবস্থার উদ্ভব হয় ঠিক তেমনি তোমার কাছে কখনো অহী পাঠানো এবং তা পাঠানো বন্ধ করাও একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনেই হয়ে থাকে। মহান

* মুরসাল এমন এক ধরনের হাদীসকে বলা হয় যেখানে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী হিসেবে সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়নি অর্থাৎ তাবেয়ী সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমামদের মধ্যে আবু হানিফা (রা) ও মালিক (রা)-ই একমাত্র এ ধরনের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এক বর্ণনামতে ইমাম আহমদ ইবনে হামল (রা) মুরসাল হাদীসের ভিত্তিতে ফতওয়া দিয়েছেন এবং এর বিপরীত রায়কে রদ করেছেন। (আ’নামুল মুকিইন, ইবনে কায়্যেম) -অনুবাদক

আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে অহী পাঠান এবং যখন অহী পাঠান না তখন মনে করতে হবে, তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তোমাকে ত্যাগ করেছেন—এ ধরনের কোন কথা বা বক্তব্যের কোন সম্পর্ক এখানে নেই। এ ছাড়া এই বিষয়বস্তুর সাথে এই কসমের আরো সম্পর্ক রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, দিনে সূর্যের কিরণ যদি অনবরত মানুষের ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তাকে ক্লান্ত ও অবশ করে দেবে। তাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত দিনের আলো বিরাজ করে। এরপরে রাতের আসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে মানুষ ক্লান্তি দূর করতে ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে অহীর কিরণ যদি অনবরত তোমার ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তোমার স্নায়ুর সহ্যের অতীত হয়ে পড়বে। তাই মাঝে মাঝে ফাতরাতুল অহীর (অহী নাযিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাওয়া) একটি সময়ও আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন। এভাবে অহী নাযিল হওয়ার কারণে তোমার ওপর যে চাপ পড়ে তার প্রভাব খতম হয়ে যাবে এবং তুমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ অহী সূর্যের উদয় যেন ঠিক উজ্জ্বল দিনের সমতুল্য এবং ফাতরাতুল অহীর সময়টি রাতের প্রশান্তির পর্যায়ভুক্ত।

৪. মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সুখবরটি এমন এক সময় দেন যখন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছিল তাঁর সহযোগী এবং অন্যদিকে সমগ্র জাতি ছিল তাঁর বিরোধী। বাহ্যত সাফল্যের কোন দূরবর্তী চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। ইসলামের প্রদীপ মক্কাতে টিম টিম করে জ্বলছিল। চতুরদিকে ঝড় উঠেছিল তাকে নিভিয়ে দেবার জন্য। সে সময় আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন : প্রাথমিক যুগের সংকটে তুমি মোটেই পেরেশান হয়ে না। তোমার জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো প্রমাণিত হবে। তোমার শক্তি, সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা দিনের পর দিন বাড়তে থাকবে। তোমার প্রভাব ও অনুপ্রবেশের সীমানা বিস্তৃত হতেই থাকবে। আবার এই ওয়াদা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে এ ওয়াদাও আছে যে, আখেরাতে তুমি যে মর্যাদা লাভ করবে তা দুনিয়ায় তোমার অর্জিত মর্যাদা থেকে অনেক গুণ বেশী হবে। তাবারানী তাঁর আওসাত গহ্নে এবং বাইহাকী তাঁর দালায়েল গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “আমার পরে আমার উম্মাত যেসব দেশ জয় করবে তা আমার সামনে পেশ করা হয়। তাতে আমি খুব খুশী হই। তখন মহান আল্লাহ একথা নাযিল করেন যে, আখেরাতে তোমার জন্য দুনিয়া থেকেও ভালো।”

৫. অর্থাৎ দিতে কিছুটা দেরী হলে সেসময় দূরে নয়, যখন তোমার ওপর তোমার রবের দান ও মেহেরবানী এমনভাবে বর্ষিত হবে যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে। এই ওয়াদাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেই পূর্ণ হয়েছে। সমগ্র আরব ভূখণ্ড, দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল থেকে উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সিরীয় সীমান্ত ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে নিয়ে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত এলাকা তাঁর শাসনাধীনে চলে আসে। আরবের ইতিহাসে এই প্রথমবার এই সমগ্র ভূখণ্ডটি একটি আইন ও শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন হয়। যে শক্তিই এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর কালেমায় সমগ্র দেশ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। যে দেশে মূশরিক ও আহুলি কিতাবরা নিজেদের মিথ্যা মতবাদ ও

الْمَرْبِ جَدَّكَ يَتِيمًا فَارْوَى ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝ وَوَجَدَكَ
عَائِلًا فَاَغْنَى ۝ فَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝
وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَكَدَّرْتُ ۝

তিনি কি তোমাকে এতিম হিসেবে পাননি? তারপর তোমাকে আশ্রয় দেননি? ৬ তিনি তোমাকে পথ না পাওয়া অবস্থায় পান, তারপর তিনিই পথ দেখান। ৭ তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান, তারপর তোমাকে ধনী করেন। ৮ কাজেই এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। ৯ প্রার্থীকে তিরস্কার করো না। ১০ আর নিজেদের রবের নিয়ামত প্রকাশ করো। ১১

আদর্শকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল সেখানে মানুষ কেবল আনুগত্যের শিরই নত করেনি বরং তাদের মনও বিজিত হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাসে, নৈতিক চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। জাহেলিয়াতের গভীর পংকে নিমজ্জিত একটি জাতি মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে এমনভাবে বদলে যায় যে, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। এরপর নবী (সা) যে আন্দোলনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা বিপুল শক্তিমত্তা সহকারে জেগে ওঠে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তিন মহাদেশের বিরাট অংশ ছেয়ে যায় এবং দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এসব মহান আশ্রাহ তাঁর রসূলকে দিয়েছেন দুনিয়ায়। আর আখেরাতে তাঁকে যা কিছু দেবেন তার বিপুলতা ও মহত্ত্বের কল্পনাই করা যাবে না। (দেখুন তাকহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ১১২ টীকা)

৬. অর্থাৎ তোমাকে ত্যাগ করার ও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। যখন তুমি এতিম অবস্থায় অনুলাভ করেছিলে তখন থেকেই তো আমি তোমার প্রতি মেহেরবানী করে আসছি। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন ছয় মাসের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা ইন্তিকাল করেন। কাজেই এতিম হিসেবেই তিনি পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু এ অবস্থায় মহান আশ্রাহ একদিনও তাঁকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। ছ'বছর বয়স পর্যন্ত মা তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। তাঁর স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হবার পর থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর দাদা তাঁকে প্রতিপালন করেন। দাদা কেবল তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেনই তাই না বরং তাঁর জন্য গর্বও করতেন। তিনি লোকদের বলতেন, আমার এই ছেলে একদিন দুনিয়ায় বিপুল খ্যাতির অধিকারী হবে। তার ইন্তিকালের পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। চাচা তাঁর সাথে এমন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন যে, কোন পিতার পক্ষেও এর চেয়ে বেশী প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এমনকি নবুওয়াত লাভের পর সমগ্র জাতি যখন তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল তখন দশ বছর পর্যন্ত তিনিই তার সাহায্যার্থে চীনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

৭. মূলে “দালান” (ضالاً) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এসেছে “দালালাত” (ضلال) থেকে। এর কয়েকটি অর্থ হয়। এর একটি অর্থ গোমরাহী। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এক ব্যক্তি পথ জানে না, এক জায়গায় গিয়ে সে সামনে বিভিন্ন পথ দেখে কোন পথে যাবে তা ঠিক করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া বা হারানো জিনিস। আরবী প্রবাদে বলা হয়, ضلّ الماء في اللبن অর্থাৎ পানি দুধের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মরুভূমির মধ্যে যে গাছটি একাকি দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার আশেপাশে কোন গাছ থাকে না তাকেও আরবীতে “দাল্লাহ” বলা হয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থেও “দালাল” (ضلال) বলা হয়। যেমন, অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও “দালাল” শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার গাফলতির জন্যও “দালাল” ব্যবহার করা হয়। যেমন কুরআন মজীদে এর দৃষ্টান্ত দেখা যায় : لا يضل ربّي ولا يئسني অর্থাৎ “আমার রব না গাফেল হন আর না তিনি ভুলে যান।” (ত্বা-হা ৫২) এই বিভিন্ন অর্থের মধ্য থেকে প্রথম অর্থটি এখানে খাপ খায় না। কারণ ইতিহাসে রসূলের শৈশব থেকে নিয়ে নবুওয়াত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়-কালের যেসব অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতে কোথাও তিনি কখনো মৃতিপূজা, শিরক বা নাস্তিক্যবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন অথবা তাঁর জাতির মধ্যে যেসব জাহেলী কার্যকলাপ, রীতিনীতি ও আচার আচরণের প্রচলন ছিল তার সাথেও তিনি কোনক্রমে জড়িত হয়েছিলেন বলে সামান্যতম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই وَجَدَكَ ضَالًّا বাক্যে কোনক্রমেই এ অর্থ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁকে বিশ্বাস ও কর্মের দিক থেকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে অন্যান্য অর্থগুলো কোন না কোনভাবে এখানে খাপ খেতে পারে। বরং বিভিন্ন দিক থেকে হয়তো প্রত্যেকটি অর্থই এখানে কার্যকর হতে পারে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অস্তিত্বে ও তাঁর একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। সে সময় তাঁর জীবন গোনাহ মুক্ত এবং নৈতিক গুণাবলী সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু সত্যদীন এবং তাঁর মূলনীতি ও বিধান সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে : مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ অর্থাৎ “তুমি জানতে না কিভাবে কি এবং ইমানই বা কি।” (আশুপূরা ৫২ আয়াত) এ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, নবী (সা) একটি জাহেলী সমাজের বৃকে হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং নবুওয়াত লাভের আগে একজন পথপ্রদর্শক ও পথের দিশা দানকারী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে সামনে আসেনি। এর এ অর্থও হতে পারে যে, জাহেলিয়াতের মরুভূমিতে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি নিসংগ বৃক্ষের মতো। এই বৃক্ষের ফল উৎপাদনের ও চারাগাছ বৃদ্ধি করে আর একটি বাগান তৈরি করার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু নবুওয়াতের পূর্বে এ যোগ্যতা কোন কাজে লাগেনি। এ অর্থও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। জাহেলিয়াতের অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে তা নষ্ট হতে বসেছিল। “দালাল”কে গাফলতির অর্থেও ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ নবুওয়াত লাভের পরে আল্লাহ তাঁকে যেসব জ্ঞান ও সত্যের সাথে পরিচিত করিয়েছেন ইতিপূর্বে তিনি সেগুলো থেকে গাফেল ছিলেন। কুরআনেও এক জায়গায় বলা হয়েছে : وَأَنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ “আর যদিও তুমি ইতিপূর্বে এসব বিষয়ে গাফেল ছিলে।” (ইউসুফ ৩) এ ছাড়াও দেখুন সূরা আল বাকারাহ ২৮৩ আয়াত এবং আশু শু’আরা ২০ আয়াত)

৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৈতৃক সূত্রে উত্তরাধিকার হিসেবে শুধুমাত্র একটি উটনী ও একটি বাদী লাভ করেছিলেন। এভাবে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। তারপর এমন এক সময় আসে যখন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা হযরত খাদীজা (রা) প্রথমে ব্যবসায়ে তাঁকে নিজের সাথে শরীক করে নেন। তারপর তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। এভাবে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বও তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। এই সুবাদে তিনি কেবল ধনীই হননি এবং তাঁর ধনাঢ্যতা নিছক স্বীয় ধনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না বরং তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানে তাঁর নিজের যোগ্যতা ও শ্রম বিরাট ভূমিকা পালন করে।

৯. অর্থাৎ যেহেতু তুমি নিজে এতিম ছিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন এবং এতিম অবস্থায় সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তোমাকে সাহায্য-সহায়তা দান করেছেন, তাই আল্লাহর এই সাহায্যের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাররূপ তুমি কখনো কোন এতিমের প্রতি জুলুম করবে না।

১০. এর দু'টি অর্থ হয়। যদি প্রার্থীকে সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী হিসেবে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, তাকে সাহায্য করতে পারলে করো আর না করতে পারলে কোমল স্বরে তাকে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়ে দাও। কিন্তু কোনক্রমে তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই নির্দেশটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—“তুমি অভাবী ছিলে তারপর আল্লাহ তোমাকে ধনী করে দিয়েছেন। আর যদি প্রার্থীকে জিজ্ঞেসকারী অর্থাৎ দীনীর কোন বিষয় বা বিধান জিজ্ঞেসকারী অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, এই ধরনের লোক যতই মূর্খ ও অজ্ঞ হোক না কেন এবং যতই অযৌক্তিক পদ্ধতিতে সে প্রশ্ন করুক বা নিজের মানসিক সংকট উপস্থাপন করুক না কেন, সকল অবস্থায়ই স্নেহশীলতা ও কোমলতা সহকারে তাকে জবাব দাও এবং জ্ঞানের অহংকারে বদমেজাজ লোকদের মতো ধমক দিয়ে বা কড়া কথা বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই বাণীটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—“তুমি পথের খোঁজ জানতে না তারপর তিনিই তোমাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন।” হযরত আবু দারদা (রা) হাসান বসরী (রা), সূফিয়ান সগরী (রা) এবং অন্যান্য কয়েকজন মনীষী এই দ্বিতীয় অর্থটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ তাদের মতে বক্তব্য বিন্যাসের দিক দিয়ে বিচার করলে এ বক্তব্যটি **ووجدك ضالاً فهدى** এর জবাবেই দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১. নিয়ামত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ এমনসব নিয়ামত হয়, যা এই সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রসূলকে দান করেছিলেন। আবার এমন সব নিয়ামতও হয়, যা এই সূরায় প্রদত্ত নিজের ওয়াদা এবং পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা দান প্রসংগে তিনি রসূলকে প্রদান করেছিলেন। এর ওপর আবার হুকুম দেয়া হয়েছে, হে নবী! আল্লাহ তোমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার প্রত্যেকটির কথা শ্রবণ কর। এ নিয়ামত প্রকাশ করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে এবং নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি নিয়ামত বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত প্রকাশের পদ্ধতি নিম্নরূপ : মুখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং

একধার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমি যেসব নিয়ামত লাভ করেছি সবই আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ফল। নয়তো এর মধ্যে কোন একটিও আমার নিজের ব্যক্তিগত উপার্জনের ফসল নয়। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে নবুওয়াতের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। লোকদের মধ্যে বেশী বেশী করে কুরআন প্রচার করে এবং তার শিক্ষাবলীর সাহায্যে মানুষের হৃদয়দেশ আলোকিত করে কুরআনের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। পথহারা মানুষদের সরল সত্য পথ দেখিয়ে দিয়ে এবং সবরের সাহায্যে এই কাজের যাবতীয় তিক্ততা ও কষ্টের মোকাবেলা করে হেদায়াত লাভের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। এতিম অবস্থায় সাহায্য-সহায়তা দান করে আল্লাহ যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এতিমদের সাথে ঠিক তেমনি অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করে এই নিয়ামতটি প্রকাশ করা যেতে পারে। দারিদ্র্য ও অভাব থেকে সচ্ছলতা ও ধনাঢ্যতা দান করার জন্য যে অনুগ্রহ আল্লাহ করেছেন অভাবী মানুষদের সাহায্য করেই সেই নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। মোটকথা, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করার পর একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে তাঁর রসূলকে এই গভীর ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ হেদায়াত দান করেন।

আলায় নাশরাহ

৯৪

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দু'টিকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাম্বিলের সময়-কাল

সূরা আদ্ দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাম্বিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যকা মু'আযযমায় আদ্ দুহার পরেই এই সূরাটি নাম্বিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির উদ্দেশ্যও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষ্য দান করা। নবুওয়্যাত লাভ করার পর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই তাঁকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, নবুওয়্যাত লাভের আগে তাঁকে কখনো তেমনি অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর নিজের জীবনে এটি ছিল একটি মহাবিপ্লব। নবুওয়্যাত পূর্ব জীবনে এ ধরনের কোন বিপ্লবের ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই দেখতে দেখতে সমগ্র সমাজ তাঁর দূশমন হয়ে যায়। অথচ পূর্বে এই সমাজে তাঁকে বড়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। যেসব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গোত্রীয় লোকজন ও মহন্তাবাসী ইতিপূর্বে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতো তারাই এখন তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। যকায় এখন আর কেউ তাঁর কথা শুনতে প্রবৃত্ত ছিল না। পথে তাঁকে দেখলে লোকেরা নিস দিতো, যা তা মন্তব্য করতো। প্রতি পদে পদে তিনি সর্কেটের সম্মুখীন হতে থাকেন। যদিও ধীরে ধীরে এসব অবস্থার মোকাবেলা করতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তবুও এই প্রথম দিকের দিনগুলো তাঁর জন্য ছিল বড়ই কঠিন এবং এগুলো তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এ জন্য তাঁকে সাক্ষ্য দা দেবার উদ্দেশ্যে প্রথমে সূরা আদ্ দুহা এবং পরে এই সূরাটি নাম্বিল হয়।

এই সূরায় মহান আল্লাহ প্রথমেই তাঁকে জ্ঞানিয়ে দিয়েছেন; আমি তোমাকে তিনটি বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করেছি। এগুলোর উপস্থিতিতে তোমার মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে হৃদয়দেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার নিয়ামত। দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে, নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে যে তারী বোঝা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল তা কি আমি তোমার ওপর থেকে নামিয়ে দেইনি? তৃতীয়টি হচ্ছে, সুনাম ও

সুখ্যাতিকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নিয়ামত। এই নিয়ামতটি তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেয়া তো দূরের কথা তাঁর সমানও কাউকে কখনো দেয়া হয়নি। সামনের দিকের ব্যাখ্যায় আমি এ তিনটি নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং এগুলো কত বড় নিয়ামত ছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

এরপর বিশ্ব-জাহানের প্রভু তাঁর বান্দা ও রসূলকে এই মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করেছেন যে, সমস্যা ও সংকটের যে যুগের মধ্য দিয়ে তুমি এগিয়ে চলছো এটা কোন সুদীর্ঘ যুগ নয়। বরং এখানে সমস্যা, সংকট ও সংকীর্ণতার সাথে সাথে প্রশস্ততার যুগও চলে আসছে। এই এক কথাই সূরা আদ দুহায় এভাবে বলা হয়েছে : তোমার জন্য প্রত্যেকটি পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো হবে এবং শ্রীযুগই তোমার রব তোমাকে এমন সবকিছু দেবেন যাতে তোমার মন খুশীতে ভরে যাবে।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের এসব কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে একটি মাত্র জিনিসের সাহায্যে। সেটি হচ্ছে : নিজের কাজ-কর্ম থেকে ফুরসত পাবার সাথে সাথেই তুমি পরিশ্রম পূর্ণ ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হয়ে যাও। আর সমস্ত জিনিসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এটি সেই একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি যা সূরা মুখ্যাম্মিলের ৯ আয়াতে আরো বেশী বিস্তারিতভাবে তাঁকে দান করা হয়েছে।

আয়াত ৮

সূরা আলাম নাশরাহ-মকী

রুক' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الْكَرْنَشَرَخَ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنقَضَ
ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

হে নবী! আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি ১০ আমি তোমার ওপর থেকে ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল ১২ আর তোমার জন্য তোমার খ্যাতির কথা বুলন্দ করে দিয়েছি ১৩ আসলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে ১৪ অবশ্যই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও এবং নিজের রবেরই প্রতি মনোযোগ দাও ১৫

১. এ প্রশ্নটি সহকারে বক্তব্য শুরু করায় এবং এর পরবর্তী বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা থেকে প্রকাশ হয় ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর প্রথম যুগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কঠিন বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো তাঁকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে সহোদন করে সাহুনা দিয়ে বলেন, হে নবী! আমি কি তোমার প্রতি অমুক অমুক মেহেরবানী করিনি? তাহলে এই প্রাথমিক সংকটগুলোর মুখোমুখি হয়ে তুমি পেরেশান হচ্ছে কেন?

কুরআন মজীদে যেসব জায়গায় বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে সেগুলোর দু'টি অর্থ জানা যায়। এক, সূরা আন'আমের ১২৫ আয়াতে বলা হয়েছে: **فَمَنْ يَرُدَّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يُشْرِخْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ** “কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দান করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।” আর সূরা যুমারের ২২ আয়াতে বলা হয়েছে:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ -

“তাহলে কি যার বক্ষদেশ আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তারপর যে তার রবের পক্ষ থেকে একটি আলোর দিকে চলেছে.....?”

এই উভয় স্থানে বন্ধদেশ উন্মুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয় মুক্ত হয়ে একথার ওপর নিশ্চিত হয়ে যাওয়া যে, ইসলামের পথই একমাত্র সত্য এবং ইসলাম মানুষকে যে আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যে মূলনীতি এবং যে হেদায়াত ও বিধিবিধান দান করেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল। দুই, সূরা শু'আরার ১২-১৩ আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহ যখন হযরত মূসাকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্বে নিযুক্ত করে ফেরাউন ও তার বিশাল সাম্রাজ্যের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের হুকুম দিচ্ছিলেন তখন হযরত মূসা (আ) আরম্ভ করেন :

رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ وَيَضْيِقُ صَدْرِىْ

“হে আমার রব! আমার ভয় হচ্ছে তারা আমাকে মিথ্যা বলবে এবং আমার বন্ধদেশ সংকীর্ণ হয়ে যাবে।”

আর সূরা ত্বা-হা'র ২৫-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

رَبِّ اَشْرَحْ لِّىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِّىْ اَمْرِىْ

“হে আমার রব! আমার বন্ধদেশ আমার জন্য খুলে দাও এবং আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও।”

এখানে সংকীর্ণতার মানে হচ্ছে, নবুওয়াতের মতো একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার এবং একটি অতি পরাক্রমশালী কুফরী শক্তির সাথে একাকী সংঘর্ষ মুখর হবার হিম্মত মানুষের হয় না। আর বন্ধদেশের প্রশস্ততার মানে হচ্ছে, হিম্মত বৃদ্ধি হওয়া, কোন বৃহত্তর অভিযানে অগ্রসর হওয়া ও কোন কঠিনতর কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ইতস্তত না করা এবং নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন করার হিম্মত সৃষ্টি হওয়া।

একটু চিন্তা করলে এ বিষয়টি অনুভব করা যায় যে, এই আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্ধদেশ উন্মুক্ত করে দেবার এ দু'টি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হয়, নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের মুশরিক, খৃষ্টান, ইহুদী, অগ্নি উপাসক সবার ধর্মকে মিথ্যা মনে করতেন আবার আরবের কোন কোন তাওহীদের দাবীদারের মধ্যে যে ‘হানীফী’ ধর্মের প্রচলন ছিল তার প্রতিও তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। কারণ এটি ছিল একটি অস্পষ্ট আকীদা। এখানে সঠিক পথের কোন বিস্তারিত চেহারা দেখা যেতো না। (তাকহীমুল কুরআন, সূরা আস সাজ্দার ৫ টীকায় আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।) কিন্তু তিনি নিজে যেহেতু সঠিক পথ জানতেন না তাই মারাত্মক ধরনের মানসিক সংশয়ে ভুগছিলেন। নবুওয়াত দান করে আল্লাহ তাঁর এই সংশয় দূর করেন। তাঁর সামনে সঠিক পথ উন্মুক্ত করে মেলে ধরেন। এর ফলে তিনি পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর মানে হয়, নবুওয়াত দান করার সাথে সাথে এই মহান দায়িত্বের বোঝা উঠাবার জন্য যে ধরনের মনোবল, সাহস, সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মানসিক উদারতা ও প্রশস্ততার প্রয়োজন তা আল্লাহ তাঁকে দান করেন। তিনি এমন বিপুল ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন, যা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষের মধ্যে স্থিতি লাভ করতে পারতো না। তিনি এমন বাস্তব বুদ্ধি ও কলাকৌশলের অধিকারী হন, যা বৃহত্তম বিকৃতি দূর ও সংশোধন করার যোগ্যতা

রাখতো। তিনি জাহেলিয়াতের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকা এবং নিরোট মূখ ও অজ্ঞ সমাজে কোন প্রকার সহায় সঞ্চল ও বাহাত কোন পৃষ্ঠপোষকতাহীন শক্তির সহায়তা ছাড়াই ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবার, বিরোধিতা ও শত্রুতার বড় বড় তুফানের মোকাবেলায় ইত্তমত না করার এবং এই পথে যেসব কষ্ট ও বিপদ আপদ আসে সবরের সাথে তা বরদাশ্ত করার যোগ্যতা অর্জন করেন। কোন শক্তিই তাঁকে নিজের অবস্থান থেকে এক বিন্দু সরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখতো না। এই বক্ষদেশ উন্মোচন এবং হৃদয়ের অংগন প্রস্তুত করার অমূল্য সম্পদ যখন তাঁকে দান করা হয়েছে তখন কাজের সূচনা লগ্নে যেসব সমস্যা সংকল্প-বিপদ-কষ্ট দেখা দিয়েছে তাতে তিনি মর্মান্বিত হচ্ছেন কেন?

কোন কোন তাফসীরকার বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে বক্ষ বিদীর্ণ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। মূলত এই মু'জিয়াটির প্রমাণ হাদীস নির্ভর। কুরআন থেকে এর প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আরবী ভাষার দিক দিয়ে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে (شرح صدر) কোনভাবেই বক্ষবিদীর্ণ করার (شق صدر) অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে না। আল্লামা আল্গসী রহুল মা'আনী গ্রন্থে বলেন :

حمل الشرح فى الآية على شق الصدر ضعيف عند المحققين

“গবেষক আলেমগণের মতে এই আয়াতে উন্মুক্ত করাকে বক্ষবিদীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা একটি দুর্বল কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।”

২. কোন কোন মুফাস্সির এর অর্থ এভাবে নিয়েছেন যে, নবুওয়াত পূর্ব জাহেলী যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু ক্রটি করেছিলেন যেগুলোর চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন এবং যেগুলো তাঁর কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হতো। এই আয়াতটি নাযিল করে আল্লাহ তাঁর এই ক্রটি মাক করে দিয়েছেন বলে তাঁকে নিশ্চিত করে দেন। কিন্তু আমার মতে, এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা এক মারাত্মক পর্যায়ের তুল। প্রথমত “বিয়রুন” (وزد) শব্দের অর্থ যে অবশ্যই গোনাহ হতে হবে তা নয়। বরং ভারী বোঝা অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাই অথবা একে খারাপ অর্থে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত পূর্ব জীবনও এত বেশী পাক পরিস্ক্রম ছিল যার ফলে কুরআন মজীদে বিরোধীদের সামনে তাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তাই কাকেরদেরকে সরোধন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে একথা বলানো হয়েছে :

“فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ” এই কুরআন পেশ করার আগে তোমাদের মধ্যে আমি জীবনের একটি বিরাট অংশ অভিবাহিত করেছি।” (ইউনুস ১৬ আয়াত) আবার সবাইকে লুকিয়ে গোপনে গোপনে একটি গোনাহ করবেন এমন ধরনের লোকও তিনি ছিলেন না। (নাদুয়বিলাহ) এমনটি যদি হতো, তাহলে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত থাকতেন না এবং নিজের চরিত্রে গোপন কলংক বহন করে ফিরতেন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে সর্ব সমক্ষে সূরা ইউনুসের পূর্বোন্নিখিত আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা বলাতেন না। কাজেই আসলে এই আয়াতে “বিয়র” শব্দের সঠিক অর্থ হচ্ছে ভারী বোঝা। আর এই ভারী বোঝা বলতে নিজের জাতির মুখতা ও জাহেলী কর্মকাণ্ড দেখে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন যেভাবে দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট, দুচিন্তা ও মর্মবেদনায় তারাক্রান্ত হয়ে

উঠেছিল তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। তিনি দেখছিলেন লোকেরা হাতে বানানো মূর্তির পূজা করছে। চারদিকে শিরক ও শিরক উৎপাদিত কল্পনাবাদ ও কুসংস্কারের ছাড়াছড়ি নির্লজ্জতা, অশ্রীলতা ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজে জুলুম, নিপীড়ন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। শক্তিশালীদের পাজার নীচে শক্তিশীনরা পিবে মরছিল। মেয়েদের জীকন্ত কবর দেয়া হচ্ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শূঁটরাঙ্গ করতো। কোন কোন ক্ষেত্রে শত শত বছর পর্যন্ত চলতো প্রতিশোধমূলক লড়াইয়ের জের। কারো পেছনে শক্তিশালী দলীয় শক্তি ও মজবুত জনবল না থাকলে তার ধন, প্রাণ, ইচ্ছাত, আব্রু সন্ত্রস্তিত থাকতো না। এই অবস্থা দেখে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মান্বিত হতেন। কিন্তু এই গলদ দূর করার কোন পথই তিনি দেখছিলেন না। এই চিন্তাই তাঁর কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। মহান আল্লাহ হেদায়াতের পথ দেখিয়ে এই বিরাট বোঝা তাঁর ওপর থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়্যাতের দায়িত্বে সমাসীন হতেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনাই এমন একটি চাবিকাঠি যা দিয়ে মানব জীবনের সব রকমের বিকৃতির তালা খোলা যেতে পারে এবং জীবনের সকল দিকে সপ্তশোধনের পথ পরিষ্কার করা যেতে পারে। মহান আল্লাহর এই পথনির্দেশনা তাঁর মানসিক দুচ্ছিত্তার সমস্ত বোঝা হালকা করে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে তিনি কেবল আরবের নয় বরং আরবের বাইরে ও সমগ্র দুনিয়ার মানব সমাজ যেসব অন্যায় ও দুচ্ছিত্তিতে লিপ্ত ছিল তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে পারবেন বলে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন।

৩. যে সময় একথা বলা হয়েছিল তখন কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন লোক যে ব্যক্তির সংগী হয়েছেন এবং কেবলমাত্র মক্কা শহরের মধ্যে যার সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, তাঁর আওয়াজ আবার কেমন করে সারা দুনিয়ায় বুলন্দ হবে এবং কোন্ ধরনের খ্যাতিই বা তিনি অর্জন করবেন। কিন্তু এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ সুসংবাদ দিলেন এবং অদ্বুত পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়িতও করলেন। সর্বপ্রথম তাঁর নাম বুলন্দ ও তাঁর চর্চা ব্যাপক করার কাজ সম্পন্ন করলেন তিনি তাঁর শত্রুদের সাহায্যে। মক্কার কাফেররা তার কতি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলো। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ : হজ্জের সময় আরবের সমগ্র এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক মক্কা শহরে জমায়েত হতো। এ সময় কাফেরদের প্রতিনিধি দল হাজীদে প্রত্যেকটি তাঁবুতে যেতো এবং তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে একজন ভয়ংকর লোকের আদির্ভাব হয়েছে। তিনি লোকদের ওপর এমনভাবে যাদু করেন যার ফলে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কাজেই আপনারা তার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলবেন। হজ্জের মওসুম ছাড়া অন্যান্য দিনেও যারা কাবা শরীফ ঘিয়ারত করতে আসতো অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে যারা মক্কা আসতো তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের িশ্লে দুর্নাম রটাতো কিন্তু এর ফলে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত এলাকায়ও তাঁর নাম পৌছে গেলো। মক্কার অপরিচিত গণ্ডীর ভেতর থেকে বের করে এনে শত্রুরাই সারা আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। এরপর লোকদের মনে এই প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই লোকটি কে? কি বলতে চায়? সে কেমন লোক? তার যাদুতে কারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং তাদের ওপর তার যাদুর কি প্রভাব পড়ছে? মক্কার কাফেরদের

প্রচারণা যত বেশী বেড়েছে লোকদের মধ্যে এই জ্ঞানার আগ্রহ তত বেশী বেড়েছে। তারপর অনুসন্ধানের মাধ্যমে লোকেরা তাঁকে জেনেছে। তাঁর চরিত্র ও কাজ-কারবারের সাথে পরিচিত হয়েছে। লোকেরা কুরআন শুনেছে। তিনি যেসব বিষয় পেশ করেছেন সেগুলো জেনেছে। যখন তারা দেখলো, যে জিনিসকে যাদু বলা হচ্ছে, তাতে যারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের জীবন ধারা আরবের সাধারণ লোকদের জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, তখন দুর্নাম সুনামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে লাগলো। এমন কি হিজরতের আগেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যার ফলে দূরের ও কাছে এমন কোন আরব গোত্রই ছিল না যার কোন না কোন লোক বা পুরা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যার কিছু কিছু লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। এটি ছিল তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হবার প্রথম পর্যায়। এরপর হিজরতের পর থেকে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়ে গেলো। এর মধ্যে একদিকে মোনাফেক, ইহুদি ও সমগ্র আরবের মুশরিক প্রধানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নাম রটাতে তৎপর হয়ে উঠলো এবং অন্যদিকে মদীনা তাইয়েবার ইসলামী রাষ্ট্রটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহ ভীতি, তাকওয়া, ইবাদাত, বন্দেগী, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, সুষ্ঠু সামাজিকতা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবিক সাম্য, ধনীদের বদান্যতা, গরীবদেরকে সাহায্য সহায়তা দান, অঙ্গীকার ও শপথ রক্ষা এবং মানুষের সাথে ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততার এমন বাস্তব নমুনা পেশ করছিল, যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছিল। শত্রুরা যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর এই বর্ধিষ্ণু প্রভাব বিনীল করতে চাইলো। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে ইমানদারদের শক্তিশালী জামায়াত তৈরী হয়েছিল। নিয়ম-শৃংখলা, বীরত্ব-সাহসিকতা, মৃত্যুকে ভয় না করা এবং যুদ্ধাবস্থায়ও নৈতিক সীমারেখাকে কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে এই জামায়াত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যার ফলে সমগ্র আরব তার প্রভাবাধীন হয়ে গেলো। দশ বছরের মধ্যে তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হয়ে গেল। অর্থাৎ যে দেশে তাঁর বিরোধীরা তাঁকে বদনাম করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সমগ্র এলাকায় এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে ও সর্বত্র “আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তারপর এই তৃতীয় পর্যায়টি শুরু হলো খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল থেকে। সে সময় তাঁর মুবারক নাম সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হতে লাগলো। এই সিলসিলাটি আজ পর্যন্ত বেড়েই চলছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বেড়ে যেতেই থাকবে। দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মুসলমানদের কোন জনপদ নেই এবং দিনের মধ্যে পাঁচবার আযানের মধ্যে বুলন্দ আওয়াজে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের ঘোষণা করা হচ্ছে না, নামাযে রসূলুল্লাহর (সা) ওপর দরুদ পড়া হচ্ছে না, জুম’আর খুতবায় তাঁর পবিত্র নাম পাঠ করা হচ্ছে না এবং বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন সময় এমন নেই যখন সারা দুনিয়ার কোন না কোন জায়গায় তাঁর মুবারক নাম উচ্চারিত হচ্ছে না। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে যখন আল্লাহ বলেছিলেন (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) (আর তোমার নাম ও খ্যাতির কথা আমি বুলন্দ করে দিয়েছি অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করেছি।) তখন কেউ একথা অনুমানই করতে পারতো না যে, এমন সাড়হরে ও ব্যাপকভাবে এই নাম বুলন্দ করার কাজটি সম্পন্ন হবে। এটি কুরআনের সত্যতার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন : “জিব্রীল আমার কাছে আসেন। আমাকে বলেন, আমার রব ও আপনার রব জিজ্ঞেস করছেন : আমি কিভাবে তোমার নাম বুলন্দ (رَفَعْنَاكَ) করেছি? আমি আরজ করি, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বলেন, আল্লাহর উক্তি হচ্ছে : যখন আমার নাম বলা হয় তখন সেই সাথে তোমার নামও বলা হবে।” (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, মুসনাদে আবু লাইলা, ইবনুল মুনিয়র, ইবনে হিব্বান, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নু’আইম) পরবর্তীকালের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, একথাটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে।

৪. একথাটি দু’বার বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরোপুরি সন্তুনা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। সে সময় তিনি যে কঠিন অবস্থা ও পর্যায় অতিক্রম করেছিলেন তা বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকবে না বরং এরপর শিগগির ভালো অবস্থা গুরু হবে, একথা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। আপাত দৃষ্টিতে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা এবং দারিদ্র্যের সাথে সচ্ছলতা এ দু’টি পরস্পর বিরোধী জিনিস একই সময় একসাথে জমা হতে পারে না। কিন্তু তবুও সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা না বলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা এই অর্থে বলা হয়েছে যে, প্রশস্ততার যুগ এত বেশী নিকটবর্তী যেন মনে হয় সে তার সাথেই চলে আসছে।

৫. অবসর পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, নিজের কাজকাম থেকে অবসর পাওয়া, তা ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও ইসলাম প্রচারের কাজ হতে পারে বা ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে শিক্ষা ও তরবিয়ত দানের কাজও হতে পারে অথবা নিজের ঘরের ও বাইরের বৈষয়িক কাজও হতে পারে। এই নির্দেশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আর কোন কাজ থাকবে না তখন নিজের অবসর সময়টুকু ইবাদাতের পরিপ্রথম ও সাধনায় ব্যয় করো এবং সবদিক থেকে দৃষ্টি ও মনোযোগ ফিরিয়ে এনে একমাত্র নিজের রবের প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও।

আত তীন

৯৫

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আততীন (الَّتَيْن) -কে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাখিলের সময়-কাল

কাতাদাহ এটিকে মাদানী সূরা বলেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। একটি বক্তব্যে একে মকী এবং অন্যটিতে মাদানী বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে মকী গণ্য করেছেন। এর মকী হবার সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, এই সূরায় মক্কা শহরের জন্য **فَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ** (এই নিরাপদ শহরটি) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যদি মদীনায় এটি নাখিল হতো তাহলে মক্কার জন্য "এই শহরটি" বলা ঠিক হতো না। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে এটিকে মক্কা মু'আযযামারও প্রথম দিকের সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। কারণ এর নাখিলের সময় কুরর ও ইসলামের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল এমন কোন চিহ্নও এতে পাওয়া যায় না। বরং এর মধ্যে মকী যুগের প্রথম দিকের সূরাগুলোর মতো একই বর্ণনাজন্যী পাওয়া যায়। এই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তির স্বীকৃতি। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহান মর্যাদাশালী নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানসমূহের কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তব বিষয়টি কুরআন মকীদে অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কোথাও বলা হয়েছে : মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তার সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন। (আল বাকারাহ ৩০-৩৪, আল আরাফ ১১, আল আন'আম ১৬৫, আল হিজর ২৪-২৯, আন নামুল ৬২, সাদ ৭১-৭৩ আয়াত) কোথাও বলা হয়েছে : মানুষ আল্লাহর এমন একটি আমানতের বাহক হয়েছে যা বহন করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ ও পাহাড় কারো ছিল না। (আল আহযার ৭২ আয়াত) আবার কোথাও বলা হয়েছে : আমি বনী আদমকে মর্যাদাশালী করেছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাকে প্রেচ্ছ দান করেছি। (বনী ইসরাঈল ৭০ আয়াত) কিন্তু এখানে বিশেষ করে নবীগণের আত্মপ্রকাশের

স্থানগুলোর কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, মানুষকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে তার মধ্যে নবুওয়্যাতের মত সর্বাধিক উন্নত পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক জন্ম নিয়েছে। আর এই নবুওয়্যাতের চাইতে উচ্চ পদমর্যাদা আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টি লাভ করেনি।

এরপর বলা হয়েছে, দুনিয়ায় দুই ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ এই সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার পর দুষ্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে বেং নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে ভলিয়ে যেতে যেতে একেবারে সর্বনিম্ন গভীরতায় পৌঁছে যায়। সেখানে তাদের চাইতে নীচে আর পৌঁছতে পারে না। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ ইমান ও সংকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতন থেকে রক্ষা পায়। তাদেরকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার অপরিহার্য দাবী যে উন্নত স্থান সে স্থানেই তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব জাতির মধ্যে এই দুই ধরনের লোকের অস্তিত্ব এমন একটি বাস্তব সত্য যাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কারণ মানুষের সমাজে সব জায়গায় সবসময় এটি দেখা যাচ্ছে।

সবশেষে এই বাস্তব সত্যটির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে যখন এই দু'টি আলাদা আলাদা এবং পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ পাওয়া যায় তখন কাজের প্রতিদানের ব্যাপারটি কেমন করে অস্বীকার করা যেতে পারে? যারা অধঃপতনের গভীর গর্তে নেমে গেছে এবং যারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গেছে তাদেরকে যদি কোন প্রতিদান না দেয়া হয় এবং উভয় দলের পরিণতি একই হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর রাজত্বে কোন ইনসাফ নেই। অথচ শাসককে ইনসাফ অবশ্যি করতে হবে, এটা মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং মানবিক প্রকৃতির দাবী। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ যিনি সকল শাসকের বড় শাসক তিনি ইনসাফ করবেন না, একথা কেমন করে কল্পনা করা যেতে পারে।

আয়াত ৮

সূরা আত তীন-মকী

রুকু' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْتِّمِ الْزَيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِاللَّيْنِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِيمِينَ ۝

তীন ও যায়তুন,^১ সিনাই পর্বত^২ এবং এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা) কসম। আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়।^৩ তারপর তাকে উল্টো ফিরিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌছিয়ে দিয়েছি^৪ তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সংকাজ করতে থাকে। কেননা তাদের রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোনদিন শেষ হবে না।^৫ কাজেই (হে নবী!) এরপর পুরস্কার ও শান্তির ব্যাপারে কে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে?^৬ আল্লাহ কি সব শাসকের চাইতে বড় শাসক নন?^৭

১. এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে অনেক বেশী মতবিরোধ দেখা যায়। হাসান বসরী, ইকরামাহ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, জাবের ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখ্বী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, তীন বা ইন্জীর (গোল হলুকা কালচে বর্ণের এক রকম মিষ্টি ফল) বলতে এই সাধারণ তীনকে বুঝানো হয়েছে, যা লোকেরা খায়। আর যায়তুন বলতেও এই যায়তুনই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে তেল বের করা হয়। ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম এরি সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। যেসব তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন তারা তীন ও যায়তুনের বিশেষ গুণাবলী ও উপকারিতা বর্ণনা করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এসব গুণের কারণে মহান আল্লাহ এই দু'টি ফলের কসম খেয়েছেন। সন্দেহ নেই, একজন সাধারণ আরবী জানা ব্যক্তি তীন ও যায়তুন শব্দ শুনে সাধারণভাবে আরবীতে এর পরিচিত অর্থটাই গ্রহণ করবেন। কিন্তু দু'টি কারণে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। এক, সামনে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। আর দু'টি ফলের সাথে দু'টি শহরের কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন মিল নেই। দুই, এই চারটি জিনিসের কসম খেয়ে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের আলোচনা তার সাথে খাপ খায় কিন্তু এই ফল দু'টির

আলোচনা তার সাথে মোটেই খাপ খায় না। মহান আল্লাহ কুরআন মকীনে যেখানেই কোন জিনিসের কসম খেয়েছেন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা গুণের জন্য খাননি। বরং কসম খাবার পর যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেই বিষয়ের জন্যই কসম খেয়েছেন। কাজেই এই ফল দু'টির বিশেষ গুণাবলীকে কসমের কারণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায় না।

অন্য কোন কোন তাফসীরকার তীন ও যায়তুন বলতে কোন কোন স্থান বুঝিয়েছেন! কা'ব আহবার, কাতাদাহ ও ইবনে যয়েদ বলেন, তীন বলতে দামেশক এবং যায়তুন বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তি ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, তীন বলতে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম জুদী পাহাড়ে যে মসজিদ বানিয়েছিলেন তাকে বুঝানো হয়েছে। আর যায়তুন বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ আরবের মনে "ওয়াত তীন ওয়ায যায়তুনে" (وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ) শব্দগুলো শুনামাত্রই এই অর্থ উকি দিতে পারতো না এবং তীন ও যায়তুন যে এই দু'টি স্থানের নাম কুরআনের প্রথম শ্রোতা আরববাসীদের কাছে তা মোটেই সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত ছিল না।

তবে যে এলাকায় যে ফলটি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হতো অনেক সময় সেই ফলের নামে সেই এলাকার নামকরণ করার রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রচলন অনুসারে তীন ও যায়তুন শব্দের অর্থ এই ফল দু'টি উৎপাদনের সমগ্র এলাকা হতে পারে। আর এটি হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকা। কারণ সে যুগের আরবে তীন ও যায়তুন উৎপাদনের জন্য এ দু'টি এলাকাই পরিচিত ছিল। ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, যামাখ্শারী ও আলুসী রাহেমাহুমুলাহ এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইবনে জরীর প্রথম বক্তব্যটিকে অধাধিকার দিলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, তীন ও যায়তুন মানে এই ফল দু'টি উৎপাদনের এলাকাও হতে পারে। হাফেজ ইবনে কাসীরও এই ব্যাখ্যাটি প্রাধান্যযোগ্য মনে করেছেন।

২. আসলে বলা হয়েছে জুরে সীনা। (طُورِ سَيْنِينَ) হচ্ছে সিনাই উপদ্বীপের দ্বিতীয় নাম। একে সাইনা বা সীনাই এবং সীনাও বলা হয়। কুরআনে এক জায়গায় "জুরে সাইনা" (طُورِ سَيْنَاءَ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে যে এলাকায় জুর পর্বত অবস্থিত তা সীনাই নামেই খ্যাত। তাই আমি অনুবাদে সীনাই শব্দ ব্যবহার করেছি।

৩. একথাটির ওপরই তীন ও যায়তুনের এলাকা অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এবং জুর পর্বত ও মক্কার নিরাপদ শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে, একথা মানে হচ্ছে এই যে, তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের দৈহিক সৌষ্ঠব দান করা হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের চিন্তা, উপলব্ধি জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। তারপর যেহেতু নবীগণই হচ্ছেন মানব জাতির প্রতি এই অনুগ্রহ ও পূর্ণতাগুণের সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ের নমুনা এবং মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে নবুওয়াত দান করার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছেন তার জন্য এর চাইতে বড় মর্যাদা আর কিছুই হতে পারে না, তাই মানুষের সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর নবীদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের কসম খাওয়া হয়েছে। সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত অসংখ্য নবীর

আবির্ভাব ঘটে। ভূর পর্বতে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করেন। আর মক্কা মু'আযযমার ভিত্তি স্থাপিত হয় হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাইলের (আ) হাতে। তাঁদেরই বদৌলতে এটি আরবের সবচেয়ে পবিত্র কেন্দ্রীয় নগরে পরিণত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) এ দোয়া করেছিলেন : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا "হে আমার রব! একে একটি নিরাপদ শহরে পরিণত করো।" (আল বাকারাহ ১২৬) আর এই দোয়ার বরকতে আরব উপদ্বীপের সর্বত্র বিশৃংখলার মধ্যে একমাত্র এই শহরটিই আড়াই হাজার বছর থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কাজেই এখানে বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে : আমি মানব জাতিকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি যে, তার মধ্যে নবুওয়াতের ন্যায় মহান মর্যাদার অধিকারী মানুষের জন্ম হয়েছে।

৪. মুফাসসিরগণ সাধারণত এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, আমি তাকে বার্ষিকের এমন এক অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি যেখানে সে কিছু চিন্তা করার, বুঝার ও কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। দুই, আমি তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বক্তব্যের যে উদ্দেশ্যটি প্রমাণ করার জন্য এই সূরাটি নাখিন করা হয়েছে এই দু'টি অর্থকে তার জন্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে না। সূরাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আখেরাতে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা যে যথার্থ সত্য তা প্রমাণ করা। এদিক দিয়ে মানুষদের মধ্যে থেকে অনেককে চরম দুর্বলতম অবস্থায় পৌছিয়ে দেয়া হয় এবং মানুষদের একটি দলকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে—এ দু'টি কথার একটিও এই অর্থের সাথে খাপ খায় না। প্রথম কথাটি শাস্তি ও পুরস্কারের প্রমাণ হতে পারে না। কারণ ভালো ও খারাপ উভয় ধরনের লোক বার্ষিকের শিকার হয়। কাউকে তার কাজের শাস্তি ভোগ করার জন্য এই অবস্থার শিকার হতে হয় না। অন্যদিকে দ্বিতীয় কথাটি আখেরাতে কার্যকর হবে একে কেমন করে এমন সব লোকের কাছে হিসেবে পেশ করা যেতে পারে যাদের থেকে আখেরাতে শাস্তি ও পুরস্কার লাভের ব্যবস্থার পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য এই সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে? তাই আমার মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার পর যখন মানুষ নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুষ্কৃতির পথে ব্যবহার করে তখন আল্লাহ তাকে দুষ্কৃতিরই সুযোগ দান করেন এবং নিচের দিকে গড়িয়ে দিতে দিতে তাকে এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌছিয়ে দেন যে, অন্য কোন সৃষ্টি সেই পর্যায়ে নেমে যেতে পারে না। এটি একটি বাস্তব সত্য। মানুষের সমাজে সচরাচর এমনটি দেখা যায়। লোভ, লালসা, স্বার্থবাদিতা, কামান্ধতা, নেশাখোরী, নীচতা, ক্রোধ এবং এই ধরনের অন্যান্য বদ স্বভাব যেসব লোককে পেয়ে বসে তারা সত্যিই নৈতিক দিক দিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌছে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধু মাত্র একটি কথাই ধরা যাক। একটি জাতি যখন অন্য জাতির প্রতি শত্রুতা গোষণ করার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায় তখন সে- হিংস্রতায় দুনিয়ার হিংস্র পশুদেরকেও হার মানায়। একটি হিংস্র পশু কেবলমাত্র নিজের ক্ষুধার খাদ্য যোগাড় করার জন্য অন্য পশু শিকার করে। যে ব্যাপকভাবে পশুদের হত্যা করে চলে না। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে চলেছে। পশুরা কেবলমাত্র নিজেদের নখর ও দাঁত ব্যবহার করে শিকার করে। কিন্তু এই সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষ নিজের বুদ্ধির সাহায্যে বন্দুক, কামান, ট্যাংক, বিমান, আগবিক বোমা, উদজান বোমা এবং অন্যান্য অসংখ্য মারণাস্ত্র তৈরী করেছে এবং সেগুলোর

সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সুবিশাল জনপদগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। পশুরা কেবল আহত বা হত্যা করে। কিন্তু মানুষ নিজদেরই মতো মানুষকে নির্ধাতন করার জন্য এমন সব ভয়াবহ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যেগুলোর কথা পশুরা কোন দিন কল্পনাও করতে পারে না। তারপর নিজেদের শত্রুতা ও প্রতিশোধ পূহা চরিতার্থ করার জন্য তারা নীচতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারা মেয়েদের উলংগ করে তাদের মিছিল বের করে। এক একজন মেয়ের ওপর দশ বিশ জন ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাপ, ভাই ও স্বামীদের সামনে তাদের স্ত্রী ও মা-বোনদের শ্রীলতাহানি করে। মা-বাপের সামনে সন্তানদেরকে হত্যা করে। নিজের গর্ভজাত সন্তানদের রক্ত পান করার জন্য মাকে বাধ্য করে। মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে এবং জীবন্ত কবর দেয়। দুনিয়ায় পশুদের মধ্যেও এমন কোন হিস্তম গোষ্ঠী নেই যাদের বর্বরতাকে কোন পর্যায়ে মানুষদের এই বর্বরতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের অন্যান্য বড় বড় গুণের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যায়। এগুলোর মধ্য থেকে যেটির দিকে মানুষ মুখ ফিরিয়েছে সেটির ব্যাপারেই নিজেদের নিকৃষ্টতম সৃষ্টি প্রমাণ করেছে। এমনকি ধর্ম যা মানুষের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, তাকেও সে এমন সংকীর্ণ করে দিয়েছে, যার ফলে সে গাছপালা, জীব-জন্তু ও পাখির পূজা করতে করতে অবনতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে নারী ও পুরুষের লিংগেরও পূজা করতে শুরু করেছে। দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্ম মন্দিরে দেবদাসী রাখছে। তাদের সাথে ব্যভিচার করাকে পুণ্যের কাজ মনে করছে। যাদেরকে তারা দেবতা ও উপাস্য গণ্য করেছে তাদের সাথে সম্পর্কিত দেবকাহিনীতে এমন সব কুৎসিত কাহিনী জুড়ে দিয়েছে যা জঘন্য ও নিকৃষ্টতম মানুষের জন্যও লজ্জার ব্যাপার।

৫. যেসব মুফাস্সির “আসফালা সা-ফেলীন” (أَسْفَلَ سَافِلِينَ) -এর অর্থ করেছেন, বার্ষিকের এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ নিজের চেতনা ও স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তারা এই আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন, “কিন্তু যারা নিজেদের যৌবনকালে ও সুস্থাবস্থায় ঈমান এনে সংকাজ করে তাদের জন্য বার্ষিকের এই অবস্থায়ও সেই একই নেকী লেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী তারা প্রতিদানও পাবে। বয়সের এই পর্যায়েও তারা ঐ ধরনের সংকাজগুলো করেনি বলে তাদের ভালো প্রতিদান দেবার ক্ষেত্রে কিছুই কম করা হবে না।” আর যেসব মুফাস্সির “আসফালা সাফেলীনের” দিকে উল্টো ফিরিয়ে দেবার অর্থ “জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা” করেছেন তাদের মতে এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে : “ঈমান এনে যারা সংকাজ করে তারা এর বাইরে তাদেরকে এই পর্যায়ে উল্টো ফেরানো হবে না। বরং তারা এমন পুরস্কার পাবে যার ধারাবাহিকতা কোনদিন থতম হবে না।” কিন্তু এই সূরায় শান্তি ও পুরস্কারের সভ্যতার পক্ষে যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার সাথে এই উভয় অর্থের কোন মিল নেই। আমার মতে এই আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, মানুষের সমাজে যেমন সাধারণভাবে দেখা যায়, যেসব লোকের নৈতিক অধঃপতন শুরু হয় তারা অধঃপাতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদের নীচে চলে যায়, ঠিক তেমনি প্রতি যুগে সাধারণভাবে দেখা যায়, যারা আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সংকাজের কাঠামোয় নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে নেয় তারা এই পতনের হাত থেকে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ মানুষকে যে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছিলেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই তারা অশেষ শুভ প্রতিদানের অধিকারী। অর্থাৎ তারা এমন পুরস্কার পাবে, যা তাদের যথার্থ পাওনা থেকে কম হবে না এবং যার ধারাবাহিকতা কোনদিন শেষও হবে না।

৬. এই আয়াতটির আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে : “কাজেই (হে মানুষ) এরপর কোন্ জিনিসটি তোমাকে শান্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে?” উভয় অর্থের ক্ষেত্রে লক্ষ ও মূল বক্তব্য একই থাকে। অর্থাৎ মানুষের সমাজে প্রকাশ্যে দেখা যায় সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষদের একটি দল নৈতিক অধপাতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছে যায় আবার অন্য একটি দল সংকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে এবং মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য ছিল তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ অবস্থায় পুরস্কার ও শান্তিকে কেমন করে মিথ্যা বলা যেতে পারে? বুদ্ধি কি একথা বলে, উভয় ধরনের মানুষের একই পরিণাম হবে? ইনসাফ কি একথাই বলে, অধপাতে যেতে যেতে নীচতমদেরও নীচে যারা পৌঁছে যায় তাদেরকে কোন শান্তিও দেয়া যাবে না এবং এই অধপতন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে যারা পবিত্র জীবন যাপন করে তাদেরকে কোন পুরস্কারও দেয়া যাবে না? এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যান্য স্থানে এভাবে বলা হয়েছে :

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

“আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়ে গেছে? তোমরা কেমন ফায়সালা করছো? (আল কলম ৩৫-৩৬ আয়াত)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَّخْيَافُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“দুহৃতকারীরা কি একথা মনে করেছে, আমি তাদেরকে এমন লোকদের মতো করে দেবো যারা ইমান এনেছে এবং সংকাজ করেছে? উভয়ের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত যা এরা করছে।” (আল জাসিয়া ২১ আয়াত)

৭. অর্থাৎ যখন দুনিয়ার ছোট ছোট শাসকদের থেকেও তোমরা চাও এবং আশা করে থাকো যে, তারা ইনসাফ করবে, অপরাধীদেরকে শান্তি দেবে এবং ভালো কাজ যারা করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে তখন আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা কি মনে করো? তিনি কি সব শাসকের বড় শাসক নন? যদি তোমরা তাঁকে সবচেয়ে বড় শাসক বলে স্বীকার করে থাকো তাহলে কি তাঁর সম্পর্কে তোমরা ধারণা করো যে, তিনি ইনসাফ করবেন না? তাঁর সম্পর্কে কি তোমরা এই ধারণা পোষণ করো যে, তিনি মন্দ ও ভালোকে একই পর্যায়ে ফেলবেন? তোমরা কি মনে করো তাঁর দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে খারাপ কাজ করবে আর যারা সবচেয়ে ভালো কাজ করবে তারা সবাই মত্রে মাটির সাথে মিশে যাবে। কাউকে তার খারাপ কাজের শান্তি দেয়া হবে না এবং কাউকে তার ভালো কাজের পুরস্কারও দেয়া হবে না?

ইমাম আহমাদ, তিরমিখী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনির, বায়হাকী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া ইয়রত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “তোমাদের কেউ যখন ‘ওয়াত তীনে ওয়াম্বায়তুনে’ সূরা পড়তে পড়তে **اللَّهُ بِأَكْمَرِ الْحَكَمِينَ** আয়াতটিতে পৌঁছে তখন যেন সে বলে! **بلى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِكِينَ** (হী, এবং আমি তার ওপর সাক্ষদানকারীদের একজন)। আবার কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই আয়াতটি পড়তেন, তিনি বলতেন, **سُبْحَانَكَ بَلَى** (হে আল্লাহ তুমি পবিত্র। আর তুমি এই যা বলছো তা সত্য।

আল'আলাক

৯৬

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আলাক (عَلَقَ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি اقْرَأ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম আয়াতে مَا لَمْ يَلْمِ এ গিয়ে শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ اِنْطَبَى থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদিসগণ অনব্দো সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য। এ হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ওহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইবনে আব্বাস (রা), আবু মুসা আশ'আরী (রা) ও সাহাবীগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এই আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হারম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

অহীর সূচনা

মুহাদিসগণ অহীর সূচনাগর্বের ঘটনা নিজের নিজের সনদের মাধ্যমে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী এ ঘটনা হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে এবং তিনি নিজের খাদা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর সূচনা হয় সভ্য স্বপ্নের (কোন কোন বর্ণনা অনুসারে ভালো স্বপ্নের) মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, মনে হতো যেন দিনের আলোয় তিনি তা দেখছেন। এরপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন হেরা শুভায় অবস্থান করে দিনরাত ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে থাকেন। হযরত আয়েশা (রা) তাহানুস (تَحَنُّن) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহরী তা'আবুদ (تَعَبُد) বা ইবাদাত-বন্দেগী শব্দের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি কোন

ধরনের ইবাদাত করতেন? কারণ তখনো পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাতের পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়নি। ঘর থেকে খাবার-দাবার নিয়ে তিনি কয়েকদিন সেখানে কাটাতেন। তারপর হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে আসতেন। তিনি আবার কয়েক দিনের খাবারসামগ্রী তাঁকে যোগাড় করে দিতেন। একদিন তিনি হেরা গুহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ওপর ওহী নাযিল হলো। ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন : “পড়ো” এরপর হযরত আয়েশা (রা) নিজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : আমি বললাম, “আমি তো পড়তে জানি না।” একথা ফেরেশতা আমাকে ধরে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি আমি তা সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেললাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ো!” আমি বললাম, “আমি তো, পড়তে জানি না।” তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ধরে ভয়ানক চাপ দিলেন। আমার সহ্য করার শক্তি প্রায় শেষ হতে লাগলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ো!” আমি আবার বললাম, “আমি তো পড়া জানি না।” তিনি তৃতীয়বার আমাকে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন আমার সহ্য করার শক্তি খতম হবার উপক্রম হলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (পড়ো নিজের রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এখান থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানতো না) পর্যন্ত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীপতে কীপতে সেখান থেকে ফিরলেন। তিনি হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে এসে বললেন : “আমার গায়ে কিছু (চাদর-কবলা) জড়িয়ে দাও। আমার গায়ে কিছু (চাদর-কবলা) জড়িয়ে দাও!” তখন তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেয়া হলো। তাঁর মধ্য থেকে জীভির ভাব দূর হয়ে গেলে তিনি বললেন : “হে খাদীজা! আমার কি হয়ে গেলো? তারপর তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার নিজের জ্ঞানের ভয় হচ্ছে।” হযরত খাদীজা বললেন : “মোটাই না। বরং খুশী হয়ে যান। আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সত্য কথা বলেন। (একটি বর্ণনায় বাড়তি বলা হয়েছে, আপনি আমানত পরিশোধ করে দেন,) অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন। নিজে অর্থ উপার্জন করে অভাবীদেরকে দেন। মেহমানদারী করেন। ভালো কাজে সাহায্য করেন।” তারপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। জাহেলী যুগে তিনি ইসরাঈলী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আরবী ও ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। অত্যন্ত বুদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, ভাইজান! আপনার ভাতিজার ঘটনাটা একটু শুনুন। ওয়ারাকা রসূলুল্লাহকে (সা) বললেন : “ভাতিজা! তুমি কি দেখেছো?” রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা বললেন : “ইনি সেই নায়ুস (ঐহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসার (আ) ওপর নাযিল করেছিলেন। হায়, যদি আমি আপনার নবুওয়াতের জামানায় শক্তিশালী যুবক হতাম! হায়, যদি আমি তখন জীবিত থাকি যখন আপনার কণ্ঠ আপনাকে বের করে দেবে।” রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “এরা কি আমাকে বের করে দেবে?” ওয়ারাকা বললেন : “হী, কখনো এমনটি হয়নি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি আমি আপনার

সেই আমলে বেঁচে থাকি তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবো।” কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই গুয়ারাকা ইন্তিকাল করেন।

এ ঘটনা নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, ফেরেশতার আসার এক মুহূর্ত আগেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবী বানিয়ে পাঠানো হবে এ সম্পর্কে তিনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁর এই জিনিসের প্রত্যাশী বা আকাঙ্ক্ষী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাথে যে এই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা তিনি আদৌ কখনো কল্পনা করতে পারেননি। অহী নাখিল হওয়া এবং ফেরেশতার এভাবে সামনে এসে যাওয়া তাঁর জন্যে ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর ঠিক তাই হয়েছে যা একজন বেখবর ব্যক্তির সাথে এত বড় একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। এ কারণেই যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে আসেন তখন মক্কার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সব রকমের আপত্তি উঠায় কিন্তু তাদের একজনও একথা বলেনি, আমরা তো আগেই আপনাকে কয়েকটিমাত্র আপনি কোন একটা কিছু হওয়ার দাবী করবেন, কারণ আপনি বেশ কিছুকাল থেকে নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এ ঘটনা থেকে নবুওয়াতের আগে তাঁর জীবন কেমন পবিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র ও কর্মকাণ্ড কত উন্নত পর্যায়ের ছিল সে কথাও জানা যায়। হযরত খাদীজা (রা) কোন অন্ন বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। বরং এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। পনের বছর ধরে তিনি রসূলের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকতে পারে না। এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে এমনিই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে পেয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁকে ছেঁরা গৃহার ঘটনা শুনান তখনই নির্দিষ্টায় তিনি স্বীকার করে নেন যে, যথার্থই আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে গুয়ারাকা ইবনে নওফলও মক্কার একজন বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) জীবন দেখে আসছিলেন, তাছাড়া পনের বছরের নিকট আত্মীয়তার কারণে তাঁর অবস্থা তিনি আরো পতীরত্নে অবগত ছিলেন। তিনিও এ ঘটনা শুনে একে কোন প্ররোচনা মনে করেননি। বরং শুনার সাথে সাথেই বলে দেন, ইনি সেই একই “নামূস” যিনি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, তাঁর মতেও মুহাম্মাদ (সা) এমনই উন্নত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা কোন বিশ্বয়কর ব্যাপার ছিল না।

দ্বিতীয় অংশ মাখিলের প্রেক্ষাপট

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা’বা শরীফে ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়তে শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, ঠিক সে সময় এই সূরার দ্বিতীয় অংশটি নাখিল হয়। দেখা যায়, নবী হবার পর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পেখানো পদ্ধতিতে হারাম শরীফে নামায পড়তে শুরু করেন এবং এ কাজটির কারণে কুরাইশরা প্রথমবার অনুভব করে যে, তিনি কোন নতুন দীনের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা অবাক চোখে এ দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু আবু

জেহেলের জাহেলী শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সে এভাবে হারম শরীফে ইবাদাত করা যাবে না বলে তাঁকে ধমকাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে কয়েকটি হাদীসে আবু জেহেলের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্ভুতি উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন : আবু জেহেল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করে, “মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদের সামনে যমীনের ওপর মুখ রাখছে? লোকেরা জবাব দেয়, “হী”। একথা শুনে সে বলে, “লাত ও উয্যার কসম, যদি আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড়ের পা রেখে দেবো এবং মাটিতে তার মুখ রগড়ে দেবো।” তারপর একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সে তাঁর ঘাড়ের ওপর পা রাখার জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ লোকেরা দেখে সে পিছনের দিকে সরে আসছে এবং কোন জিনিস থেকে নিজের মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, আমার ও তার মাঝখানে আগুনের একটি পরিখা, একটি ভয়াবহ জিনিস ও কিছু ডানা ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে যদি আমার ধারেকাছে যেঁসতো তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। (আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাদ্‌ম ইসফাহানী ও রায়হানী)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : আবু জেহেল বলে, যদি আমি মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঁবার কাছে নামায পড়তে দেখি তাহলে পায়ের নীচে তার ঘাড় চেপে ধরবো। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, যদি সে এমনটি করে তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে তাকে এনে ধরবে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, আব্দ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনির ও ইবনে মারদুইয়া)

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন, আবু জেহেল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এ থেকে নিবেদন করিনি? একথা বলে সে তাঁকে ধমকাতে শুরু করলো। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কঠোরভাবে ধমক দিলেন। তাঁর ধমকানি শুনে সে বললো, হে মুহাম্মাদ! কিসের জোরে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে? আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনির, তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া)

এই ঘটনাবলীর কারণে **كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ** থেকে সুরার যে অংশটি শুরু হচ্ছে সেটি নাযিল হয়। কুরআনের এই সূরাটিতে এই অংশটিকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে ষাভাবিকভাবে এর মর্যাদা তাই হওয়া উচিত। কারণ প্রথম অমী নাযিল হবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম প্রকাশ করেন নামাযের মাধ্যমে এবং এই ঘটনার ভিত্তিতেই কাফেরদের সাথে তাঁর প্রথম সংঘাত হয়।

আয়াত ১৯

সূরা আল আলাক-মকী

রুকু' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

পড়ো^১ (হে নবী), তোমার রবের নামে।^২ যিনি সৃষ্টি করেছেন।^৩ জন্মাট বীধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।^৪ পড়ো, এবং তোমার রব বড় মেহেরবান, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।^৫ মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।^৬

১. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলে এসেছি, ফেরেশতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, পড়ো। তিনি জবাব দিলেন, আমি পড়া জানি না। এ থেকে জানা যায়, ফেরেশতা অহীরা এই শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন এবং তাঁকে সেগুলো পড়তে বলেছিলেন। কারণ ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো, আমি বলতে থাকি এবং আগনি পড়তে থাকুন তাহলে আমি পড়া জানি না একথা বলার তাঁর প্রয়োজন হতো না।

২. অর্থাৎ তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো। অন্য কথায়, বিসমিল্লাহ বলো এবং পড়ো। এ থেকে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অহী আসার আগে একমাত্র আল্লাহকেই নিজের রব হিসেবে জানতেন ও মানতেন। এ জন্যই তাঁর রবকে, একথা বলার প্রয়োজন হয়নি বরং বলতে হয়েছে, তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো।

৩. শুধু বলা হয়েছে, “সৃষ্টি করেছেন।” কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি সৃষ্টা, যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহান এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

৪. সাধারণভাবে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। আলাক (عَلَق) হচ্ছে আলাকাহ (عَلَقٌ) শব্দের বহুবচন। এর মানে জন্মাট বীধা রক্ত। গর্ভ সঞ্চারণের পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে সেই প্রাথমিক অবস্থা। তারপর তা গোশূতের আকৃতি ধারণ

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ ۝ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْنَىٰ ۖ ۝ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ
الرُّجْعَىٰ ۖ ۝ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۖ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۖ ۝

কখনই নয়,^৭ মানুষ সীমান্বয়ন করে। কারণ সে নিজেকে দেখে অভাবমুক্ত।^৮
(অথচ) নিশ্চিতভাবেই তোমার রবের দিকেই ফিরে আসতে হবে।^৯ তুমি কি
দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে এক বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে নামায পড়ে।^{১০}

করে। এরপর পর্যায়ক্রমে মানুষের আকৃতি লাভের কার্যক্রম শুরু হয়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার
জন্য দেখুন তাকহীমুল কুরআন, সূরা আল হুজ্ব ৫ আয়াত, ৫ থেকে ৭ টীকা)

৫. অর্থাৎ তাঁর অশেষ মেহেরবানী। এই হীনতম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি
মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন এটি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে স্বীকৃত। আর
তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি, কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার
কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার, উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক
প্রতিষ্ঠা ও সত্ত্বাক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইলহামী চেতনার সাহায্যে
মানুষকে কলম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত
যোগ্যতা স্তব্ধ ও পংশ হয়ে যেতো। তার বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং
বংশানুক্রমিক অগ্রগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে নৌছে যাবার এবং
সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করার সুযোগই তিরোহিত হতো।

৬. অর্থাৎ মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আগ্রাহর কাছ থেকেই সে যা কিছু
জ্ঞান লাভ করেছে। আগ্রাহ যে পর্যায়ে মানুষের জন্য জ্ঞানের দরজা যতটুকু খুলতে
চেয়েছেন ততটুকুই তার জন্য খুলে গিয়েছে। আয়াতুল কুরসীতে একথাটিই এভাবে বলা
হয়েছে : وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ আর লোকেরা তাঁর জ্ঞান
থেকে তিনি যতটুকু চান তার বেশী কিছুই আয়ত্ত্ব করতে পারে না। (আল বাকারাহ
২৫৫) যেসব জিনিসকে মানুষ নিজের তাত্ত্বিক আবিষ্কার বলে মনে করে সেগুলো আসলে
প্রথমে তার জ্ঞানের আওতায় ছিল না। আগ্রাহ যখন চেয়েছেন তখনই তার জ্ঞান তাকে
দিয়েছেন। মানুষ কোনক্রমেই অনুভব করতে পারেনি যে, আগ্রাহ তাকে এ জ্ঞান দান
করছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল
হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হয়রত আরেশার (রা) হাদীস
থেকে জানা যায় : এই প্রথম অভিজ্ঞতাটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশী বরদাপ্ত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল
এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জ্ঞানের ও মানের
তিনি সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অহীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে
এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল
মুদ্দাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে নবুওয়াত

লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল মুদাসসিরের ভূমিকা)।

৭. অর্থাৎ যে মেহেরবান আল্লাহ এত বড় মেহেরবানী করেছেন তাঁর মোকাবেলায় মূখতার বশবর্তী হয়ে কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং সীমানাঘন করতে শুরু করেছে।

৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় সে যাই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার ভিত্তিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করে ফিরুক না কেন, অবশেষে তাকে তোমার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন এই মনোভাব ও কর্মনীতির পরিণাম সে জানতে পারবে।

১০. বান্দা বলতে এখানকার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا -

“পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার দিকে।” (বনি ইসরাঈল ১)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

“সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব।”

(আল কাহফ ১)

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا -

“আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।” (আল জিন ১৯)

এ থেকে জানা যায়, এটা ভালোবাসার একটা বিশেষ ধরনের প্রকাশভঙ্গী। এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ নবুওয়াতের দায়িত্ব নিযুক্ত করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনের কোথাও এই পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। কোথাও বলা হয়নি, হে নবী! তুমি এভাবে নামায পড়ো। কাজেই কুরআনে যে অহী লিখিত হয়েছে কেবলমাত্র এই অহীটুকুই যে রসূলের (সা) ওপর নাযিল হতো না— এটি তার আর একটি প্রমাণ। বরং এরপরও অহীর মাধ্যমে আরো এমন সব বিষয়ের তালিম দেয়া হতো যা কুরআনে লিখিত হয়নি।

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَىٰ ۖ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۖ أَرَأَيْتَ إِنْ
 كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۖ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ
 لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۖ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۖ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۖ سَنَدْعُ
 الزَّانِيَةَ ۖ كَلَّا لَا تَطِيعُہُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۖ

তুমি কি মনে করো, যদি (সেই বান্দা) সঠিক পথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? তুমি কি মনে করো, যদি (এই নিষেধকারী সত্যের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন? ১১ কখনই নয়, ১২ যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের দিকের চুল ধরে তাকে টানবো, সেই কপালের চুল (ওয়ালা) যে মিথ্যুক ও কঠিন অপরাধকারী। ১৩ সে তার সমর্থক দলকে ডেকে নিক ১৪ আমিও ডেকে নিই আযাবের ফেরেশতাদেরকে। ১৫ কখনই নয়, তার কথা মেনে নিয়ো না, তুমি সিদ্ধা করো এবং (তোমার রবের) নৈকটা অর্জন করো। ১৬

১১. বাহ্যত মনে হয়, এখানে প্রত্যেকটি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সরোধন করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তুমি কি সেই ব্যক্তির কার্যকলাপ দেখেছো যে আল্লাহর এক বান্দাকে ইবাদাত করা থেকে বিরত রাখছে? যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে অথবা মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখায় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, আর এই ইবাদাতে বাধ্যপ্রদানকারী সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার এই ভৎসনা সম্পর্কে তুমি কি মনে করো? যে ব্যক্তি এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছে সে যদি জানতো, যে বান্দা নেকীর কাজ করে আল্লাহ তাকেও দেখেন আবার যে সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট তাকেও দেখেন তাহলে সে কি এই কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারতো? আল্লাহ জ্বালেমের জুলুম দেখছেন এবং মজলুমের মজলুমীও দেখছেন। তাঁর এই দেখা এ বিষয়টিকে অবশ্যস্বাবী করে তুলেছে যে, তিনি জ্বালেমের শাস্তি দেবেন এবং মজলুমের করিয়াদ শুনবেন।

১২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি নামায পড়েন তাহলে এই ব্যক্তি নিজের পায়ের চাপে তার ঘাড় পিবে ফেলবে বলে যে হমকি নিচ্ছে তা কখনো সম্ভবপর হবে না। সে কখনো এমনটি করতে পারবে না।

১৩. কপালের দিক বলে এখানে যার কপাল তাকে বুঝানো হয়েছে।

১৪. যেমন ভূমিকার আমরা বলেছি, আবু জেহলেমের হমকির জবাবে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধমক দিয়েছিলেন তখন সে বলেছিল, হে

মুহাম্মাদ। তুমি কিসের জোরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে? আল্লাহর কসম, এই উপত্যকায় আমার সমর্থকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তার এই কথায় এখানে বলা হচ্ছে : নাও, এখন তাহলে তোমার সেই সমর্থকদের ডেকে নাও।

১৫. মূলে 'যাবানীয়াহ' (زبانية) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাতাদাহর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি আরবী ভাষায় পুলিশের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর 'যাবান' (زبن) শব্দের আসল মানে হচ্ছে, ধাকা দেয়া। রাজা বাদশাহদের দরবারে লাঠিধারী চোবদার থাকতো। তাদের কাজ হতো যার প্রতি বাদশাহ নারাজ হতেন তাকে ধাকা দিয়ে দরবার থেকে বের করে দেয়া। কাজেই এখানে আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, সে তার সমর্থকদেরকে ডেকে আনুক, আর আমি আমার পুলিশ বাহিনী তথা আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডেকে আনি। এই আযাবের ফেরেশতারা তার সমর্থকদেরকে ঠাণ্ডা করে দিক।

১৬. সিদ্ধা করা মানে নামায পড়া। অর্থাৎ হে নবী। তুমি নির্ভয়ে আগের মতো নামায পড়তে থাকো। এর মাধ্যমে নিজের রবের নৈকট্য লাভ করো। সহীহ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : "বান্দা সিদ্ধদায় থাকে অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।" আবার মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরার (রা) এ রেওয়াজাতটিও উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়তেন তখন তেলাওয়াতে সিদ্ধা করতেন।

هَذَا تِلْكَ النَّاسِ هَكَذَا وَفِيهِ نِصْرَةُ الْغَنِيِّ

তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদুদী
রহ.